বলো? ওই নোংরামির থেকে মুক্তি চাই বৈ কি! ও একেবারে অসহ্য! তুমি ত' কত জায়গায় যাও; সখী-সঙ্ঘের খবর রাখো? খবর পাও রোভার্স ক্লাবের? পথ নোংরা হয় ওরা হেঁটে গেলে। সেই জন্যেই ত' সব জানলা বন্ধ ক'রে রাখতুম!

নৃপেন বললেন, কিন্তু ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়। তুমি কি মনে করো, সিমলায় কেবল ভীষ্ম-মোহন্তরা থাকে? সিজ্‌ন্‌ এলে দেখে নিয়ো কাদের মেলা বসে! আমি নিজে দিল্লীর খবর যত না জানি, তুমি জানো তা'র চেয়ে অনেক বেশী। তালিকাটা থাকে তোমার হাতে হাতে!

থামো তুমি! হরিচরণ তর্কবাগীশের মেয়ে সুচারু বললেন, যারা চোখ বুজে থেকে কিছু দেখতে চায় না, তাদের নাম ভেড়া। তুমি আমি চোখ খুলি বলেই আমাদের দুর্নাম। জঙ্গলে যাও, সেখানেও দেখবে জন্তুজগতে একটা নিয়ম বাঁধা আছে। এক এক জন্তুর এক এক ঋতু। দিল্লীর ছেলেমেয়েরা সব ঋতুর বাইরে। কী কদর্য!

কলকাতার ছেলেমেয়েরা বোধ হয় নামাবলী জড়িয়ে থাকে?

আবার তর্ক! আঠারো বছর ধ'রে তোমাকে পছন্দসই একটা ছাঁচে ফেলতে চাইলুম, কিন্তু বাগ মানাতে পারলুম না। আমি জানি তুমি আমার অবাধ্য, আমাকে এড়াতে পারলে তুমি বাঁচো। সুচারুর গলার আওয়াজ কাঁপলো।

নৃপেন বললেন, দিল্লীতে আমি একা, সিমলায় তুমি একা। এই কি ভালো? এর নাম কি স্বামী-স্ত্রীর ঘরকন্না? আমার চলবে কেমন ক'রে?

সুচারু বললেন, চলবে! সৎপথে থাকলেই চলবে। মাঝে মাঝে তোমার ঘাড়ে যেন ভূত না চাপে, কদাচ যাবে না মেয়েমহলে গান শোনাতে! মেয়ের মুখের সুখ্যাতি পুরুষের পক্ষে নেশা! খবরদার!

নিজের হাতে রাঁধবে, নিজে হবিষ্যি করবে! সাবান দিয়ে কাচবে নিজের জামাকাপড়। দাড়ি কামাবে নাপিতের দোকানে গিয়ে; কাপড় ছেড়ে ঘরে উঠবে। সব সময়ে জানবে, আমি আছি আশেপাশে। ভালো অভ্যাসগুলো পুরনো হ'লে তাদের দাম কমে না। মহাপুরুষরা বলেন—

পাহাড়ের বাঁকের মুখে একটা ঝাঁকুনি লাগলো। নৃপেন বললেন, তুমি থাকবে সিমলায় একা, তোমার ভালো লাগবে?

খুব। সুচারু বললেন, খুব ভালো থাকবো আমার ওই 'লক্ষ্মীনিবাসে'। ডাক্তার বেদী আছেন পাশের ফ্ল্যাটে। আমার ভাবনা কি? বিশুনলাল কাজকর্ম করবে, আমি রান্না করবো। পাশেই ব্রাহ্মসমাজ মন্দির। সকাল সন্ধ্যে ওখানেই কাটবে। কালীবাড়ীর লাইব্রেরী থেকে রোজ বই আনাবো। লোয়ার সিমলার ধারে নগেনবাবুর মেয়েরা আছে, ওদেরকে গ'ড়ে-পিটে তুলবো। আমার কোনো ভাবনা নেই।

অকট্রয় পেরিয়ে মোটর এসে দাঁড়ালো কার্টরোডের প্রান্তে এক কয়লার আড়তের কাছাকাছি। কুলীরা মালপত্র নামালো। আগেই চিঠি দেওয়া ছিল, সুতরাং ডাঃ বেদীর বৃদ্ধা স্ত্রী গায়ত্রী ও বিশুনলাল এসে স্ট্যাণ্ডের কাছে উপস্থিত হয়েছে। সুচারু নেমে এলেন। গায়ত্রী দেবী মিষ্ট উর্দু ভাষায় বলেন, তুমি ত' কারো হাতে খাও না, তাই রান্না-বান্নার জোগাড় ক'রে রেখে এসেছি। এ বিশুন, শামান্ উঠাও।

সুচারু বিশুনের দিকে ফিরে বললেন, তোর ঠোঁট কালো কেন রে? আজকাল বিড়ি খাস বুঝি?

বিশুন বললে, বহুৎ সর্দি মালুম হোতি হ্যায়, মায়ি।

বেশ চলো, আমার কাছে থাকলেই টিট হবে!

বিকালের আগেই ওরা 'লক্ষ্মীনিবাসে', বেশ গুছিয়ে বসলো। বুড়ো ডাক্তার বেদী একটু আগে গল্পগুজব ক'রে চলে গেছেন। বাংলোর সামনে একটি ছোট বাগান। উঁচু উঁচু গাছের পাশ কাটিয়ে একটি পথ উপর দিকে রীজে উঠে গেছে। মল্‌রোড পূর্বদিকে ঘুরে চলে গেছে ছোট সিমলার দিকে, দক্ষিণ পথ ধরে গেলে ওয়েস্টরীজ। পশ্চিমদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে পার্বত্য পাঞ্জাব। সন্ধ্যার পরে চাইল্‌ শহরের আলো দেখা যাবে। তার কোলে তারা দেবী। সুচারুর নূতন উৎসাহ ফিরে এসেছে। ঠাণ্ডা বাতাসে আর প্রফুল্লতায় তাঁর সুশ্রী মুখে নূতনতর তারুণ্য এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

বক্রহাস্যে নৃপেন বললেন, গাউন পরলে তোমাকে মেমসাহেব ব'লে মনে হোতো! লোকে কি আর সাধে বলে?

সুচারু বললেন, কি বলে শুনি?

বলে যে নৃপেন রায় বানর, গলায় মুক্তোর মালা ঝুলিয়ে বেড়ায়!

চুপ করো, কেউ শুনবে! লোকে অনেক নোংরা কথা বলে। তুমি গায়ে মাখো কেন? শোন, পরশু যাবার আগে আমাকে দু' পাউণ্ড পশম কিনে দিয়ে যেয়ো।

নৃপেন বললেন, যাবার সময় আমাকে কিছু টাকা দিয়ো।

তোমাকে? কেন? তোমার টাকা কি হবে?

আমার খরচ নেই?

সে-ভাবনা আমার, তোমার নয়। তোমার কাজ রোজগার করা, আমার কাজ খরচ করা। এর উল্টোপথে কখনো হাঁটবে না। সুচারু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

নৃপেন আর কথা বললেন না। এই মাসে তার পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়বে, এ সংবাদটা তিনি চেপে গেলেন।

এক সময় সুচারু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, চলো।

সামনের সরু পথটিতে বাঁকা রোদ এসে পড়েছে। নীচের খাদের দিকে ধীরে ধীরে অপরাহ্ণের ছায়া নেমে আসছিল। ওরা ওই পথ ধ'রে এসে মল্-এর উপরে উঠলো। এদিকে দোকানদানি অপেক্ষাকৃত কিছু কম। সিমলায় সুচারুর মন খোলে, আবরু ঘোচে। তাঁর ভালো লাগে না গরম দেশ, গরমকাল। তাঁর ভালো লাগে না স্বদেশী ঘরকন্না, মেয়েমহলের আলাপ, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের চলতি ব্যাখ্যা। এই তাঁর ভালো। নিজেকে নিয়ে তিনি তৃপ্ত। স্বামীর সঙ্গে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘকাল থেকে, তাতে তাঁর কোনো উদ্বেগ নেই। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটা চেতনা মাত্র, বড়জোর একটা মনোবৃত্তি—ওটা স্বাভাবিক দুর্বলতা, ওটাকে তিনি স্বীকার করেন না। স্বামী চরিত্রবান হলেই তিনি নিশ্চিন্ত, তা'র বেশী কোন দাবী নেই। স্বামী অনেক সময়ে তাঁকে উত্যক্ত করবার চেষ্টা করতো, অনেক সময় হাত ধ'রে টানতো, কিন্তু সে গতযুগে; সুচারুর কাছ থেকে প্রশ্রয় না পেয়ে সে চুপ ক'রে গেছে। মেয়েরা নাকি স্বামীর সেবা করে, পায়ের কাছে শোয়, এঁটো পাতে খায়, রোগের শুশ্রূষা করে, সন্ধ্যার পরে সোহাগ জানায়, দুষ্প্রবৃত্তির পথে টেনে আনার জন্য বিছানা সাজিয়ে ব'সে থাকে। সুচারুর কাছে এ সব ঘৃণ্য। পুরুষের কাছে কোনোদিন সে ছোট হয়নি; স্বামীর কাছে কোনোদিন সে দৈন্য প্রকাশ করে নি।

হাঁটতে হাঁটতে তা'রা চললো অনেক দূরে। মল্ থেকে তারা আস্তে আস্তে নেমে গেছে আনানদেলের পথে। পথ খুবই নিরিবিলি। সরকারী রিজার্ভ ফরেস্ট ডানদিকে রেখে তারা চলেছে নিজের মনে। সিমলার অন্যসব পল্লী তাদের অতি পরিচিত। সেদিকে অনেক লোক, অনেকে চেনাশোনা। কালীবাড়ীর ওদিকে সুচারু যেতে চায় না। ছোট সিমলার ঘিঞ্জি পল্লী তার কাছে বিরক্তিকর। যেতে পারতো তারা বায়লুগঞ্জ পেরিয়ে প্রস্‌পেক্টের দিকে, কিন্তু সে অনেক দূর। তা

ছাড়া প্রস্‌পেক্টের দিকে মেয়েপুরুষের নানাবিধ লুকোচুরি ঘটে, আবহাওয়াটা ঘুলিয়ে ওঠে। তা'র চেয়ে এই ভালো।

এক সময় সুচারু বললে, পথটা নতুন মনে হচ্ছে, না ?

নৃপেন বললে, এ দিকে আগে এসেছি মনে পড়ে না।

ফিরবার পথ চিনতে পারবে ত ?

পথ হারায় না, যদি লক্ষ্য ঠিক থাকে।

সুচারু বললে, নীচের থেকে বস্তির আওয়াজ আসছে যেন ?

নৃপেন বললে, এগিয়ে চলো দেখা যাক্। এই জন্যেই সিমলা আমার ভাগ্যে লাগে না। বৈচিত্র্য কোথাও নেই। অত্যন্ত চেনা একঘেয়ে পথে কেবল হাঁটা। নতুনত্ব হারায় একদিনে।

সুচারু বললে, বড্ড বাজে বকো তুমি! তোমাকে টান্‌ছে কনট্ সার্কাস, টানছে গোল মার্কেট, টানছে রোভার্স ক্লাব। অসভ্যতাই তোমাদের প্রিয়। কবে থেকে যে সৎপথে হাঁটতে শিখবে তাই ভাবি।

পথটা এসে মিলেছে গ্রামের এক প্রান্তে। এ এক পাহাড়ী গাঁও। এদিক থেকে শাকসব্জি যায় উপর দিককার শহরে। শহরের নর্দমা নামে এই সব পথ বেয়ে। এ অঞ্চলে আগে তারা আসেনি বটে।

সন্ধ্যার আলো জ্বলেছে। হাঁটতে হাঁটতে তা'রা এসেছে প্রায় তিন মাইল। এখন চড়াই ধ'রে অন্ধকারে আগের পথ ধ'রে ফিরে যেতে গেলে প্রায় ঘণ্টা দুই লাগবে। তা'ছাড়া আনান্‌দেলের ওদিকটা নাকি সন্ধ্যার পর থেকে যথেষ্ট নিরাপদ নয়। এ ভিন্ন আলোও নেই ওদিকটায়।

নৃপেন বললে, চলো বস্তির পথ ধ'রেই যাই ওপরে। লোকজনের সাড়া আছে। নিশ্চয়ই শর্টকাট্ পাবো।

সত্যি বলতে কি, অন্ধকার পথে সুচারুর একটু গা ছমছম করে। কেন করে বলা কঠিন। স্বামী আছে সঙ্গে, কিন্তু তার ওপর নির্ভর

করা যায় না। পুরুষ কি নির্ভরযোগ্য? তার ওপর ভাগ্য ছেড়ে দিয়ে কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়?

অগত্যা বস্তির পথটাই ধরতে হোলো। কিন্তু এবার সুচারু আগে, নৃপেন পিছনে পিছনে। পিছন দিকে চলতে চলতে নৃপেন হঠাৎ লুকিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছে।

সঙ্কীর্ণ পথের বাঁকে ছোট্ট একঠি কাফিখানা দেখে নৃপেন থমকে দাঁড়ালো। স্ত্রীর উপদেশের তাড়নায় কণ্ঠ তার শুষ্ক, যদি গলাটা একটু ভিজিয়ে নিতে পারতো।

কাফিখানার লোকটী তা'র দিকে চেয়ে রয়েছে, কি যেন লক্ষ্য করছে। পথের আলোয় লোকটিকে ভারী সুশ্রী মনে হচ্ছে। বয়স বেশী নয়। মাথায় টুপি, পরণে চুড়িদার, গায়ে একটা জোব্বা। কিন্তু এক পেয়ালা কাফির দাম কত, এই প্রশ্ন করতে গিয়ে নৃপেন থতিয়ে গেল। লোকটার দৃষ্টি একাগ্র। অনেকটা যেন অসহায়, যেন অনেকটা কুণ্ঠাসঙ্কোচে মলিন।

নৃপেন দু'পা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো, মুঝ্‌কো পয়ছান্‌ত হো?

লোকটা জবাব দিল, মালুম নহি হোতি। ক্যা, কাফি পিয়োগে?

ওদিকে দেরি দেখে সুচারু হন্‌হন্‌ করে ফিরে আসছে। উষ্ণকণ্ঠে বললে, হাঁ ক'রে দেখছ কি ওদিকে? ফিরতে হবে না তাড়াতাড়ি?

গলা নামিয়ে নৃপেন বললে, দেখছি লোকটিকে, যেন চেনা-চেনা!

মানে?···সুচারু দাঁড়ালো।

কাফিওয়ালার দিকে স্পষ্ট ক'রে তাকাতেই সে-ব্যক্তি দু'পা কাছে এগিয়ে এলো। নৃপেন এবার চাপা উল্লাসের সঙ্গে ব'লে উঠলো, আর সন্দেহ নেই। আমাকে চিন্‌তে পারো নলিনাক্ষ?

কাফিওয়ালা চাপা গলায় বললে, হ্যাঁ পেরেছি।

তুমি এখানে? এই অদ্ভুত জায়গায়?

নলিনাক্ষ বললে, আমি এখানে থাকি কেউ জানে না।

সুচারু একেবারে নির্বাক। লোকটার যেমন আশ্চর্য রূপ, তেমনি সুন্দর স্বাস্থ্য। কিন্তু সমস্তটাই যেন নাটকীয় রহস্য দিয়ে ঘেরা। নৃপেন ঘাড় ফিরিয়ে বললে, ও হোলো রাঙাদিদির ভাগ্নে।

রাঙাদিদি কে?

আমাদের গাঁ-সম্পর্কে পিসি।

উনি এই দূরদেশে পাহাড়ের নীচে থাকেন কেন?

নৃপেন বললে, ওকেই জিজ্ঞেস করো।

নলিনাক্ষ হঠাৎ সহজ হয়ে বললে, কাফি পিনা তো অন্দরমে আইয়ে—বহুৎ মেহেরবানি।

দ্বিরুক্তি করলে না সুচারু। পথ ছেড়ে নৃপেনের সঙ্গে সে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। সামনে কালিঝুলি-মাখা একটা উনুন, পুরনো একটা টেবিলে কয়েকটা ময়লা পানপাত্র। ভিতরে আসবাব-সজ্জা যেমনি দরিদ্র, তেমনি অপরিচ্ছন্ন। এখানে ওখানে উচ্ছিষ্ট ছড়ানো। কেরোসিনের আলোটা থেকে ময়লা শিষ উঠছে, তারই দুর্গন্ধে কাঠের ঘরখানা আচ্ছন্ন। পায়ের তলা দিয়ে কোথাকার নর্দমার ঘোলাটে জল বয়ে যাচ্ছিল।

মোটামুটি পরিচয় হবার পর সুচারু প্রশ্ন করে বসলো, দেশে কি আপনার জায়গা ছিল না? এরকম গা ঢাকা দিয়ে এখানে থাকার দরকার কি?

এই ভাবে থাকাই আমার দরকার, মিসেস রায়।

কেন?

নলিনাক্ষ বললে, আমি পলাতক।

সুচারু বললে, কোন অন্যায় করে এসেছেন কি?

কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় কে বলবে?

বলবার লোক আছে বৈ কি, আপনি হয়তো তার খোঁজ রাখেন না—সুচারুর কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটে উঠলো।

নৃপেন বললে, এমন কী ঘটনা—যার জন্যে তুমি পালিয়ে বেড়াও ?

নলিনাক্ষর মুখে জবাব শোনার জন্য সুচারুর আশ্চর্য রকম আগ্রহ বেড়ে গেল। নলিনাক্ষ বললে, ঠিক বুঝতে পারিনে প্রকাশ করা উচিত কি না। বোধহয় উচিত নয়।

সুচারু বললে, উচিত কি না আপনি জানলেন কেমন করে ?

নলিনাক্ষ একবার মুখ তুলে আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। জবাবদিহি করার দরকার নেই তার। নৃপেন তার মুখের দিকে একবার তাকালো। নলিনাক্ষর দুই চোখে আশ্চর্য দীপ্তি, মুখে স্বাভাবিক প্রসন্নতা, ভাবভঙ্গীতে কোথাও চাঞ্চল্য নেই। সুচারুর উৎসুক প্রশ্নের উত্তরে সে যেন পরম শান্তভাবে পাশ কাটিয়ে সরে গেল। এতটুকু চাঞ্চল্য নেই তার।

কাঠের বেড়ার পাশ থেকে নারী-কণ্ঠের প্রশ্ন এলো, খানা দিউ, করমচন্দ ?

নলিনাক্ষ জবাব দিল, ক্যা—বনা চুকা ?

জি।

রাখ্ ছোড়ো। থোড়ি দেরমে……

সুচারু ফস্ করে জিজ্ঞাসা করলো, ও কে ?

নলিনাক্ষ বললে, কেউ না।

ও কি বাঙ্গালী ?

না।

আপনার রান্না করে কেন ?

রান্নাই ওর কাজ।

সুচারু বললে, আপনার এখানেই রাঁধে শুধু ?

নলিনাক্ষ বললে, এবার হয়ত জানতে চাইবেন, ও এখানে বিনা বেতনে চাকরি করে কি না?—তারপর নৃপেনের দিকে ফিরে বললে, তুমি হঠাৎ এখানে?

নৃপেন বললে, দিল্লী-সিমলায় আমার চাকরি যে! যেতে আসতে হয় যখন তখন। কিন্তু এবার আমাদের যেতে হবে, নলিনাক্ষ। অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে বেশ দেখা হয়ে গেল, মনে থাকবে।

নলিনাক্ষ হেসে বললে, বরং মনে রেখো না, সেই আমার লাভ। তার চেয়েও লাভ কি জানেন, মিসেস রায়? যদি এর পর দেখা আর না হয়।

নৃপেন বললে, তা যা বলেছ, তা সত্যি।

না, তা, সত্যি নয়। সুচারু যেন আক্রোশের সঙ্গে প্রতিবাদ জানালো—দেখাটাই দর্শন, জানাটাই জ্ঞান। জীবনটা নষ্ট হচ্ছে, এ যে দেখতে পায় না, তাকে জীবনটা চিনিয়ে দেওয়া দরকার বৈকি।

সহাস্য মুখে নলিনাক্ষ বললে, চেনাবেন আপনি?

নৃপেন বললে, উনি অনেক পড়াশোনা করছেন হে!

থামো, বোকার মতন সুখ্যাতি কোরো না। সুচারু স্বামীকে মুখ-থামাল দিল।

নলিনাক্ষ আবার হাসলো। নৃপেনের দুর্দশা দেখলে ভারি কৌতুক বোধ হয়। সুচারু বললে, হ্যাঁ, আমিই চেনাতে পারবো, যদি চেনবার চোখ আপনার থাকে। আজকের মতন উঠছি ওঁকে নিয়ে, কিন্তু মনে রাখবেন আবার আমি আসবো—উনি না এলেও আসবো।

কেন আসবেন, শুনতে পারি কি?

আপনাকে ধরিয়ে দিতে।

ধরিয়ে দিতে!

হ্যাঁ, আপনার নিজের কাছে ধরিয়ে দিতে।

নলিনাক্ষ সহাস্ত মুখে পুনরায় বললে, কথাটা একটু খুলে বলে যান্ ত।

অশোভন এবং অহেতুক বিতর্কের চেহারা দেখে নৃপেন যেন একটু বিব্রত ও সঙ্কুচিত বোধ করছিল। কিন্তু সুচারুর ঘাড়ে যেন ভূত চেপে গেছে। সে বললে, আমার চোখের সামনে অধঃপতন কারো ঘটলে আমি বরদাস্ত করি নে।

আপনি কে?

আমি? সুচারু বললে, ধরুন, আমি দেশের একজন মহিলা।

আপনার আর কি পরিচয়?

আর একটা পরিচয় এই, আমি কখনও অন্যায় করিনে, অন্যায় সইওনে।

কথাটা কতখানি দুঃসাহসের হোলো, তা আপনি বোঝেন?

সুচারু বললে, নিশ্চয়।

নলিনাক্ষ এবার শান্তকণ্ঠে বললে, আমার অধঃপতনের কী দেখলেন আপনি,—জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আজকে থাক্, আপনাদের রাত হয়ে যাচ্ছে।

নৃপেন বললে, হ্যাঁ ভাই, ফিরতে আমাদের আজ একটু দেরিই হবে দেখছি। আজ আমরা উঠি।

দরজা পর্যন্ত এসে নলিনাক্ষ এবার একটু চাপা গলায় বললে, দশ-এগারো বছর পরে এই প্রথম চেনা লোক দেখলুম। আমার এখানে পাঞ্জাবী পরিচয়,—এই আমার দোকান। ঠিক আমার নয়, একজন মেয়েছেলের। আমার সামান্য শেয়ার আছে মাত্র।

সুচারু বললে, মেয়েছেলে মানে,—ওই যার গলা তখন শুনলুম?

না, ঠিক ও নয়।

রহস্যটা এতক্ষণ পরে যেন আরো কিছু ঘন হয়ে উঠল। প্রথম

থেকে এখন পর্যন্ত নলিনাক্ষর বাইরের চেহারাটায় কোথাও অসৌজন্য নেই, অথচ ছোঁয়াচে গন্ধে আভাসে কেমন যেন একটা গভীরতর এবং নীতিবিগর্হিত জীবনযাত্রার সঙ্কেত খুঁজে পাওয়া যায়। তার স্পষ্ট চেহারাটা বুঝতে পারা যায় না, অথচ তার অস্পষ্ট ভয়াবহ চেহারাটাও ভাবতে ভালো লাগে না।

সুচারু পুনরায় বললে, আপনার থাকা হয় কোথায় ?

নলিনাক্ষ জবাব দিল, এই দোকানেই থাকি—পাশে একটা চোর-কুঠুরী আছে, তার জানলা-টানলা নেই। যা হোক করে রাতটা কাটিয়ে দিই।

আমি এলে কি আপনি বিব্রত বোধ করবেন ?

হাসিমুখে নলিনাক্ষ বললে, তা একটু করবো অবিশ্যি। তা ছাড়া আপনার আসবার কারণটা স্পষ্ট না জানা পর্যন্ত আমার আড়ষ্টতা কিছু থাকবে বৈকি।

নৃপেন হাসিমুখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, বুঝতে পাচ্ছ, এখানে তোমার কোন অভ্যর্থনা নেই ?

সুচারু বললে, গ্রাহ্য করিনে। আমার দায়িত্বপালনের জন্যেই আমাকে আসতে হবে।

দায়িত্ব !

হ্যাঁ, দায়িত্ব বৈ কি। যাকে বলে, নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু আজ থাক্ সেকথা। এসো—

এই বলে কোনোপ্রকার বিদায়-সম্ভাষণের অপেক্ষা না রেখেই সুচারু আগে আগে এগিয়ে চললো। নৃপেনের হাতঘড়িতে তখন নয়টা বেজে গেছে।

সামনে চড়াই পথ আঁকাবাঁকা। দূরে দূরে এক একটা আলো জ্বলছে। কিন্তু আশপাশটা থমথমে অন্ধকার। পাইন আর ঝাউয়ের

বনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কোনো কোনো বস্তি থেকে দেহাতি শিখদের ডুগডুগি গান শোনা যাচ্ছে। তাদেরকে এখন অনেকটা পথ উঠে যেতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অনেকটাই যেন ছাত্র ও শিক্ষকের। সুতরাং বিশেষ কোনো সময়েই ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা ওঠে না।

এক সময় স্ত্রীর সঙ্গে সমপদক্ষেপ রাখার জন্য নৃপেন একটু দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে সুচারুর পাশে পাশে চলতে চলতে বললে, নলিনাক্ষ ওর মায়ের বাধ্য ছিল না কোনদিন। তা ছাড়া অল্প বয়স থেকে ও চুরি-জোচ্চুরিতে হাত পাকিয়েছিল। আমরা সবাই ওকে ভয় করতুম। লেখাপড়া মোটামুটি মন্দ শেখে নি। একবার বাড়ির সিন্দুক ভেঙ্গে গয়নাপত্র নিয়ে নলিনাক্ষ সিঙ্গাপুরে পালায়। সেখানে এক চীনা মেয়ের সঙ্গে আফিং চোলাইয়ের কারবার করতে গিয়ে ধরা পড়ে। তারপর কবে যেন জেল ভেঙ্গে পালায়। আমার ছোট খুড়ীর ভাই ফরেস্ট-রেঞ্জারের চাকরি করতেন রায়পুরের জঙ্গলে,—তিনি ওকে দেখতে পান সেই জঙ্গলে—ও তখন সেখানে কাঠের ব্যবসা করতো।

সুচারু বললে, বিয়ে-থা করে নি ?

বিয়ে ? আজও কেউ জানে না। রাঙ্গাদিদির বাড়ি থেকে একবার শুনেছিলুম,—ও নাকি অনেক জাতির মেয়েকে নিয়ে অনেকবার ঘর করেছে। কিন্তু কেউ দাঁড়িয়ে নেই, কোনদিন জলের ওপর দাগ পড়ে নি।

সুচারু বললে, সব দোষ তোমাদের। উনি যে কোনদিন সৎ-সঙ্গ পান নি—কেউ যে ওঁকে কোনদিন টেনে তোলবার চেষ্টা করে নি,—এ অপরাধ তোমাদের সকলের। মানুষ ছোট হয়ে জন্মায় না—তাকে ছোট করে চারিদিকের সকলে।

তুমি ওর সম্বন্ধে কি মনে করো ?

সুচারু বললে, আমি মনে করি ওঁর সর্বনেশে চেহারাটা ওঁর সামনে কেউ কোনোদিন তুলে ধরে নি। সেইজন্য উনি নিজের স্বভাব-চরিত্রের সাংঘাতিক চেহারাটা কোনোদিন দেখতে পান নি। দেখলে উনি নিজেও ভয় পেতেন এবং হয়ত অনুতাপের আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে ভিন্নপথে পা বাড়াতেন।

নৃপেন বললে, তুমি একাজ পারো ?

সুচারু অন্ধকারে চলতে চলতে একপ্রকার কঠিন উপেক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসলো। পরে বললে, আঠারো বছর আমার কাছে থেকেও তুমি আমাকে চিনতে পারো নি ! হরিচরণ তর্কবাগীশের মেয়ে আর কিছু না হোক, ও কাজটা বোধ হয় ভালোই পারে।

নৃপেন আর কোন কথা বললে না।

সকালবেলা থেকেই সুচারুর একটা দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য দেখা যাচ্ছিল—যেমন দেখা গিয়েছিল গতরাত্রে। রাত্রে বাংলোয় ফিরে কলের পুতুলের মতো সমস্ত কাজই সেরেছে—এমন কি সহসা যা করে না কোনোদিন—নৃপেনের বিছানাটা সযত্নে গুছিয়েও দিয়েছিল। কিন্তু আন্দাজে নৃপেন বুঝতে পেরেছিল, রাত্রে পাশের খাটিয়ায় সুচারু খোলা চোখে প্রায় সারাক্ষণ জেগে ছিল। আজ সকাল থেকেও তাই। ঘরকন্নার ব্যাপারটা তার কাছে গৌণ। ওটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে সে কিছুমাত্র সময় নিল না। বিশুনলাল চোরের মতো আশেপাশে থেকে তার কাজকর্মে নানারূপ সাহায্য করে দিল।

সকালের দিকে গরম জলে স্নান করে নৃপেন বেরিয়েছিল। ফিরে এলো কয়েকখানা বই হাতে নিয়ে। এসব বই সুচারুরই ফরমাস। অপরাধতত্ত্ব, সমাজনীতি-তত্ত্ব, নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের মোটা মোটা গ্রন্থ। বইগুলি রেখে নৃপেন বললে, সিমলায় এসে এবার দেখছি ভালো আপদ জুটে গেল। কিন্তু নলিনাক্ষকে কি তুমি বাগ মানাতে পারবে ?

সুচারু বললে, কোন বিষয়ে হার মানতে নেই!

নৃপেন বললে, তবে একথা ঠিক, নলিনাক্ষর যে রকম বুদ্ধি আর প্রতিভা ছিল,—ও যদি ভালো পথে চলতো—একজন মানুষের মতন মানুষ হতে পারতো। কিন্তু আমি আর কোন আশা দেখিনে।

সুচারু এগিয়ে এসে বললে, আমাকে নিরুৎসাহ ক'রো না। তুমি দেখে নিয়ো, আমি ওকে ফিরিয়ে আনবো। মনুষ্যত্বের ডাক, ধর্মের ডাক,—কিছুতেই ওকে নোংরায় ডুবে থাকতে দেবে না। আমি দেখেছি, ওর মধ্যে প্রতিজ্ঞা আছে, আত্মবিশ্বাস আছে, এমন কি লক্ষ্যও আছে। কিন্তু আলো নেই ওর চোখের সামনে,—ওর দুই চোখে ঠুলি-বাঁধা। ঝড়-বাতাস বাঁচিয়ে আলোটা হাতে নিয়ে ওকে পথ দেখিয়ে যেতে হবে। তোমাকে এও আমি বলে রাখি, যদি ওকে টেনে তুলতে না পারি, তবে মিথ্যেই আমার এতদিনকার তোড়জোড়। মিথ্যেই আমি এতদিন অহঙ্কার করে এসেছি।

সুচারুর চোখের দীপ্তি ঝলমল করছিল। অনেকটা যেন মহীয়সীর চেহারা। নৃপেন জানে, যে বিষয়টা নিয়ে এখন থেকে সুচারুর মনে ভাবনা ধরে রইলো—তার একটা পরিণতি না হওয়া পর্যন্ত সে অস্থির হয়ে থাকবে। এর কাছে ঘরকন্না অথবা আর যা কিছু সব মিথ্যে। স্বামী পর্যন্ত পড়ে গেল এর অন্তরালে। বড় কঠিন মেয়ে সে। বড় অনন্যসাধারণ।

নৃপেন বললে, আসছে কাল আমার যাবার কথা। কিন্তু আজ রবিবার, আজই গেলে কাল সকাল থেকে আপিস করতে পারি। তুমি কি বলো?

সুচারু বললে, তুমি গেলে আমার এখানে অসুবিধে কিছু হবে না; বিশুন রইলো, ডক্টর বেদী রইলেন। সামনের সপ্তাহে টাকা পেয়ে পাঠাবে। তোমার ওখানকার খরচের হিসেবটাও অমনি পাঠিয়ে দিয়ো।

সামনের শনিবারে আসবো কি ?

না এলেও চলবে।

নৃপেন বললে, তোমাকে ত দিল্লী যাবার কথা বলাই মিথ্যে।

সুচারু বললে, এখানে যদি বরফ পড়ে, তবে দিনকয়েকের জন্যে দিল্লী যাবার ইচ্ছা রইলো।

নৃপেন সেইদিনই দুপুরে মোটর নিয়ে কাল্‌কার দিকে অগ্রসর হোলো। মোটরে বসে সে নিজের মনে হাসছিল। নলিনাক্ষর পরিবর্তন কি ঘটবে? অসম্ভব্। পাথরের গায়ে প্রাণপণে মাথা ঠুকলেও পাথর টলে না, কিন্তু মাথাটার দুর্দশা ঘটে। এই দ্বন্দ্বে দুদিকের দুটো শক্তিকেই প্রবল সন্দেহ নেই—নৃপেন জানে। নলিনাক্ষ সকল সংস্কারকে টুকরো টুকরো করেছে, নৈতিক চেতনার গলা টিপে মেরেছে, বর্বরতা ও কদাচারকে আপন রঙের সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছে—দ্বিধাহীন নিঃসঙ্কোচ অপরাধের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। এদিকে সুচারুও কী কঠিন! আগুনের মতো সততা তার স্বভাবজ, প্রতিজ্ঞায় সুকঠোর। শুচিতায় গঙ্গার মতো পবিত্র, চিত্তের প্রবল দৃঢ়তায় সে ভয়হীনা। কিন্তু নৃপেন আবার হাসলো। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিশ্চিন্তভাবে টান দিল। জল উঁচু দিকে ছোটে না, সূর্য পশ্চিমে ওঠে না, মৃত্যুর পর কেউ প্রাণলাভ করে না।

নৃপেন আবার সিগারেটে টান দিল। মোটর নামতে লাগলো খাদ বাঁচিয়ে এঁকেবেঁকে।

নৃপেন যাবার পর দরজা বন্ধ করে সুচারু পরীক্ষার্থিনী ছাত্রীর মতো বই নিয়ে একমনে বসে ছিল। দুর্নীতিও একটা নীতি ধরে চলে, সেটা অসংলগ্ন নয়। তার পদ্ধতি আর নিয়ম দুটোই আছে। অপরাধের মধ্যেও বিবেক তার কাজ করে যায়। তার নাম অন্তর্যামী। অসৎ-বৃত্তিকে বুদ্ধিই পথ দেখায়। চিত্তকে অসাড় করে রাখে বুদ্ধি।

সুচারু বসে বসে জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করে।

শীতের দিনে পাহাড়ের বাসিন্দারা মধ্যাহ্ন-রৌদ্রেই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে, অপরাহ্ণকালে ফিরে আসে। বাংলোয় ফিরবার আগে সস্ত্রীক ডাঃ বেদী এসে সুচারুর ঘরের কড়া নাড়েন। সুচারু চমকে উঠে, গিয়ে দরজা খুলে সাহাস্যে দাঁড়ায়।

ডাঃ বেদী বললেন, তুম নে বহুৎ পড়েদার হুঁ? রায়সাব কিধর গ্যয়ে? চা পিয়োগে নহি?

সুচারু বললে, ম্যা অকেলে হুঁ।

গায়ত্রী বললেন, কিঁউ? লড়কা মেরে কাঁহা গিয়া?

দিল্লী।

দিল্লী! চিড়িয়া নে ভাগ্ গিয়া?

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই হেসে উঠলেন। গায়ত্রী দেবী বললেন, মনে করেছিলুম তোমরা দুজনে চা খাবে আমাদের সঙ্গে। তা তুমি এসো মা—শুধু বই কাগজ নিয়ে থাকতে দেবো না। এবার প্রায় তিন মাস পরে এসেছ।

আচ্ছা চলুন,—

দরজাটা টেনে দিয়ে সুচারু তাঁদের সঙ্গে পাশের ফ্ল্যাটে গেল। বিশুনলাল ভিতর মহলে রান্নাবান্নার তদ্বিরে রইলো।

বইগুলি পড়ে শেষ করতে লাগলো প্রায় তিন সপ্তাহ। এর মধ্যে নগেনবাবুর বাড়ির মেয়েরা এসেছে দু-চারবার, সতীশ মৈত্রের স্ত্রী এসে দিন দুই নিজে নিজেই আমোদ-আহ্লাদ করে গেছেন, বিশুনলাল একদিন পা ফস্‌কে পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এবং বৃদ্ধা গায়ত্রী দেবী রাঁধতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছেন। কিন্তু সুচারুর ধ্যান-ভঙ্গ হয় নি। এর মধ্যে কবে থেকে যেন সন্ধ্যার পর ঘরের ভিতরকার

ফায়ারপ্লেসে কাঠের আগুন ধরিয়ে রেখে বিশুনলাল চলে যায়,—সুচারু সেদিকেও ভ্রুক্ষেপ করে নি! নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহও শেষ হয়ে এলো। সিমলা শহর ক্রমেই জনহীন হয়ে আসছে।

সেদিন সকাল দশটা আন্দাজ সুচারু নলিনাক্ষর দোকানে এসে পৌছলো। নলিনাক্ষ তখন পানপাত্রগুলি গরম জলে ধুচ্ছিল। দোকানে ঢুকে সুচারু কাঠের পার্টিশনের পাশে গিয়ে এক জায়গায় বসলো। তার সর্বাঙ্গ পশমের চাদরে ঢাকা—মুখখানা কেবল খোলা। দোকানে কয়েকজন পাহাড়ী কাফি খাচ্ছিল।

কিন্তু ভিতরে না বসে তারা বাইরের রোদে পিঠ দিয়ে বসেছে। দোকানের ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা।

নলিনাক্ষ এসে দাঁড়ালো। বললে, কাল আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয় নি।

সুচারু বললে, আগে আমার কথার জবাব দিন।

কি বলুন?

ছোটবেলা আপনার মা কেন অত মারতেন আপনাকে—কী কী কারণ তার?

নলিনাক্ষ বললে, মারটাই মনে থাকে, কারণটা নয়।

আপনার প্রথম অন্যায় কাজ কোন্‌টা—যেটা আপনার আজও মনে আছে?

শিশু যদি কাচের পেয়ালা ভাঙ্গে—সেটা কি তার অন্যায় কাজ?

সুচারু বললে, দেখুন, আমার সময় কম। আমাকে সাহায্য না করলে আপনাকেও আমি সাহায্য করতে পারবো না।

আমাকে সাহায্য করবেন আপনি? এঁটো পেয়ালাগুলো ধুয়ে দিতে পারবেন কি?—নলিনাক্ষ সোজা হয়ে তাকালো।

দরকার হলে দিতে হবে।

রাস্তার ধারে বসে ছেঁড়া কোর্তা সেলাই করতে পারবেন ?

সুচারু বললে, মেয়েমাত্রেই সেলাই জানে। শুনুন, আপনি কি জানেন, একটি দিনে নিজেকে নষ্ট করা যায়, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চরিত্রের উন্নতি করা যায় না ? এ কি আপনি মানেন না ?

নলিনাক্ষ প্রশ্ন করলো, চরিত্র মানে কি ?

যে-পরিচয়ে আপনি পরিচিত।

কার কাছে ?

ধরুন, আমারি কাছে।

হাসিমুখে নলিনাক্ষ বললে, আমি নিজের পরিশ্রমে অন্নসংস্থান করি, আর আপনি অপরের পরিশ্রমে খেয়ে উপদেশ ছড়িয়ে বেড়ান্।

সুচারু বললে, আপনি তবে জবাব দেবেন না ?

আমার সময় নেই, মিসেস রায়।

সুচারু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। জন দুই অল্পবয়সী মেয়েছেলে এবং একটি ছোকরা সামনের উনুনটার আশেপাশে কাজ করছিল। তাদের দিকে একবার তাকিয়ে সে পুনরায় প্রশ্ন করলো, এরা কে আপনার ?

নলিনাক্ষ মুখ তুলে তাকালো। তার চোখে বিরক্তির দাগ ফুটেছে। বুঝতে পারা যায়, স্ত্রীলোকের অনাবশ্যক কৌতূহলের বারংবার জবাব দেবার জন্যে সে মোটেই প্রস্তুত নয়। তবু সে বললে, একই গাছে নানা পাখী বাসা বাঁধে। কার সঙ্গে কার কি সম্পর্ক বলা যায় না।

সুচারু সেদিনকার মতো উঠে পড়লো। দুখানা বই তার হাতে ছিল, তাই নিয়ে সে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লো। ওই লোকটার ওপর রাগ করা যায় না, অথবা ওর কাছে কোন অভিমান রেখে যাওয়াও যায় না। সম্ভবত তার নিজেরই বিশ্লেষণে কোন একটা

ভুল থেকে যাচ্ছে। সুতরাং আর কোনো কথা না বাড়িয়ে সে নিজের পথে চলতে লাগলো।

দিন তিনেক আগে নৃপেনের একখানা চিঠি এসেছিল। সেখানা তেমনি পড়ে রয়েছে। বিকালের ডাকে উত্তর পাঠাবার জন্য সুচারু আহারাদির পর চিঠি লিখতে বসে গেল। সেই চিঠিতে যথারীতি ব্যক্তিগত কথা সামান্যই, বাকি সমস্ত চিঠিখানাতেই নলিনাক্ষর আলোচনা। তাকে সংস্কার করতে হবে, বদলাতে হবে, সমাজের সেবায় তাকে প্রয়োজনীয় করে তুলতে হবে। সৎ ব্যক্তিরা আমার কাছে থাকে, কিন্তু অপরাধীরা আমাকে এড়িয়ে চলতে চায়। নলিনাক্ষ আমাকে ভয় করে, কেননা ওর ভেতর অপরাধী মানুষটা অত্যন্ত ভীরু। আমার কাছে মাথা হেঁট করতে চায় না, পাছে ওর নিজের আসল চেহারাটা দেখে ও ভয় পায়। কিন্তু আমি ওকে ছাড়বো না, ওকে আমি ফিরিয়ে আনবোই। দিন দিন প্রতিজ্ঞা আমার কঠিন হয়ে উঠছে ওর জন্যে। নগেনবাবুর মেয়েরা আমার সম্বন্ধে নানাকথা বলাবলি করে, ডাক্তারবাবুরা যখন তখন আর আমার এখানে আসেন না,—আমি কোথায় যাই, কেন যাই, কার কাছে যাই—এ নিয়ে কারো কারো মাথা-ব্যথাও দেখতে পাই। তুমি আসতে পারো, সে তোমার খুশি, এসে দু'-চারদিন কাটিয়েও যেতে পারো—সেও তোমার খুশি। কিন্তু আমি এখানে দিবারাত্র নলিনাক্ষর বিষয় নিয়েই আছি, এ ছাড়া আমার কোনো কাজ নেই,—চিন্তা, ধ্যান, জ্ঞান—কোনোটাই নেই। আমি এতদিন পরে এবার জানতে পেরেছি, নলিনাক্ষকে টেনে তোলাই আমার জীবনের একমাত্র কাজ।

চিঠিখানা সুচারু সেইদিনই পাঠিয়ে দিল। বৃষ্টি নামলো। লক্ষ্মী-নিবাসের ওপরে করোগেটের চালা,—শীতের রাতের বৃষ্টিতে চালা থেকে জল চুঁইয়ে পড়ে কি না, জানবার জন্য ছাতা মাথায় দিয়ে বৃদ্ধ

ডাক্তার বেদী বারান্দায় এসে উঠলেন। দরজা ঠেলাঠেলি করতে ভিতর থেকে বিশুনলাল দরজা খুলে দিল। ডাক্তার বললেন, মায়িজী কোথায়?

এখনও আসেন নি।

সে কি, রাত দশটা বাজে, এই ভয়ানক শীত—বৃষ্টি হচ্ছে পাহাড়ে—তিনি এখনও বাইরে? কখন বেরিয়েছেন?

সকালে।

স্ট্রেঞ্জ।

বেদী ঘরের মধ্যে চিন্তান্বিতভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, না, কোথাও জল চোঁয়াচ্ছে না। তারপর কি যেন ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় সর্বাঙ্গ ভিজে সপসপে অবস্থায় সুচারু বারান্দায় এসে উঠলো।

ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে বললেন, কোথায় ছিলে মা? রাত যে অনেক। এই বৃষ্টি।

সুচারু সহাস্যে বললে, নীচের বস্তিতে গিয়েছিলুম,—ওখানে আমাকে প্রায়ই একটি লোকের কাছে যেতে হয়। তাকে নিয়ে আমি খুবই ব্যতিব্যস্ত, ডাক্তারবাবু।

আচ্ছা, সে পরের কথা,—তুমি এখন কাপড় চোপড় ছাড়ো মা। আমি এসেছিলুম তোমার ঘরে জল পড়ে কিনা দেখতে—বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আমি যাই—

ডাক্তার চলে গেলেন। সুচারু ভিতরে এলো। বিশুন কতকগুলো কাঠ এনে ফায়ারপ্লেসে চাপিয়ে দিল। সুচারু কাপড়চোপড় ছেড়ে আগুনের পাশে এসে দাঁড়ালো।

আগুনটা জ্বলতে লাগলো। তারই পাশে বসে কোনমতে আহারাদি সেরে গরম জলে হাত ধুয়ে বিছানার মধ্যে গিয়ে সুচারু ঢুকলো। বিশুনলাল তার নিজের কাজ সেরে পাশের ঘরে চলে গেলো।

নিবিড়তা! কিন্তু এই অস্থিরতা তার বুকের মধ্যে পোষা থাকলে এ রাত্রি সহজে কাটবে না। অন্ধকারের গ্রাসের কাছে সে বশ্যতা স্বীকার করবে না!

সহসা সুচারু উঠে পড়লো। লেপের বাহিরে কী কঠিন ঠাণ্ডা, এক মুহূর্তে হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে আসে। ফায়ার-প্লেসের দিকে তখনও আগুনের তাপ আছে, কিন্তু সমগ্র ঘরখানার তুলনায় সে উত্তাপটুকু সামান্যই। সুচারু খাট থেকে নেমে আলো জ্বাললো। সামনের দেওয়ালে ঝুলছে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানা ছবি। সুচারু তার নীচে গিয়ে ঠাণ্ডা দেওয়ালে মাথা রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। গলার ভিতর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে একটা আর্তস্বর, কিন্তু সে ত কাঁদে নি কোনোদিন। তার দুঃখ নেই, ব্যথা-বেদনা নেই, কোনো কিছু পাবার জন্য লালায়িত সে নয়, হৃদয়াবেগের ধার সে ধারে না— কামনা-বাসনা-লিপ্সার সে অতীত—তবে? তবে কেন কান্না তার কণ্ঠে? অতীত জীবন তার গৌরবের—সামনের জীবন তার আদর্শের, কিন্তু তবু সে ভিক্ষা চায়। ভিক্ষা চায় সে শক্তি, অখণ্ড অব্যাহত আত্মবিশ্বাস। এ তাকে পেতেই হবে, নইলে অপমৃত্যুর হাত থেকে কারোকেই সে তুলে আনতে পারবে না। ঠাকুর, সেই শক্তিলাভের ইষ্টমন্ত্র আমার কানে দাও। আমাকে প্রবল প্রাণ দাও, প্রখর জীবন দাও,—অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অজেয় শক্তি দাও; জ্ঞানের নির্মল আলোয় মানুষকে ফিরিয়ে আনার অধ্যবসায় দাও।

সুচারুর দুই চক্ষে জলধারা নামলো।

* * *

দোকানের সামনে রোদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে সুশ্রী মেয়েটি ছুরির দিয়ে আলু কুটছিল। অদূরবর্তিনী সুচারুকে দেখে সে বললে বিবি আ রহী ফিন্, করমচন্দ।

ভিতর থেকে করমচন্দ বললে, আনে দেও, কই ফিকর নেহি।

সুচারু সামনে এসে দাঁড়াতেই মেয়েটি পুনরায় বললে, ক্যা, অন্ধেরে বারিষমে কাল রাত মে গ্যা। জানকে ডর মালুম হোতি নহি?

সুচারু বললে, জি, নহি বহিন—ভগবানকো হাত মে জান্ ছোড়া হুয়া—

ইয়ে ত আস্‌লি বাত হুঁ। ভগবান তুমারা ভালা করে। মরদ কাঁহা তুমারি?

দিল্লীমে নোক্‌রি করতা হুঁ।

মেয়েটি আরো যেন কি প্রশ্ন করছিল, এমন সময় নলিনাক্ষ বেরিয়ে এলো। সহাস্যে বললে, ম্যা নে শোচ্ রহা কি কাল আপকা বহুৎ তক্‌লিপ হো চুকা পঁহোছনে। আইয়ে, বৈঠিয়ে অন্দরমে।

সুচারু ভিতরে এসে বললে, আরাম-তকলিফ্—ও দিল্‌কো বাত্ হ্যায়, করমচন্দ্‌জী! উসমেসে তো দিল্ বিগাড়্‌তি নহি···যব তক্ ভগবান্‌কো ভরোসা রাখ্‌তি হুঁ।

ইয়ে ত' দুস্‌রি বাত হ্যায়।

নলিনাক্ষ কথাটা এড়িয়ে গেল, সুচারু লক্ষ্য করলো। নলিনাক্ষর পা-জামাটা আজ ধোপদস্ত, গায়ে লাল পশমের একটা জ্যাকেট, ফুল-হাতা কোর্তা। আজ মাথায় পাগড়ী নেই, আছে কালো পশমের টুপি। তামাটে রংয়ের দাঁড়িতে আজ তার মুখখানা ভরা। লোকটার বড় বড় চোখ, জোড়া-ভুরু, আর ফর্সা টকটকে রং বহুদূর থেকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবচেয়ে বিস্ময় লাগে, চেহারাটা ওর প্রসন্ন, বিস্ময় লাগে—ওর মুখেচোখে এবং বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য-শ্রীতে কোথাও অতীত জীবনের কোন চিহ্ন নেই! কিন্তু একটি কথার আঘাত, সামান্য খোঁচা, ঈষৎ বিরক্তি,—লোকটার হিংস্র চেহারাটা ঘৃণা ও আক্রোশের সমস্ত রেখাবলী নিয়ে বেরিয়ে আসে। সুচারু ছাড়া যে-কোনো মেয়ে ভয় পেতো।

নলিনাক্ষ আস্তে আস্তে বললে, আমার জন্যে আপনি এত কষ্ট স্বীকার করেন, এতে আমি লজ্জা পাই, মিসেস্ রায়।

লজ্জা পান আপনি ?—সুচারুর মুখখানা দীপ্ত হয়ে উঠলো।

হ্যাঁ পাই। আপনি আসেন কতদূর থেকে—এত চড়াই-উৎরাই—আপনাদের তুলনায় আমি কত সামান্য লোক !

সুচারু কাছাকাছি এসে বসলো। আজ যেন একটা চাপা উল্লাস তার ভিতর থেকে ফেনিয়ে উঠছে। আজ প্রথম যেন তার পরিশ্রমের পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। সুচারু বললে, দেখুন, ভালো কাজ করতে গেলে প্রথমে মানুষ মার খায়। আপনি আমাকে যে সব কড়া কথা বলেছেন, তার জন্যে আমি কিছু মনে করি নি।

নলিনাক্ষ বললে, আপনি এসব অসম্ভব কাজ নিয়ে ঘুরছেন কেন ?

সুচারু বললে, কোন কাজই অসম্ভব নয়। যা অসম্ভব, তা সম্ভব হয় ঠাকুরের ইচ্ছায়। আপনি নিজের দিকে চেয়ে দেখুন, আপনার ওপরেও ঠাকুরের দয়া আছে।

নলিনাক্ষ প্রসন্ন হাসি হাসলো। বললে, তা হলে আমাকে কি করতে হবে এখন ?

আপনাকে ? আপনার বিরুদ্ধে দু-তিনটে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। লোকে বলে, আপনি খুনে ডাকাত, লোকে বলে আপনি নাকি নারীহন্তা। আমার ইচ্ছে আপনি অপরাধ স্বীকার করুন।

সেটা কি প্রকার ?

আপনি ধরা দিন। নিজে গিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করুন। বিচারে আপনার শাস্তি হোক, সেই আপনার প্রায়শ্চিত্ত।

নলিনাক্ষ স্তব্ধ হয়ে সুচারুর দিকে তাকালো। পরে বললে, যদি আমার ফাঁসী হয় ?

স্নিগ্ধ হাস্যে সুচারু বললে, হোক না কেন ? সেই মৃত্যু ত

গৌরবের। সেটা ঈশ্বরের নির্দেশ। মানুষের জীবন কতটুকু? কতটুকু তার শক্তি? সমস্ত অপরাধ স্বীকার করতে গিয়ে যদি আপনার মৃত্যু ঘটে, তবে ত আপনি অমৃতলোকের অধিকারী!

চুপ করে কথাগুলি নলিনাক্ষ শুনলো। পরে বললে, এবার আমার কথার জবাব দিন।

বলুন?

নৃপেনবাবুর সঙ্গে আপনার বনিবনা আছে?

আছে বৈকি।

তবে আলাদা থাকেন কেন?

সুচারু বললে, তাঁর পথ আর আমার পথ এক নয়।

আপনার ছেলেমেয়ে আছে?

না।

অসুখ আছে কিছু?

আমি অত্যন্ত সুস্থ।

নলিনাক্ষ বললে, আচ্ছা, একটা কথা বলুন ত—আপনার বাবা কি মা'র বংশে কেউ পাগল ছিল?

আমার জানা নেই।

আপনি কি ছোটবেলায় বদমেজাজী ছিলেন?

হয়ত ছিলুম।

আপনি এক কাজ করুন। এখানে চেরীর জঙ্গলে এক রকম ফল হয়, তার থেকে ঠাণ্ডা তেল পাওয়া যায়। মাহেশ্বরীপ্রসাদের দোকান থেকে এক শিশি সেই তেল নিয়ে মাথায় মাখুন গে। মাথা ঠাণ্ডা হবে।

বিদ্রূপটা অত্যন্ত স্পষ্ট। সুচারুর গলা কেঁপে উঠলো নৈরাশ্যে; উষ্ণ কম্পিতকণ্ঠে সে বললে, আপনি কি ঈশ্বর মানেন না? কিছু মানেন না?

নলিনাক্ষ বললে, আপনার ঈশ্বর যে এত ভয়ঙ্কর, তা জানতুম না। হ্যাঁ, আর একটি কাজ আপনি করতে পারেন। আপাততঃ ঈশ্বরকে ছেড়ে দিন। তিনি আপনার হাত থেকে বাঁচুন। আপনি দিল্লী চলে যান্—সেখানে গিয়ে কিছুদিন স্বামীকে নিয়ে ঘর করুন, ছেলেপুলে মানুষ করুন···অনেক অসুখ সেরে যাবে। আচ্ছা, এবার আমাকে ছুটি দিন।

নলিনাক্ষ উঠে দাঁড়ালো।

কী কদর্য উক্তি লোকটার, কী নোংরা মন! সমস্ত চেহারাটা থেকে ঠিকরে আসছে জঘন্য বিদ্রূপ, ইতর কণ্ঠস্বর। অপমানে সুচারুর মুখখানা কালো হয়ে এলো। উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে, আজকের দিনটাও আমার মিথ্যে হোলো। বেশ, আমি কিছুই মনে করবো না। কিন্তু আপনার মঙ্গলের জন্য একটা কাজ আমি পারি।

নলিনাক্ষ তার দিকে তাকালো।

আমি যদি আপনাকে ধরিয়ে দিই, তাতে আপনার ভালোই হবে।

আমাকে ধরিয়ে দেবেন! মানে, পুলিশে?

হ্যাঁ, পুলিশে!

নলিনাক্ষ দু'পা এগিয়ে এলো তার দিকে। তার চোখ যেন দপ দপ করছে। শান্ত দৃঢ় চাপা কণ্ঠে সে বললে, আপনি পারবেন না।

পারবো না? কেন?

সে ক্ষমতা আপনার নেই।

সুচারু দীপ্তকণ্ঠে বললে, কায়মনোবাক্যে আমি আপনার মঙ্গল চাই বলেই সেই ক্ষমতা আমার আছে।

নলিনাক্ষ বললে, আমার মৃত্যু চান আপনি?

আপনার সমস্ত অপরাধের ধ্বংস চাই।

বেশ, আপনি তবে এখন যান। আমার দোকানে খদ্দেররা খেতে এসেছে।

দোকান থেকে বেরিয়ে সুচারু হন হন করে চলতে লাগলো। এর মধ্যেই সে স্থির করেছে তার কর্তব্য কি। এ ঈশ্বরের নির্দেশ। এ তার বিবেকের সম্মতি। এ কাজ তাকে করতে হবে।

বেলা দ্বিপ্রহর। তাকে উঠতে হবে এখন বহু চড়াই। তার হার্টের অসুখ আছে। প্রত্যেকদিন এই ওঠানামা তার চলবে না। বস্তির দু-একজন মেয়েপুরুষ তার দিকে চেয়ে রয়েছে। তারা হয়ত বুঝতে পারে, এ পথে তার প্রাত্যহিক আনাগোনাটা প্রাণেরই দায়ে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছিটে, চাপা-হাসির টুকরো, বক্রোক্তির ইশারা— সমস্তগুলোই তাকে সয়ে নিতে হয়েছে। সুচারু কোনোদিকে না তাকিয়ে নিজের মনে চলতে লাগলো।

লক্ষ্মীনিবাসে পৌঁছে সেদিন থেকে সে যেন গা এলিয়ে দিল। কয়েকদিন রইলো সে বাংলোর চৌহদ্দির মধ্যে। পশমের সেলাই নিয়ে দু'একদিন বসবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভালো লাগে নি। পথের উপরে ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে এক-আধবার যাতায়াত করেছে, কিন্তু কারো সঙ্গে কোনো আলোচনায় তার উৎসাহ দেখা যায় নি। একটা কিছু নিয়ে এই কয়দিন সে ভাবছে। সেটা কঠোর, সেটা হয়ত হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। তবু সেইদিকেই তার মন কাজ করে চলেছে। কোনো কাজে পিছিয়ে এলে তার চলবে না।

মনুষ্যত্বের বিচারে এই কথা বলে, নলিনাক্ষর শাস্তি হওয়া দরকার। শাস্তির আগুনে সে পুড়বে, সেই তার প্রায়শ্চিত্ত। এখানে দয়া, মায়া, স্নেহ এসব কথা ওঠে না। এগুলো মনের বিকার। মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে এদের মোহ, এদের অন্ধ সংস্কার। এদের হাত থেকে মুক্তিই হোলো বন্ধনদশার শেষ।

সুচারু নিজের মনকে পরিষ্কার করে বুঝে নিল। তারপর নৃপেনকে চিঠি লিখতে বসলো.·· সামনের শনিবার বোধ হয় বড় দিনের ছুটি। শনিবার বেরিয়ে রবিবারে এখানে এসে পৌছবে, অবশ্যই আসবে। নলিনাক্ষর ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করা চাই। তুমি এলে অনেক কথা বলবার আছে। রবিবারে তোমার জন্য রান্না করবো, তারপর মোটরস্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করে থাকবো তোমার জন্যে। ইতি···

জরুরী চিঠিখানা বিশুনলালকে দিয়ে ডাকঘরে পাঠিয়ে সুচারু গরম কাপড়জামা প'রে নিল। পুলিশের ফাঁড়ির পথটা তার জানা আছে। ম্যাল্ রোড ধরে উত্তর-পূব দিকে যেতে হবে প্রায় মাইলখানেক। সুচারু দৃঢ় পদক্ষেপে সেই দিকে চলতে লাগলো।

কোতোয়ালীর গেট্ পেরিয়ে সে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। আজ কী লাবণ্য তার চোখে মুখে, কী প্রসন্ন দীপ্তি তার ললাটে! শুষ্ক চুলের রাশির ভিতরে ঝিলমিল করছে সোনার মতো রৌদ্র, মুখখানায় রক্তিম আভা, দুই চোখে মধুর আনন্দ ঝলোমলো। আজ সে এসেছে ঈশ্বরের নির্দেশে, এসেছে নৈতিক দায়িত্বপালনে। পলাতক নলিনাক্ষকে ধরিয়ে দিয়ে আজ সে জীবনের মহত্তম কর্তব্য সম্পাদন করবে।

কোতোয়ালীর অফিসার বসে ছিলেন নিজের চেয়ারে। সুচারু সোজা ভিতরে গেল। অফিসার তাকে সমাদরে ডেকে বসালেন। সুচারু নিজের পরিচয় দিয়ে বললে, আমার নাম মিসেস্ সুচারু রায়—আমার স্বামী মিস্টার নৃপেন রায়, চাকরি করেন হোম ডিপার্টমেন্টে

আমি এখানে এসে মাঝে মাঝে বাস করি।

নমস্কার!—অফিসার বললেন, বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি? ফরমাইয়ে?

সুচারু বললে, দেখুন, আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী। আমি এসেছি ধর্ম ও সমাজের নামে, নীতি ও মনুষ্যত্বের

নামে। অনেকে মনে করবেন, আমি এসেছি এমন একটি লোকের সর্বনাশ করতে, যে ব্যক্তি আজো আমার কোন ক্ষতি করে নি।

সুচারুর কণ্ঠে আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখা গেল। অফিসার একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন। সুচারু পুনরায় বললে, আপনাকে সত্যিই বলছি, আমি যার শাস্তি চাই—সে ব্যক্তির কোন অপরাধ আজো আমার চোখে পড়ে নি। কিন্তু জানি সে খুনে, ডাকাত, নারীহন্তা—আমি তার শাস্তি চাই।

আপনার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ?

কিছু না। এ আমার সোশ্যাল ওয়েল্‌ফেয়ারের কাজ। আপনার এখানে আমি এসেছি ঈশ্বরের নির্দেশে, বিবেকের সম্মতি নিয়ে।—রুদ্ধশ্বাসে সুচারু বলে গেল।

অফিসার ঘণ্টা বাজালেন। একটু পরে ছোটসাহেব এসে দাঁড়ালেন। বড়সাহেব বললেন, এ মহিলাটি ঠিক কার কথা বলছেন, আমি বুঝতে পারছিনে। ওঁকে আপনি পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে আলাপ করুন।

সুচারু পাশের ঘরে উঠে গেল। তারপর ছোট সাহেবের দিকে ফিরে বললে, আপনাদের এখানে পলাতক অপরাধীর কোনো তালিকা আছে ?

আছে বৈ কি।

দেখুন ত, এক জায়গায় অপরাধ করে অন্য দেশে পালায়, এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে—তাদের রেকর্ড আছে কি না ?

হ্যাঁ আছে। ছোটসাহেব র‍্যাক থেকে খাতাপত্র নামিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি আরম্ভ করলেন।

সুচারু বললে, আমি আপনাদের কাছে একজন পলাতক অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে চাই।—সে এখানেই থাকে।

ছোট সাহেব উল্লসিত হয়ে বললেন, কে? কি নাম?

সুচারু বললে, আমি তাকে ধরিয়ে দিলে আমাকে কি পুরস্কার দেবেন?

আপনাকে? আপনাকে কেইসার-ই-হিন্দ্ মেডেল দেওয়া হবে!

সহাস্যে সুচারু বললে, ছিঃ তা আমি চাইনে। আমি কেবল এই চাই, পুলিশ বিভাগের কর্মচারীরা যেন ঘুষ নেওয়া বন্ধ করেন।

ছোটসাহেব হাসলেন। বললেন, মিসেস্ রায়, এ আপনার ভয়ানক দাবী। সভ্য জাতির পুলিশ মাত্রেই ঘুষ খায়। ধরা পড়ে তারা যাদের হাত পাকা নয়।

আপনারা চেষ্টা করবেন ত?

নিশ্চয়ই—এবার বলুন ত, কোন পালাতককে আপনি ধরিয়ে দিতে চান?

সুচারু বললে, সেই ব্যক্তি ছদ্মবেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বাঙ্গলা থেকে সিঙ্গাপুর, সেখান থেকে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং এখন এখানে। চুরি ডাকাতি, নোংরামি—এ তার পেশা।

কি নাম?

এন চৌধুরী।—সুচারুর যেন দম বন্ধ হয়ে এলো।

বাংগালী?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ছোট সাহেব উজ্জ্বল মুখে খাতাপত্র উল্টিয়ে এক জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। পরে বললেন, হ্যাঁ এই লোকটিই বটে। ওকে ধরাতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা আছে। এই বলে তিনি ঘণ্টা বাজালেন।

একজন সিপাহী এলো। তিনি বললেন, ফৌজকে তৈয়ার হোনে কহো। দেখুন, লোকটির নামে তিনটে বডি-ওয়ারেণ্ট আছে। এই

লোকটি অমৃতসরের রেশমকুঠী থেকে তিরিশ হাজার টাকা লুঠ করেছে ছ'মাস আগে। চলুন আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

চলুন।—সুচারু উঠে দাঁড়ালো।

সমস্ত ব্যাপারটা যন্ত্রচালিতের মতো হয়ে যাচ্ছে। এখানে কোন ব্যক্তিগত আক্রোশের কথা নেই। ঘৃণা, হিংসা, প্রতিশোধ—কোনো কথাই এখানে ওঠে না। বিচারটা নিষ্ঠুর, কিন্তু নির্ভুল। তাকে সমাজসেবা করতে হবে, কেননা সে সমাজিক মানুষ। একজন অপরাধীকে শাস্তি দিলে বহু মানুষ নিরাপদ হবে—এইটি তার লক্ষ্য। এটা বিধাতার নির্দেশ, বিবেকের বিচার। নলিনাক্ষর ফাঁসী হোক, কিংবা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হোক—কিছু এসে যায় না। যদি তার মৃত্যু ঘটে তবে মৃত্যুতেই রূপান্তর; যদি দীর্ঘ কারাবাস হয়, তবে তাইতেই আমূল পরিবর্তন। এযুগে বোধ হয় সকলের বড় কাজ হোলো, অপরাধকে ধ্বংস করা, অপরাধীকে খুঁজে বার করা। শুধু নলিনাক্ষ অপরাধী নয়—অনেকেই আছে সমাজের অনেক স্তরে। অশিক্ষিতা জননী সন্তানকে মূঢ় বানিয়ে তোলে, স্নেহান্ধ পিতা সন্তানকে করে কাপুরুষ। আছে তরুণী যুবতীর দল। বহুবিধ ছলাকলা আর সাজ-সজ্জার ইঙ্গিতে নির্দোষ পুরুষকে তারা আকর্ষণ করে, তাদেরকে নীচে নামায়। অজ্ঞান ছাত্র মাথা তুলতে পারে না শিক্ষকের মূঢ়তায়। অশিক্ষিতা স্ত্রী আর অপরিণামদর্শী স্বামী—এদের দুজনের ঘরকন্না নিত্য অভিসম্পাতে ভরা। অপরাধ, মালিন্য, পাপ, লজ্জা—এই সব নিয়ে ভরে ওঠে মানুষের সমাজ। তাদের ওপরে আঘাত হানো, হানো বজ্র, হানো অপমৃত্যু—তারপরে এসে পৌঁছবে শুচিশুদ্ধ নির্মলতা। এই কাজ নিয়ে থাকুক তার জীবন, এই কাজ নিয়ে ঘটুক তার মৃত্যু! সে মৃত্যু মহিমময়।

ছোট সাহেব বললেন, দেখুন, আমরা যাচ্ছি দিনের বেলায়। আগে থেকে গন্ধ পেয়ে অপরাধী গা ঢাকা দেবে না ত?

সুচারু বললে, আমার বিশ্বাস সে ভীরু নয়।

আপনি রাস্তাটা ঠিক দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আমার সঙ্গে প্রায় চল্লিশজন লোক আছে।

সুচারু বললে, আচ্ছা ধরুন, অপরাধী যদি অপরাধ স্বীকার না করে? আপনারা কি করবেন?

আমরা? আপনাকে কিছু বলতে হবে না। কয়েদখানায় তাকে নিয়ে যে যন্ত্রণা দেবে, সে আপনাদের জানা নেই,—কোন ভদ্র মানুষ হাজতের খবর জানে না।

সুচারু প্রার্থনা করলো, ঈশ্বর নলিনাক্ষর সহায় হোন্। তার কর্তব্য হোলো দোষীকে ধরানো, তারপরে রইলো ঈশ্বরের আমোঘ বিধান। সুচারুর কর্মের ভিতর দিয়ে তাঁর ইচ্ছার প্রকাশ, সুচারুর জীবনের ভিতর দিয়ে তাঁর নির্দেশ।

বহু পথ তারা পেরিয়ে গেল, বহু চড়াই আর উৎরাই। শহর থেকে পথ অনেক দূর, যেন সে পথের আর শেষ নেই। এদিকে দোকানপত্র আর দেখা যাচ্ছে না; মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে লাল পাথুরে মাটির তৈরী এক একখানা ঘর। কোনো কোনো কন্দরে ঝরণার ক্ষীণ ধারা আজও বয়ে যাচ্ছে। শীতের হাওয়ায় যে সব ফুল আসে, তারা প্রচুর ফুটে রয়েছে বনময় পাহাড়ের গায়ে গায়ে। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে নন্দাদেবীর বিশাল তুষারময় চূড়া, তার কোলে পর্বতমালার এক একটি স্তর। অরণ্যের নিবিড় নৈঃশব্দ্য চারিদিকে। কিন্তু এদিকে ত সুচারু কোনদিন আসে নি? এ পথ কি সেই পথ নয়?

ছোট সাহেব বললেন, মিসেস্ রায়, এর পরে আর কোন দোকান নেই, বস্তিও নেই—আছে দেহাত। আপনি কি এই পথে তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন?

আমার তাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমরা কি ঠিক এসেছি?

আপনি কি সেই মোহল্লার নাম জানেন না।

না।—সুচারু থতিয়ে জবাব দিল।

ছোট সাহেব এক জায়গায় এসে থামলেন। বললেন, এর পর এ পথ নেমে গেছে জঙ্গলের মধ্যে। আর কি এগোনো ঠিক হবে?

সুচারু উদ্‌ভ্রান্তভাবে বললে, বোধ হয় না।

তবে চলুন ফিরি।—এই বলে ছোট সাহেব চতুর কটাক্ষে সুচারুর দিকে তাকালেন। পুনরায় বললেন, আপনার মনে বোধ করি কিছু উত্তেজনা আছে, তাই পথ ভুল করেছেন!

সুচারু বললে, উত্তেজনা? কিছুমাত্র নেই।

তবে কি সিমলার রাস্তাঘাট আপনার যথেষ্ট পরিচিত নয়?

তা হতে পারে।

সেই পথ ধরেই তাদের ফিরতে হোলো। ছোট সাহেব বললেন, সবচেয়ে ভালো হয়, আপনি যদি টেলিফোনে কোতোয়ালীতে খবর পাঠান। আচ্ছা বলুন ত, আপনার সঙ্গে আসামীর কেমন করে আলাপ হোলো?

সুচারু বললে, একদিন স্বামীর সঙ্গে আসছিলুম, হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়। আমরা আলাপ করলুম।

লোকটার চেহারা কেমন?

অতি চমৎকার। যেমন স্বাস্থ্য তেমন শ্রী। যদি সে অপরাধী না হোতো, তাকে রাজকুমার বলে মনে করতুম। এমন রূপবান আমার জীবনে কমই দেখেছি!

ছোট সাহেব ঈষৎ পুলকিত বোধ করলেন। পুনরায় প্রশ্ন করলেন, আপনার স্বামী থাকেন দিল্লীতে,—এর মধ্যে কি অপরাধীর সঙ্গে আপনার একলা দেখাশোনা হয়েছে?

সুচারু বললে, হয়েছে বৈ কি। একবার নয়, অনেকবার। লোকটি আলাপ করে চমৎকার, কথা বলে প্রিয় বন্ধুর মতন। কেবল তাই নয়, তার মিষ্ট কথাবার্তা শুন্‌লে কখনও সন্দেহ হয় না।

সে কি আপনার কোনো অনিষ্ট করেছে ?

সুচারু সহাস্যে বললে, আমার অনিষ্ট করা যায় না, মিষ্টার চৌবে।

চৌবে বললেন, যে ব্যক্তি আপনার কোন অনিষ্ট করে নি, তাকে ধরিয়ে দিচ্ছেন ? এর ফল কি জানেন ?

জানি। তার হয় ত ফাঁসীও হতে পারে। তবু আমার কাজ আমি করতে চাই। তার সব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হোক।

ছোট সাহেব আর কোন কথা বললেন না।

প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটতে হাঁটতে এসে সবাই আবার কোতোয়ালীর কাছে পৌছলো। ছোট সাহেব এবার বললেন, দেখুন, কিছু মনে করবেন না,—আপনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে একটু রহস্যজনক মনে হচ্ছে। আপনি আগে পথ চিনুন,—মানে, পথ আগে খুঁজে বার করুন, তারপর আসামীকে ধরবার কথা তুলবেন।

সুচারু হতচকিত হয়ে এবার একবার এদিক ওদিক তাকালো। পরে বললে, আমাকে ক্ষমা করবেন। এতক্ষণ আমি যেন একটা দুঃস্বপ্নের ঘোরে ছিলুম। কিন্তু এবার বুঝতে পেরেছি, এ পথ নয়। আমি ভুল করেছি। এটা সম্পূর্ণ উল্টো রাস্তা। এবার যদি আমার সঙ্গে আসেন তবে ঠিক পথ চিনে যেতে পারবো।

সে যেন এবার চঞ্চল হয়ে উঠলো। সন্দেহ নেই, পথ এবার চিনেছে কিন্তু তা'র এই আকস্মিক উত্তেজনা লক্ষ্য ক'রেও ছোট সাহেব উৎসাহিত বোধ করলেন না। হেসে বললেন, পুলিশকে ভুল সংবাদ দেওয়াটা বে-আইনী, জানেন ত ? কিন্তু আজ থাক্, আপনি পরে ফোন্ করবেন,—আমরা যা করবার তা করবো।

কিন্তু ধরামাছ পালিয়ে যাচ্ছে, মনে রাখবেন।

যথাসময়ে জাল ফেলে টেনে তুলবো, মিসেস্ রায়। আচ্ছা নমস্কার।

প্রতিনমস্কার জানিয়ে সুচারুকেও চলে আসতে হোলো। কিন্তু ফিরবার পথে মনে হ'তে লাগলো, কে যেন তা'র মুখে কালি বুলিয়ে দিয়েছে! সিমলা সহরটা তা'র চোখের সামনে যেন দুলছে। জীবন-মৃত্যুর সাংঘাতিক খেলায় এতক্ষণ সে মেতেছিল, সেই খেলায় আজকের মতন তা'র অপ্রত্যাশিত পরাজয় ঘটলো। সহসা তা'র মনে হোলো, সে কি সমাজসেবার নামে গোয়েন্দার কাজ নিয়েছিল? ভদ্রসমাজের যা ঘৃণ্য, সভ্যজগতে যা সর্বপ্রকার রুচিবিগর্হিত—সেই কদর্য কাজ কি সে বেছে নিল? নিজের কাছেই সে কি আজ হীন প্রতিপন্ন হোলো না? যে-সমাজের জন্য তা'র এই মঙ্গল-কামনা, সেই সমাজ কি তা'র এই নোংরা কাজের তারিফ করবে? হোক্ না নলিনাক্ষ অপরাধী, হোক্ না সে আসামী, হোক্ না সে খুনে ডাকাত—তাকে ধরিয়ে দেওয়া মানে ত' হত্যার ষড়যন্ত্র! অপরাধের কি কোনো মান আছে? এই সিমলা সহরে তা'র নিজের জীবনযাত্রাটা কি সরীসৃপের মতো নয়? বিষাক্ত ফণা বা'র ক'রে সে কি নিজে ঘুরে বেড়াচ্ছে না? মানুষের দুষ্কৃতি ত' আদিম যুগ থেকেই চ'লে আসছে! নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, হত্যা, হানাহানি, পরস্বাপহরণ, প্রবঞ্চনা—এসব ত' সভ্যতার আদিযুগ থেকে। আদিম যুগের মানুষের মধ্যেও ত' এই চেহারা! হঠাৎ সে আজ উঠে দাঁড়িয়ে কি মানুষের সেই ইতিহাসকে বদলাবে? কে সে? কী তা'র পরিচয়? গোয়েন্দাগিরিই কি তা'র লক্ষ্য? অসতর্ক মানুষের পায় বিষাক্ত দাঁত বিঁধিয়ে দেওয়াই কি তা'র গৌরব? কেন তা'র এই চিত্তদারিদ্র্য, কেনই বা তা'র এই স্বভাবের বিকার? নলিনাক্ষ অপরাধী, তা'র কি এসে যায়? নলিনাক্ষ হত্যাকারী ও ডাকাত,—কিন্তু তারো চেয়ে বড় হত্যাকারীরা কি সভ্যতার নাম নিয়ে পৃথিবীতে চ'রে

বেড়াচ্ছে না? একের অপরাধের জন্য সমগ্র সমাজ দায়ী—এ কথাটা কি সত্য নয়? শক্তিমান এবং সম্পদশালী ব্যক্তির বর্বরতাকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করতে কারো সাহস নেই,—কিন্তু যে-নলিনাক্ষ তা'র সমস্ত অপরাধ স্বীকার ক'রে ছদ্মবেশে কায়ক্লেশে জীবনধারণ ক'রে রয়েছে,—তাকে শাস্তি দেবার জন্য কেন এই ইতর লোলুপতা?—ভাবতে ভাবতে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুচারু যেন কাঁপতে লাগলো!

*

* *

নলিনাক্ষর চোখে আজ সুর্মা লাগানো। মাথায় জরির কাজকরা টুপি, গায়ে শীতের জন্য একটা গরম জোব্বা। আজ তা'র মুখখানা পরিচ্ছন্নভাবে কামানো। স্নান সেরে সে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, এমন সময় সুচারু এসে দাঁড়ালো।

নলিনাক্ষ মুখ ফিরিয়ে হেসে উঠলো। সুচারু বললে, বেরোচ্ছেন বুঝি? দোকান বন্ধ কেন?

নলিনাক্ষ বললে, আজ দেহাতি মেলায় গেছে সব। শীতের মেলা, অনেক লোক যাবে।

আপনি কি সেখানেই যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

গরম জোব্বার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে শাদা পিরাণের সঙ্গে এক ছড়া রূপার চেনে বাঁধা বোতাম ঝুলছে নলিনাক্ষর বুকের কাছে; গায়ে তার সুগন্ধি তেলের হাওয়া। চওড়া শালোয়ার তাকে মানিয়েছে।

সুচারু তাকে বাধা দিয়ে বললে, আপনার ভয় নেই?

ভয় আছে বৈ কি, নইলে ছদ্মবেশ পরি কেন?—আজ কিন্তু আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারছিনে। দোকানে আজ কেউ নেই। তা'রা গেছে গ্রামে, কাল ফিরবে। আমাকেও এখনি যেতে হবে।

কিন্তু আপনার গেলে এখন চলবে না যে!

নলিনাক্ষ বললে, কেন বলুন ত?

সুচারু বললে, আমি এলুম এতদূর থেকে,—আপনার সঙ্গে কথা আছে বলেই ত এসেছি!

আপনি ত কথা শেষ করে সেদিন চলে গিয়েছিলেন,? এ-কদিন আশা করেছিলুম আমি ধরা পড়বো। এই ব'লে নলিনাক্ষ খুব হাসতে লাগলো।

সুচারু বললে, আপনি যদি আমার কথা শোনেন, তবে আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইতে পারি।

নলিনাক্ষ তা'র দিকে তাকালো। সুচারুর চুলের রাশি রুক্ষ, মুখখানা শুকনো, চোখের দুটো কোল কৃষ্ণাভ। অনেকগুলি বিনিদ্র নিশা যেন তাদের চিহ্ন রেখে গেছে মুখখানার ওপর। সমস্ত ভঙ্গীটিতে যেন অপরিসীম ক্লান্তি জড়ানো। সে যেন একটু বিশ্রাম পেলে বাঁচে।

নলিনাক্ষ বললে, আপনার অনেক কথারই মানে বুঝিনি, একথাও বুঝতে পারিনে। আপনার কথার বাধ্য হবো কি না জানিনে, কিন্তু আপনি ত' আমার কোনো ক্ষতি আজও করেন নি যে, ক্ষমা চাইবেন? আপনি খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছেন?

সুচারু বললে, দিনের বেলা আমার ওসব হয়ে ওঠে না। অনেক কাজ থাকে আমার।

আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা—এই ত কাজ আপনার! ভেতরে এসে বসতে চান্ একটু?

আপনার যাবার তাড়া আছে যে!

না হয় একটু পরেই যাবো?

সুচারু দোকানের ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। রাত্রে আজকাল একটু একটু তুষার পড়ে, ভিতরে কেমন একপ্রকার ভিজে কাঠের সোঁদা

গন্ধ। সুচারুর চোখে পড়লো, একপাশে এক ঝুড়ি নানাজাতের পাহাড়ী ফুল নানা রঙের।

নলিনাক্ষ বললে, এই ঠাণ্ডা দেশে অনাহারে থাকেন, আপনার ক্ষিধে পায় না ?

ক্ষিধে পেলেই আমি খাইনে!—আপনারা এত ফুল এখানে কেন রেখেছেন ?—সুচারু জানতে চাইলো।

ওগুলো আমি বিক্রি করতে যাবো এমনি কথা আছে।

সেই মেলায় ?

হ্যাঁ। সেখানে সাহেব-মেমরা আসে, তারা ফুল কেনে।

সুচারু বললে, কিন্তু আপনারও ত' খাওয়া হয়নি! এত বেলা হোলো—

কথা ছিল মেলায় গিয়ে খাওয়া দাওয়া করবো!

চলুন না, আমাকেও নিয়ে যাবেন সেখানে ?

নলিনাক্ষ সহাস্যে বললে, আপনি সেখানে গেলে সাহেবরা আপনাকে কিনে নিতে চাইবে!

আচমকা সুচারু নলিনাক্ষর দিকে তাকালো। বললে, মানে, কি বলতে চান্ ?

খুব সাধারণ কথা। এ অঞ্চলে সবাই জানে। মেলায় আসে রাজা মহারাজা, সাহেব-সুবো। যে সব মেয়েছেলেকে পছন্দ হয়, তাদেরকে টাকা দিয়ে ওরা 'আয়া' হিসেবে নিয়ে যায়।

আপনি কি এই কেনাবেচায় সাহায্য করেন ?

নলিনাক্ষ এবার একচোট হেসে উঠলো। বললে, আপনি বোধ হয় ভাবছেন, এইজন্যই পুলিশে আমাকে ধরে না ?

আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছিনে!

ফাঁসীর আসামীও বাঁচতে জানে, মিসেস রায়! আপনি যদি আমার সঙ্গে যেতে চান্ চলুন ?

সুচারু ভুরু কুঞ্চন ক'রে বললে, আমাকে বেচতে পারলে বোধ হয় কিছু টাকা আপনি পান্? আচ্ছা, আপনি কি কোনদিন ভালো হ'তে পারেন না?

নলিনাক্ষ বললে, মন্দ হয়ে যদি জীবনটা আনন্দে কাটে, মন্দ কি? আপনি ত' খুব ভালো,—কিন্তু কই, আপনার মুখে চোখে আনন্দের চেহারা দেখিনে ত'? বরং আমি ত' দেখি, আপনি লোকসমাজের আঁস্তাকুড় ঘেঁটে বেড়ান, খুঁজে বেড়ান্ মানুষের নোংরামি, আর ভালবাসেন মানুষের কলঙ্ককাহিনী টুকে রাখতে।

এই প্রথম সুচারু জবাব দিল না, চুপ ক'রে রইলো। বোধ হয় আঘাত পেয়ে থাকবে এই মনে ক'রে নলিনাক্ষ বললে, কিছু খাবেন আপনি? যদি দয়া ক'রে কিছু খান্ আমার এখানে!

মুখ তুলে সুচারু বললে, কি খাওয়াতে চান্?

আপনার যা খুশি। রুটি, শুকনো মাংস, চর্বি—

ওসব আমি খাইনে।

নলিনাক্ষ বললে, মালাই আছে, ভুট্টার ছাতু দিতেও পারবো। যদি পুরি আর ভাজি খেতে চান্ তা'র ব্যবস্থাও আছে।

সুচারু বললে, আপনি খাবেন কি?

আমি হয়ত সে সৌভাগ্য করিনি, মিসেস্ রায়। কিন্তু আপনার মনে যদি শুধু ঘৃণা থাকে তবে কিছুতে দরকার নেই। বরং দুজনেই দুজনের পথে চ'লে যাই, সেই ভালো।

সুচারু যা কোনদিন কোথাও করেনি, যা তা'র সমগ্র প্রকৃতির বিরোধী,—তাই সে করবার জন্য উদ্যোগী হোলো। গায়ের ওভার-কোটটা আস্তে আস্তে খুলে রেখে বললে, আপনি জোগাড় দিন, আমি আপনার পুরি ভেজে দিচ্ছি।

নলিনাক্ষ জোব্বাটা ছেড়ে রেখে কাঠ এনে উনুনের আঙ্গরার উপর চাপিয়ে ফুঁ দিল। শুকনো কাঠ পেয়ে উনুনটা জেগে উঠলো। তারপর আটা বা'র করলো, বার করলো সব্জি আর আলু, বা'র ক'রে আনলো ঘি আর নুন-মশলা। ফুলের ঝুড়িটা সরিয়ে রেখে এলো পাশের কুঠুরিতে—যেটা তা'র শয়নকক্ষ।

এক সময় বললে, আমি কি আটা ছেনে দেবো?

সুচারু বললে, ওই হাতে? ও হাতে কতগুলো খুন আর ডাকাতি করেছেন?

নলিনাক্ষ বললে, যদি ঘৃণা হয় তবে থাক্।

সুচারু বললে, তরকারিগুলো কুটে দিন্। ছুরি আপনার হাতে মানাবে।

নলিনাক্ষ অনুগত ভৃত্যের মতো কাজ নিয়ে ব'সে গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুচারু বললে, আপনার এ রাস্তা দিয়ে কি সারাদিনে কেউ হাঁটে না?

নলিনাক্ষ বললে, ভয়ানক শীতে কেউ থাকে না এ পল্লীতে। এখন সব বন্ধ। সন্ধ্যার পরে শ্মশান মনে হয়।

আচ্ছা, আপনার এখানে সেই মেয়ে দুটি কে? ওই যারা বসে দোকানে?

এ দোকান ওদেরই। আমি এখানে কাজ করি। আমার দু'-আনার শেয়ার। খেতে আর থাকতে পাই।—নলিনাক্ষ জবাব দিল।

ওরা কোথায় থাকে?

নীচের বস্তিতে।—একটু থেমে নলিনাক্ষ বললে, আচ্ছা, মিসেস্ রায়, আপনি কত লোককে এরকম যন্ত্রণা দেন্? কেউ কি আপনার ভুল ধরিয়ে দেয় না?

সুচারু বললে, ভুল কাকে বলছেন?

ভুল আপনার সমস্তটা। লোকে আপনাকে ভয় করে, সেই ত' আপনার পক্ষে অভিশাপ। দিল্লীতে আপনার জায়গা হয়নি, সেখানে আপনি লোকের দোষ খুঁজে বেড়ান্। সংসারযাত্রায় আপনি মানিয়ে চলতে পারেননি, তাই আপনাকে পালাতে হয়েছে।

সুচারু তা'র মুখের দিকে তাকালো।

নলিনাক্ষ বলতে লাগলো, স্বামীকে আপনি ভালোবাসতে পারেননি, তাঁর ভালোবাসাও পাননি। একথা কি সত্য নয়?

সুচারু বললে, আপনার একথা শোনার অধিকার নেই।

হাসিমুখে নলিনাক্ষ বললে, অজ্ঞানে আপনি ভাসছেন, তাই খুঁটি ধরেছেন ঈশ্বরকে। ঈশ্বর হোলো আপনার পুঁজি, আপনার হাতের হাতিয়ার। ওই নামটা নিয়ে লোককে আপনি ভয় দেখান, বোকারা ওতেই ভয় পায়। এত রূপ আপনার বাইরেটায়, এত সুন্দর আপনার চেহারা,—কিন্তু ভেতরটা? ভেতরে আপনার ভয়ানক অসুখ,—যার ওষুধ কিছু নেই। আমাকে আপনি ধরিয়ে দিতে পারেন, হয়ত তা'তে আমার ফাঁসীও হবে—কিন্তু আপনার পরিণাম? লোকের অশ্রদ্ধায় আপনার তিলে তিলে মৃত্যু! লোকের ঘৃণা কুড়িয়ে বাঁচা আপনার। সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে আপনার নিজেরই কলঙ্ক ঘুলিয়ে উঠবে! আপনি কি জানেন, এ যুগে পাপ আর পাপী কোনটাই ঘৃণ্য নয়? ঘৃণ্য হোলো আপনার মতন অভিজাত মহিলার কুপ্রবৃত্তি?

সুচারুর মুখখানা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠছিল। তবু সে তরকারিটা নামিয়ে লোহার কড়াইয়ে একখানার পর একখানা পুরি ভেজে যাচ্ছিল। কোনো জবাব তা'র মুখে আসছিল না। লোকটা যেন তাকে চারিদিক থেকে বেঁধে গুটিয়ে আনছে।

বাইরে মেঘলা করেছে, ঝড়ো বাতাসের একটা গোঙানি শোনা

যাচ্ছে। এক আধ ফোঁটা বৃষ্টিও চাবুকের মতো ছুটে যাচ্ছিল! তুষার-পাতের পূর্বাভাস মনে হচ্ছে।

নলিনাক্ষ শান্তকণ্ঠে বললে, আপনি কোতোয়ালীতে কেন গিয়েছিলেন আমি জানি। আমারও লোক আছে, তারা খোঁজ পায়। যে-কাজ আপনি করতে গিয়েছিলেন, সে-কাজ কুকুরের,—আপনার নয়। ছোট নৌকা ঠেলা দিলে ডোবে, কিন্তু যুদ্ধের জাহাজ ডোবাতে গেলে মাইনের দরকার—বিরাট তার বিস্ফোরণ! পুলিশ জানে আমি আছি এখানে, কিন্তু তা'রা আসবে না। আমি নিজে ডাকবো, তবেই তা'রা আসবে। আপনি সামান্য মেয়ে, গেরস্থের বউ, আপনার ক্ষমতা সামান্যই। খরগোস ছুটেছে বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে,—এটা হাসির কথা নয় কি?

সুচারু উত্তেজিত হয়ে বললে, তবে, তবে কি পাপের শাস্তি অধর্মের বিচার—এসব কোথাও নেই?

পাপ কি! বিচার কে করবে! কা'কে অধর্ম বলে! শাস্তি দেবার অধিকার কা'র—এসব জটিল তত্ত্ব, এ নিয়ে মাথা খারাপ করবেন না।

চোখ বুজে বাঁচতে বলেন আপনি?

মুখ বুজে থাকতে বলি। এটা সংশয়ের যুগ, গোধূলির কাল,—চুপ করে অপেক্ষা করুন।

বাইরে বৃষ্টি নামলো, তা'র সঙ্গে তুষার-ঝটিকা। দোকানের সামনেটা খোলা, ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঠকঠকে কাঁপুনি লাগছে। ভিতরটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। নলিনাক্ষ উঠে গিয়ে চর্বির ডেলাটায় পল্‌তে জ্বালিয়ে দিল। দোকানের সামনে বৃষ্টির ঝাপটা আসছে, আড়াল কিছু নেই। সুচারু উনুনের ধার থেকে উঠে দাঁড়োলো—তা'র হাত পা জমে যাচ্ছিল। বললে, পর্দা নেই আপনার?

আছে, কিন্তু—

দিন্ পর্দা টাঙিয়ে। এ ঠাণ্ডা অসহ্য।

নলিনাক্ষ বললে, আপনার কোনো অসুবিধে হবে না ?

আমার ? ও—কিন্তু আপনার শীত করছে না ?

নলিনাক্ষ কাঁপছিল ঠকঠক ক'রে।

কোনোমতে আহারাদি সেরে তা'রা উঠলো। কিন্তু বসবার বিশেষ কোনো জায়গা নেই। ওভারকোটটা সুচারু গায়ে চাপিয়ে নিল। নলিনাক্ষ উনুনে অনেকগুলো কাঠ এনে দিল, এতে কিছু গরম হতে পারে। দরজাটা খোলা, সেইটেই সকলের বড় শাস্তি। সুচারু অস্থির হয়ে বললে, হয় পর্দা টাঙান, নয় দরজা বন্ধ করুন। এ পারা যায় না।

নলিনাক্ষ গিয়ে ভিতর থেকে দোকানের দরজা বন্ধ করলো।

কারাগারের মতো ভিতরটা, অনেকটা যেন অন্ধকূপ। কোথাও ছিদ্র নেই, বাতাস একেবারে বন্ধ। মোটা মোটা কালো কাঠের গুঁড়ি আর পাটাতন,—তারই ওপর ঘরখানা দাঁড়িয়ে। চর্বির প্রদীপটা জ্বলছে, আর জ্বলছে কাঠের আগুন।

নলিনাক্ষ আস্তে আস্তে উঠলো, তারপর একটা কাঠের বাক্স থেকে পুরনো পিতলের ওপর মীনাকরা একটা কুঁজো বা'র করলো। সেটা ধরলো মুখের কাছে। সুচারু জানতে চাইলো ওটা কি! জবাবে নলিনাক্ষ বললে, এখানকার এক গাছের পাতার রস, এটা খেলে শীতের ঘা ফোটে না হাতে পায়ে।

নলিনাক মুখে কুঁজোটা লাগিয়ে চুমুক দিল। কটুগন্ধে ভিতরের বাতাসটা ভ'রে উঠলো। তীব্র কড়া গন্ধে গা বমি-বমি করে।

সুচারু বললে, দরজাটা খুলে দেবেন নাকি ?

নলিনাক্ষ গিয়ে দরজাটা আবার খুলে দিল, তারপর ফিরে এসে বসলো উনুনের পাশে কাঠের গায়ে হেলান দিয়ে।

বাইরে তখন তুষারপাত হচ্ছে, বাতাসের কাছে দাঁড়ানো একে-বারেই অসম্ভব। সুচারু এবার নিজেই দরজা বন্ধ ক'রে দিল। এবারে যেন তা'র গায়ে একটু একটু কাঁটা দিচ্ছে।

নলিনাক্ষ একবার উঠলো। বললে, আপনি এই আগুনের পাশে বসুন, আমি পাশের ঘরে যাই।—এই ব'লে সে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে ভিতরের কুঠুরীর দিকে চ'লে গেল।

লোকটার চাঞ্চল্য নেই, উত্তেজনা নেই, অসৌজন্য নেই,—অসংযমের একটি ভঙ্গীমাত্র নেই।

কতক্ষণ—কতক্ষণ সুচারু আগুনের পাশে ব'সে রইলো তার হুঁস নেই। দুখানা হাতের ওপর চিবুক রেখে সে নিশ্চল হয়ে ব'সে ছিল। খণ্ডকালটাই যেন অনন্তকাল! চর্বির প্রদীপটা নিবে গেছে, রয়েছে অন্ধকারে কেবল কাঠের আগুনের আভা। আশ্চর্য, নলিনাক্ষর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই, ওদিকটা যেন নিঃসাড়। সুচারু ধীরে ধীরে উঠে একবার দরজাটা একটু ফাঁক করলো। বাইরে তুষারের ঝড় নেই, কিন্তু যুঁইফুলের মতো বরফ পড়তে আরম্ভ করেছে। আশ্চর্য, এতক্ষণ ধ'রে তা'র দুই চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। সেটা চিত্তবিকার-নিংড়ানো রস, সেটা হৃৎপিণ্ডের রক্ত—সঠিক কিছু বুঝতে পারা যায় না। সেটা অশ্রু—এই শুধু তা'র পরিচয়। কিন্তু ওই লোকটার কাছে তাকে অপরাধ স্বীকার করতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে। যাবার আগে ওকে ব'লে যাওয়া চাই, ভুল পথে হাঁটা হয়েছিল।

চোখের জল মুছতে গিয়ে আরো এলো কান্না! এ যেন নিরুপায়ের কান্না, যেন অশ্রুর সমুদ্র! হয়ত জীবনটা গোড়া থেকেই ভ্রান্ত, আগাগোড়াই ব্যর্থ। কিন্তু স্বভাব-দুর্বৃত্তের কাছে এ স্বীকারোক্তি না করলেও চলবে, এটা মেয়েমানুষের ইষ্টমন্ত্র! সুচারু পা

বাড়ালের অপরিমেয় বোঝায় দুই পা ভারাক্রান্ত! তবু চললো পা টিপে টিপে।

চোর কুঠুরীর ধারে এসে সে দাঁড়ালো। ভিতরে একটি ছোট্ট ময়লা কাঁচের জানলা, তা'র ভিতর দিয়ে এসেছে একটুখানি ঘোলাটে আলো। লোকটা অঘোর ঘুমে প'ড়ে রয়েছে কম্বলের মধ্যে,—কী দরিদ্র শয্যা! মাথার কাছে কয়েকখানা লোহার অস্ত্র, একখানা বর্শা। ময়লা বালিশের তলা থেকে বেরিয়ে আছে একখানা বড় ছোরার অগ্রভাগ। কোনো একখানা অস্ত্র দিয়ে এখনই ওকে শেষ করা চলে।

হঠাৎ মনে এলো প্রার্থনার ভাষা। দুজনের ব্যর্থতার জন্যই এখানে কান্না রেখে যাওয়া যায়। সুচারু সেই বিছানার ধারে নতজানু হয়ে ব'সে পড়লো,—এবং তারপরে—তারপরে সে নত হয়ে নিদ্রিত নলিনাক্ষর হাতের কাছে মাথা রেখে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো।

বাইরে জনহীন পথ সবাই জানে। বরফ পড়েছে অপরাহ্নে,—সেই বরফে পথ আকীর্ণ। ছোট ছোট পাহাড়ী ঝরণার ধারা জমাট বেঁধে গেছে। বরফ পড়ছে তখনও অবিশ্রান্তে, নিঃশব্দে।

সন্ধ্যা তখনও ঘোরালো হয়নি,—সুচারু বেরিয়ে এলো। পিছনে পিছনে এলো নলিনাক্ষ। ওই যা, ওভারকোটটা ভুলে এসেছে। নলিনাক্ষ ওভারকোটটা তাড়াতাড়ি তা'র কুঠুরীর থেকে এনে পিছন দিক থেকে সযত্নে সুচারুর গায়ে জড়িয়ে দিল। বোতামগুলোও জামার ছিদ্রে এঁটে দিল ওই সঙ্গে। সুচারুর এখন আর কোনো আড়ষ্টতা নেই। নলিনাক্ষ বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

সুচারু পথে নামলো। বরফ পড়ছে জুঁইফুলের মতো। পথে বরফ জমাট মিছরির মতো দানা বেঁধে উঠেছে। তা'র উপর দিয়ে সুচারু অসাড় দেহ নিয়ে চললো।

পিছন থেকে নলিনাক্ষ মধুর হেসে বললে, বড্ড বরফ! মাথার একটা ঢাকা এনে দেবো?

সুচারু কোনো সাড়া দিল না।

নলিনাক্ষ পুনরায় সহাস্যে ডাকলো, আবার কবে শুভাগমন হচ্ছে?

আত্মগ্লানিতে আকণ্ঠ সুচারু এবারও কোনো জবাব দিল না। তা'র যেন মৃত্যু ঘটে গেছে।

* * * *

মোটরস্ট্যাণ্ডে নেমে নৃপেন স্ত্রীকে কোথাও খুঁজে পেলো না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো, তারপর স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে হাঁটতে সুরু ক'রে দিল। এটা সুচারুর পক্ষে নতুন, কখনও সে কথার খেলাপ করেনি। আরো আশ্চর্য, বিশুনলালকেও সে পাঠায়নি। কিন্তু গিয়ে ঢোকবার আগে নৃপেন একটা সিগারেট ধরালো। প্রচুর টান দিল সিগারেটে। প্রতি পাঁচমিনিট অন্তর একটা সিগারেট না ধরাতে পারলে এ ঠাণ্ডায় দাঁড়াবার উপায় নেই। বাংলোয় গিয়ে একবার ঢুকলে সিগারেট একেবারে বন্ধ। সুচারু তার চরিত্র নষ্ট হবার কোনো সুযোগ এ-জীবনে দিল না।

লক্ষ্মীনিবাসে এসে ভিতরে ঢুকে স্যুটকেশটা রেখে নৃপেন দেখলো তার স্ত্রীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবাই। স্ত্রী নিদ্রিত। আজ সকাল থেকে নাকি তাঁর ঘুম ভাঙেনি। ঠোঁটের নীচেটায় বেগুনি রং ধরেছে।

প্রস্তর-মূর্তির মতো নৃপেন সামনে এসে দাঁড়োলো। বিশুনলালের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। শোনা গেল, একটু আগে নাকি একজন বড় ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে গেছেন। হার্টের অবস্থা খারাপ ছিল, সেটা ফেল করে গিয়েছে। ডাক্তার বেদী রোগিনীকে শেষ পরীক্ষা ক'রে বললেন, অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে আর দেখা হোলো না, মিস্টার রায়।

নৃপেন চুপ করে রইলো। গায়ত্রী দেবী মেয়েদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন, বিশুনলাল গেল পাশের ঘরে।

ডাঃ বেদী শান্তকণ্ঠে বললেন, একটু আগে ডাঃ সোহন সিং এসেছিলেন, তিনিই ডেথ্ সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন।

নৃপেন কি যেন বলতে গেল, কিন্তু স্বর ফুটলো না।

সহসা ডাঃ বেদীর কি যেন মনে হোলো। তিনি মৃতদেহের চোখের কোল আর অধরের রেখা লক্ষ্য ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তারপর কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বললেন, একটা কাঁচের পাত্র আনো দেখি ?

নৃপেন একটা কাঁচের মুখ-ধোয়া বাটি এনে পাশের টিপাইয়ের ওপর রাখলো। বেদী দ্রুতহস্তে একটা পাম্পের নল চালিয়ে দিলেন মৃতের মুখগহ্বরে। জীবিত মানুষের পক্ষে সেই প্রক্রিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হোতো সন্দেহ নেই। ডাঃ বেদী বাইরের থেকে পাম্প করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে কাচের পাত্রে উঠে এলো এমন পদার্থ, যা দেখে ডাঃ বেদী অলক্ষ্যে শিউরে উঠলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, মিস্টার রায়, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে তেমোর স্ত্রীর মৃত্যু ঘটেনি।

তবে ?

উনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন! তুমি এখনই সৎকারের ব্যবস্থা করো, নইলে ব্যাপারটা বিশ্রী দাঁড়াবে!

নৃপেনের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তবু বললে, আপনি কী বলতে চান্ ?

বলতে চাই এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, স্বেচ্ছা মৃত্যু!

ডাঃ বেদী হয়ত আরো কিছু বলতে পারতেন, কিন্তু এরপর মুখ বুজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

জয়ন্ত

প্রথম পরিচয়টা ঘটেছিল কিশোর বয়সে, ঘন সান্নিধ্যের সুযোগে দিনে দিনে নিবিড় হয়েছিল সে পরিচয়। দুই দিকে দুই কূল, নদী বয়েছিল মধ্যপথে—একজনের বাঁধন ছিল অন্যজনের হাতে। পালিশ করা ভাষায় তাকে বলো বন্ধুত্ব, ওরা সেটাকে সোজা কথায় বুঝে নিয়েছিল ভালোবাসা।

প্রথম দিকটায় রঙ, পরের দিকটায় রস। সোনার স্বপন বুনেছিল দুজনে অলস বেলায় বসে, মন উড়েছিল তেপান্তরে, তুলি বুলিয়েছিল আকাশে, নীরবে বসে বসে পড়েছিল অন্ধকারের ভাষা; বিশৃঙ্খল প্রলাপের সঙ্গে জুগিয়েছিল উচ্ছৃঙ্খল আলাপ।—সেই গানের রেশটাই এখন কানে বাজে। রঙের পরে এল রস, তখন চেহারাটা অন্য রকম। যোগীর আসনে বসলো প্রেম, নদী নিস্তরঙ্গ, নিজেকে খুঁজছে গভীরের দিকে চেয়ে, ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে আত্মার মুকুরে। গ্রহের সঙ্গে তারকার তখন অবিচ্ছেদ্য আকর্ষণ ঘটেছে। দূরে গেলে টান পড়ে, হৃদয় থেকে ওঠে তুরঙ্গের উচ্ছ্বাস, শিরা উপশিরা ও স্নায়ুতে ওঠে কোলাহল।

এমন দিনে নিয়তি দেবী এসে রাশ ধরলেন। জীবনের রথ চলল অন্য পথে। ছাড়াছাড়ি হোলো দুজনে।

তারপরে যবনিকা উঠল এই আজ। সাঁওতাল পরগণার শহরের প্রান্তে গ্রহচক্রের ঘূর্ণ্যমান পথে নিয়তির সেই রথ এসে অকস্মাৎ থামল। বিরজাই প্রথমে এল এগিয়ে, হেসে বললে, আমিই হার মানলুম। ক'দিন ধরে দেখছি পথে, কথা বলবার সাহস পাইনি। কেমন আছ? চিন্‌তে পার?

জয়ন্ত বললে, না। চেনবার ত আর উপায় রাখোনি? পোড়া চোখ আমার, দেখতেই শিখল কাঙালের মতো, চিনতে শিখল না।

কতকাল পরে দেখা, এদেশে কোথায় এসেছ?

চুলোয়। চুলোয় যেতে পারিনি তাই এসেছি এখানে। তাই ত ভাবছি দুদিন ধরে, চেনা মানুষ অথচ হিসেবের কোঠায় খুঁজে পাইনে কেন। সন্দেহ হয়, দু পা এগিয়ে তিন পা আসি পিছিয়ে; তোমার চারিদিকে পরস্ত্রীর পরিমণ্ডল, সেই গণ্ডীর ভেতরে পা দেবো এমন রাবণ আমি নই।

চলতে চলতে কথা হতে লাগল। বিরজা বললে, আমিই এলুম গণ্ডীর বাইরে, হোলো ত? বাবা রে, তুমি যে মাথা ছাড়িয়ে একেবারে দিগ্‌গজ হয়ে উঠেছ। ডাকাতের মতন চেহারা। একদম আলাদা মানুষ হয়ে গেলে এই সাত আট বছরে?

তুমিই কোন্ কম বিরজা? জয়ন্ত বললে, আমার সমালোচনা করছ নিজের স্বরূপটা দেখবে বলে। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে তুমিও ত—

থামো। ঝগড়া ক'রো না এতদিন পরে। এখানে কোথায় এসেছ আগে শুনি।

চাকরিতে। হয়ত চলে যাব শীঘ্র।

তা যেও। বাড়ীর খবর ভাল ত? বিয়ে করেছ?

জয়ন্ত হেসে বললে, বাড়ীর খবর ভাল এবং বিয়ে করেছি। স্ত্রীর নাম অনুভা দেবী।

বেশ নাম। বাসা কত দূরে? নিয়ে যাবে ত?

গেলেই হয়!—জয়ন্ত মাথা হেঁট করে বললে।

মন থেকে কথা বলো জয়ন্ত। আগে তোমার কথায় থাকত প্রাণের উত্তাপ।

জয়ন্ত বললে, সেটা সাত আট বছর আগে। তখন প্রাণ ছিল

সামান্য, উত্তাপ ছিল বেশি। এই উত্তাপ কমে দিনে দিনে। একদিন একেবারে যায় ঠাণ্ডা হয়ে, তখন তুলতে হয় চিতার আগুনে।

বিরজা বললে, হার মানব না আজ, পথে ডেকেছি গরজ ক'রে। দুজনেই ধরা পড়লুম দুজনকে এড়াতে গিয়ে। তুমি দেখছিলে দু'দিন, আমি লক্ষ্য করছিলুম পাঁচ দিন ধরে।

জয়ন্ত বললে, সময়ের হিসেবটা অত বাড়িয়ো না বিরজা, দুদিনের গভীরতা দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতাকে সহজেই হার মানায়!

ধমক দাও, শুনব। একদিন আমার ধমক খেয়ে তুমিও পালাতে তল্লাট ছেড়ে। আমি শুধু বলছিলুম, মেয়ে হয়ে জন্মেছি তাই জ্বালা অনেক, মরণ কাল পর্যন্ত মনের কাঁটা বারে বারে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়।

আজও দেখছি মুখ সাম্‌লে কথা বলতে শেখোনি। এ কথায় তুমি হয়ত ছোট হবে না, কিন্তু মেয়েরা পাবে লজ্জা। এখন কোন্‌দিকে যাবে বলো।

বিরজা বললে, পথ ত এই একটাই, পৃথিবীও গোলাকার। দূরে যাবো কিন্তু হারাবার ভয় নেই। দাঁড়াও, ওদের একবার দেখি।

জয়ন্ত বললে, দেখতে আর হবে না। জানি ওই প্যারাম্বুলেটরে বসানো চার বছরের মেয়েটি তোমারই। ওর চেহারায় দেখেছি তোমারই অতীত কাল। ওর চোখে তোমারই ভুলে যাওয়া ভাষা।

কবিত্ব ক'রে সময় নষ্ট ক'রো না—বিরজা বললে, এখন যাবে কোন্‌ দিকে?

জয়ন্ত বললে, দুজনেরই এক প্রশ্ন! পথ ঠিকই ছিল, পথ ভোলালে তুমি। আমার বাসায় যেতে চাও?

সাহস হবে নিয়ে যেতে? অনুভা আছেন ত? বিরজা বললে হেসে।

তিনি আছেন বলেই সাহস হবে। ভয় করেন না তিনি স্বামীকে।

গৃহস্থালীর সঙ্গে আমাকেও পেয়েছেন। তাঁর স্নেহ যত্নের ঘরকন্নায় আমিও একটি সাজানো আসবাব। তাঁর ধারণা, রাখতে জানলেই আমি থাকব, আমার ক্ষয় নেই।

কিন্তু আমার যে আছে ভয়। মেয়েদের প্রকৃত চেহারা মেয়েরা চেনে। আজকে ভাবতে দাও, আর একদিন যাবো।

ভাল কথা, তাগাদা দেব না। সহজে যদি না যাও অনুরোধেও যেয়ো না। সামাজিকতার দিক থেকে অনুরোধ করব, আমার মান রেখ, অস্বীকার করে আমায় সম্ভ্রমকে বাঁচিয়ো। ক্ষিতীশবাবুর খবর কি ?

বিরজা বললে, মনে আছে তাঁর নাম সাত বছর পরেও ?

তাঁর নামটাই ত আমার মনে থাকার কথা বিরজা, তাঁর আবির্ভাবেই ত আমার ইতিহাসের আরম্ভ। কোথায় তিনি ?

—কল্‌কেতায়। চাকরি নিয়ে ব্যস্ত, আসতে পারলেন না সঙ্গে। ইতিমধ্যে হয়ত একবার আসতেও পারেন।

—তোমাকে দেখে মনে হয় চাকরিটা তাঁর উঁচুদরের। শুনব একদিন ভাল ক'রে তাঁর কথা। বর-বিদায়ের দিন তাঁর সেই হাসিমুখ মনে পড়ে।

বিরজা বললে, আমার মুখেই কি হাসি ছিল না জয়ন্ত ?

থাকারই ত কথা। জয় করে নিয়ে গেলেই মেয়েরা থাকে খুশী। আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি এই যা দুঃখ।

ওটাকে তুমি জয় বলো না জয়ন্ত। অনুভাকে তুমি জয় করোনি, গোড়ায় তোমাদের দান গ্রহণের সম্পর্ক। এস মাঠের ধারে বসে পড়ি।

জয়ন্ত বললে, যদি না বসি ক্ষুণ্ণ হোয়ো না, বসব কাল। ট্রেণে ডিউটি পড়েছে সন্ধ্যায়, ফিরতে রাত হবে। কাল যথাসময়ে এসে হুজুরে হাজিরা দেবো, এখন বিদায় দাও দেবি। ঠিকানাটা দাও।

যদি না দিই ঠিকানা ?

খুঁজে নেবো। বাড়ী বাড়ী টহল দেবো। ভয় করিনে কা'কেও। বুঝে নিয়েছি কতদূরের জল কত দূরে যেতে পারে।

পথটা দেখাবার নয়। খুঁজেই নিয়ো। নিয়ো কিন্তু। তোমাকে যখন দেখেছি, তখন না দেখতে পেলে সময় কাটানো ভার হবে।

জয়ন্ত বললে, বলো বিরজা, বলো। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করুক, চোখ দিয়ে শুনি তোমার কথা। বলো শুনি আর একবার।

আর শুনতে হবে না, সময় নষ্ট হবে তোমার। আজকের মতো ছাড়াছাড়ি হোক। নমস্কার জানাতে হবে নাকি যাবার সময় ?

জানানো উচিত। জানিয়ে যাও বিয়ের পরে তুমি কেতাদুরস্ত হয়েছ। সভ্য হয়েছ।

বিরজা হেসে পিছন ফিরে চলতে লাগল।

জয়ন্তর ঘুম ভাঙল পরদিন বেলা দশটায়। যামিনীযোগে গিয়েছিল জামতাড়ায়, ফিরল তখন ভোর ছটা। পা-জামা খুলে ধুতি পরবার আর অবকাশ ছিল না, মহারাজের হাতে এক পেয়ালা চা গিলে বিছানায় উঠল। নিশ্চিন্ত মন, ঘুমিয়ে পড়তে এক মিনিট দেরি লাগল না। যে ভঙ্গীতে শুলো সেই ভঙ্গীতেই তার এক সময় নাক ডেকে উঠল, কেবল একবার অনুভা এসে তার গায়ে একখানা শাল চাপা দিয়ে গেল। নিদ্রারসে ভরা মনে প্রিয়তমার ছোট ছোট সেবা আন্তরিক তৃপ্তি দেয়। অনুভা জানে সেবা করলেই পুরুষ খুশী।

অল্প অল্প শীত। এমন ঠাণ্ডায় আরাম আছে। বারান্দায় রোদে এসে জয়ন্ত দাঁড়াল। বললে, চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছি, বাকি রইল আর চার ঘণ্টা।

স্লাইস করা কেক, আর কমলা লেবু রেকাবে সাজাতে সাজাতে অনুভা হেসে বললে, একটা বছর ত ঘুমিয়েই কাটালে, জাগলে আবার কবে ?

তবে চাকরিটা করছি কি নাক-ডাকা অবস্থায় ?

তা ছাড়া আবার কি। সেদিন মনে পড়ে না, ধানবাদে নামবার কথা, নেমেছিলে আসানসোলে ? আমি বড়বাবু হলে তোমাকে বরখাস্ত করতুম।

কিছু মিষ্টান্ন দিয়ে রেকাবটা অনুভা স্বামীর দিকে বাড়িয়ে দিল।

জয়ন্ত বললে, ভূমিকার দরকার নেই, কালকের ঘটনাটা শোনো অনুভা। দেখলুম বিরজাকে পথে, সাত বছর পরে দেখা।

সেই যাঁর গল্প তুমি করেছিলে ?

গল্প করেছি কিন্তু দাঁড়ি টানিনি। ক্রমশঃ প্রকাশ্য গল্প, বাল্যকাল থেকে সুরু। হ্যাঁ, সেই বিরজা, আমার কিশোর কালের বন্ধু, থাকতে হয়েছিল কিছুকাল এক বাড়িতে। মায়াবদ্ধ জীব, সহজেই পড়েছিল ভালোবাসা। তারপর একদিন বিয়ে হয়ে গেল বিরজার, স্বামীর ঘর করতে গেল উধাও হয়ে, অতি সাধারণ গল্পের প্লট্।

অনুভা বললে, বলতে চাও প্রথম বয়সের প্রেম ?

প্রেম নয় অনুভা, সাথীত্ব। তাই যেদিন বিরজা গেল চলে সেদিন জাগল না বিরহ-বেদনা, তখন হৃদয় ছিল না, ছিল মন—বেজেছিল বিচ্ছেদের আঘাত।

তোমার সাধুভাষার কেরামতি আমি বাপু বুঝতে পারিনে। যাও চান ক'রে এস। আজকে দেখা হোলো বিদেশে কেমন করে ? ষড়যন্ত্র কিছু ছিল নাকি ? আজকাল জ্ঞানের চেয়ে বুদ্ধির ব্যবসায়ে লাভ বেশি।

হেসে জয়ন্ত বললে, যাক্, বাঁচলুম এবার, সন্দেহের খোঁচা দিয়ে তুমি এতক্ষণে আমাকে দুর্ভাবনা থেকে উদ্ধার করলে।

অনুভা বললে, তবে ত দিন তোমার আনন্দেই কাটবে। একে

বিদেশ তায় পেলে মেয়ে-বন্ধু। দেখো যেন চাকরিটে বজায় থাকে। আনো একদিন দেখি তোমার বিরজাকে?

দেখলে খুশী হবে ত?

ওমা, খুশী হবো না কেন? মাথায় ক'রে নেবো অতিথিকে। স্বামী কোথায় তাঁর?

কল্‌কেতায়। একা এসেছেন বিরজা ছোট মেয়েটিকে নিয়ে।

একা এসেছেন স্বামীকে ছেড়ে?

ছেড়ে আসেননি গো, রেখে এসেছেন।

স্বাধীন জেনানা নাকি?

তাই যদি হয়?

ভয় পাবো। বলে হাসতে হাসতে অনুভা উঠে গেল রান্নাঘরে।

আহারাদির পর যথারীতি পাওনা ঘুমটুকু জয়ন্তকে ঘুমিয়ে নিতে হবে। কথা রইল উঠবে বেলা চুঁটোয়। যাবে বিরজার ওখানে, নিমন্ত্রণ করে আনবে চায়ের আসরে। ডিউটিতে যাবার সময় নিয়ে যাবে তাকে আবার বাসায় পৌছে দিতে।

কিন্তু দৈবাৎ গেল ঘটনাটা ঘুরে। হাতের ঠেলায় তার ভাঙল এক সময় ঘুম। উঠে বসল জেগে। বললে, স্বপ্ন দেখছি নাকি? কখন্‌ এসেছ বিরজা?

বিরজা দাঁড়িয়েছিল অনুভার একটি হাত ধরে। বললে, স্বপ্নের মধ্যেই থাকো, জেগে উঠতে চেয়োনা। খুঁজে আমাকে বার করবার আর অপেক্ষা সইল না জয়ন্ত, আমিই এলাম খুঁজতে খুঁজতে। দেখা গেল এ পাড়ায় তোমার খ্যাতি প্রতিপত্তি কম নয়। খুঁজে পাবার সুবিধে হয়ে গেল।

জয়ন্ত হেসে বললে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছো তোমরা, কি উপমা দেবো? লক্ষ্মী-সরস্বতী বললে মানাবে?

বিরজা বললে, না। ইংরেজি যখন পড়েছ তখন তার একটা পরিচয় দাও। গ্রীসিয়ান্ রোমান্ কিছু একটা ছাড়ো, সহজে বাহবা পাবে।

জয়ন্ত বললে, পরিচয় করিয়ে দেবার আর অপেক্ষা রাখলে না তোমরা, বাহাদুরিটা আমার নষ্ট হোলো।

অনুভা বললে, হোক নষ্ট। মেয়ের সঙ্গে মেয়ের পরিচয় হতে এক লহমা লাগে। উনি দরজায় পা দিতেই আমি চিনে নিলুম। বয়সের হিসেবটাও হয়ে গেল তখুনি, আমি ওঁর চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। বিনামূল্যে দিদি পেয়ে গেলাম।

জয়ন্ত বললে, মেয়ে কোথায় বিরজা?

বাইরে। মাসির চেয়ে বুড়ো মহারাজকেই সে মনের মানুষ বেছে নিলে।

কেমন অনুভা, প্রমাণ পেলে ত যে স্বাধীন জেনানা নয়? বিরজা, তোমার কথাই হচ্ছিল অনুভার সঙ্গে। ওঁর সন্দেহ, স্বামীকে রেখে যে মেয়ে আসে বিদেশে সে নিশ্চয়ই পিকেটিং-করা মেয়ে।

তিনজনেই হেসে উঠল।

মহারাজের কাঁধে চড়ে মিনি এসে নামল। ছুটে গিয়ে অনুভা তাকে নিল কোলে তুলে। তার হৃদয়ের সমস্ত আতিথেয়তাকে একটি মুহূর্তে প্রকাশ ক'রে দিল মিনিকে আদর করে। চুম্বন করলে তার মুখ, চেপে ধরল বুকে, কচি মুখের উপর ঘষল নিজের মুখখানা, প্রিয়তমার মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন মহীয়সী মাতৃদেবী। চোখে বাৎসল্যের লাবণ্য। বললে, আজকের মতো তোমার মেয়েকে রেখে যাও দিদি।

বিরজা হাসলে জয়ন্তর মুখের উপর চোখ রেখে, চোখ নামাল জয়ন্ত। মুখ উঠেছিল তার রাঙা হয়ে। বিরজা মুখ ফিরিয়ে বললে, আজকের মতো কেন বোন, তোমারই কাছে রাখো না?

সবাই জানে এ সৌজন্যের সাধারণ প্রচলিত অর্থ, সেটাকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করবার আর প্রয়োজন রইল না। মিনি রইল অনুভার কোলে, অনুভা ঘুরতে লাগল ঘর থেকে দালানে, দালান থেকে ঘরে। বলতে লাগল, তোমাকে পুতুল কিনে দিল কে মিনি?

মিনি হেসে তার কাঁধে মুখ লুকিয়ে বললে, ওই বুলো।

তাকে কোলে নিয়েই অনুভা গেল রান্নাঘরে জলযোগের ব্যবস্থা করতে।

খাটের বাজুতে হাত চেপে বিরজা বসল পাশে। কেন ছুটে এসেছিল সে? কী দেখতে,—কী কথা জানতে? ঘরের চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে সে দেখতে লাগল। বললে, জয়ন্ত?

কি বলছ?

আজ তোমার ডিউটি নেই?

আছে বৈ কি, ডিউটি ত প্রতিদিনের। ডিউটিই ত করে যাচ্ছি!

কখন্ বেরোবে?

জলযোগান্তে।

মেঝের উপর পা ঘষে বিরজা বললে, শীতের বেলা, আমাকেও যেতে হবে। অনেক দূর পথ।

বলে এলে না কেন আজ থেকে যেতে? সে দাবি ত আমার আছে!

কোথায় থাকব এই তোমার ছোট জায়গায়?

ছোট হলেও তোমার কুলিয়ে যেত। আমি যেতাম বাইরের ঘরে, তুমি থাকতে অনুভার পাশে।

বিরজা হাসল। বললে এত সহজেই যে তুমি ব্যবস্থা করতে পারো জানতুম না। কিন্তু এবারের মতন থাক্ জয়ন্ত।

জয়ন্ত বললে, তোমার ওখানে আছেন কে?

আছেন আমার শ্বশুরের বোন, তাঁর শরীর ভাল না, বাতের অসুখ।

তোমার বোনেরা কোথায় জয়ন্ত ?

বিয়ে হয়ে গেছে তাঁদের, সবাই আছেন শ্বশুরবাড়ী। আর কি-কি জানতে চাও একসঙ্গে বলো, একসঙ্গেই শেষ করে দিই। মা মারা গেছেন সে ত তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগেই।

বিরজা বললে, আমারো আজ সেই দশা,—আমার মাও সেই পথে গেছেন।

যথাসময়ে জলযোগ শেষ হোলো। ট্রেণে যাবার পরিচ্ছদটা জয়ন্ত চড়িয়ে নিলে, দেহটা হোলো তার আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী। অনুভা শপথ করিয়ে নিলে আর একদিন আসার কথা। উচ্ছ্বাসের মুখে সে গলার চেন্‌টা পরিয়ে দিলে মিনির গলায়। শুনল না মিনির মায়ের প্রতিবাদ। পথ পর্যন্ত এসে সে প্রণাম করলে বিরজার পায়ে। কাঁটা হয়ে উঠল বিরজার সর্বশরীর।

পথে নেমে ছোট গাড়ীতে মিনিকে তুলে দিয়ে চাকরকে ডেকে বিরজা বললে, বনমালী, বাড়ী নিয়ে যা মিনিকে, আমি যাচ্ছি পিছনে পিছনে। ডাক্তারবাবুর ওখান থেকে অমনি পিসিমার ওষুধটা নিয়ে যাস বাবা।

আচ্ছা মা। বলে বনমালী গাড়ী ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে চলল।

একাকী দুজন পথে। কিছুদূর গিয়ে জয়ন্ত বললে, দেখলে অনুভাকে ?

বিরজা বললে, আমি কি তোমার অনুভাকে দেখবার জন্যেই গিয়েছিলুম ?

হ্যাঁ, ছুটে এসেছিলে ওকেই দেখতে। ওকে না দেখে তোমার স্বস্তি ছিল না। এবার বলো ত কেমন দেখলে ?

দেখলুম, তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি তোমার ওপর।

আর আমি ?

বিরজা মুখ তুললে। তুমি? তোমার সমস্তটা ছেয়ে রয়েছেন অনুভা।

বুঝতে পেরেছ?

জানতে পারলুম।

পুরুষকে জানা এত সহজ?

এর চেয়েও সহজ। তোমার আপিস যাবার সময় হয়নি?

অফিস নয়, ডিউটি। সময় হলেই যাব চলে।

এই সময়টুকু নিয়ে তুমি বিলাস করতে চাও জয়ন্ত?

জয়ন্ত বললে, এ ত তোমার বিদ্রূপ নয় বিরজা, আগুনের ফিন্‌কি উঠে এল তোমার মুখ দিয়ে।

বিরজা একটু থামল। তারপরে বললে, ক্ষমা করো আমাকে জয়ন্ত। আমি মনে করে খুশী হয়েছিলুম যে তুমি সুখে নেই। আচ্ছা, আমাকে তবে এবার বিদায় দাও।

বিদায় ত তুমি নেবেই।

বিরজা বললে, দেখা হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ, বেশ কাটল দুদিন। আশীর্বাদ করে যাই অনুভাকে। আর হয় ত দেখা হবে না কোনদিন। বোনেদের ভালোবাসা জানিয়ো।

একটা কথা কিন্তু বাকি রয়ে গেল। অনুরোধ করে যাও আমি যেন তোমাকে ভুলে যাই!

ভুলে ত গিয়েই ছিলে জয়ন্ত?

সে দোষ আমার নয় বিরজা, মহাকালের। কালের হাওয়ায় সব রঙই যায় ফিকে হয়ে, কিছুই নতুন হয়ে থাকতে দেয় না। চল, ওই মাঠে গিয়ে বসি একটু।

কেন? আর কেন? অনুযোগ করলে বিরজা।

গল্প বলব একটা, শুনতে হবে তোমাকে।

পথের লোক দেখে যাবে, বলবে কি ?

ওটা পথ নয়, পথের শেষ। বলবে না কেউ কিছু। বুঝবে না কেউ আমাদের গল্প। এবার শালখানা তুমি গায়ে জড়িয়ে নাও ভাল করে।

অপরাহ্ণ বেলা। হাওয়া উঠেছে আবার শীতল হয়ে। রোদের দাহ নেই, স্নেহের স্পর্শ রয়েছে তার অন্তরে! বিরজার চুলের রাশির ফাঁকে ফাঁকে পড়েছে রাঙা আলো। সেইদিকে বারে বারে জয়ন্তর দৃষ্টি পড়তেই হেসে বিরজা দিল মাথায় কাপড় টেনে। মাঠে এসে এক জায়গায় বসল তারা দুজনে। গল্প চলবার আগে একটি নীরবতা এল তাদের মধ্যপথে, সেটার গোড়ায় ছিল সাত বছরের ব্যবধান, সে ব্যবধান অতিক্রম করা কঠিন। এমনিই হয়। একই উৎসের দুই স্রোত গেছে দুইদিকে, এর নাগাল পায় না ও, পথ খুঁজতে থাকে পরস্পরকে ধরে নেবার। পথ পায় না।

পাশাপাশিই বসলো তারা! অতীতকালে তাদের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, ছিল যে বোঝাপড়া, তাতে পাশাপাশি বসে থাকায় আপত্তি উঠতে পারে না, এখানে সমাজ নেই। পাথরের একখানা টুকরোর উপরে বসে ট্রাউজার পরা পা দুখানা জয়ন্ত দিল নীচের দিকে ঝুলিয়ে। বসার কী ছিরি তার, মরে যাই। বিরজার গায়ের শালের একটা প্রান্ত এসে পড়ল তার হাঁটুর উপর, উচ্ছ্বসিত স্নেহের নিদর্শনের মতো। এত কাছাকাছি অথচ এতদূরে। বিরাট নদীর এপার ওপার, মাঝে বয়ে চলেছে সর্বধ্বংসী কালের প্রবাহ।

বিরজা ?

বিরজা মুখ তুললো।

সেই ছেলেটাকে তোমার মনে পড়ে ? যে ছেলেটা মূর্খের মতো তোমার সঙ্গে কাটাত সারাদিন সারাবেলা ?

পড়ে বৈ কি একটু একটু।

মূর্খ সে। দিবাস্বপ্ন দেখত আকাশের দিকে চেয়ে, যে আকাশ আগুনের মতো জ্বলে যেত তার চোখে। একদিন ভাঙল তার প্রাসাদ। কবে জানো? যেদিন সন্ধ্যারাতে তোমার বর এসে দাঁড়াল। কী যে ঘটে গেল মনে নেই। যার সম্বন্ধে ছিল তার সকলের চেয়ে বড় দাবি, তারই বিয়ের কোলাহলের আড়ালে সে হয়ে গেল অতি নগণ্য। জীবনের সব চেয়ে বড় আঘাতকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না বিরজা। তাই না?

আঘাত কি বেজেছিল তাকে?

এই প্রশ্নটা নারীর, তাই উত্তরটা দেবো পুরুষের। শুভদৃষ্টির সময়ে যখন সে পিঁড়ি ধরেছিল তোমার, তুমি নখ দিয়ে আঁচড়েছিলে তার হাত। কিন্তু লাগেনি কেন জানো? রক্ত ছিলনা তার সর্বশরীরে। তার সব রক্ত শুষে নিয়েছিল নিয়তি। তারপর মনে নেই, তুমি কখন্ চলে গেলে।

সেটাকে তুমি কি বলতে চাও জয়ন্ত?

প্রেম বলব না। আকর্ষণ। যে আকর্ষণে সৌরজগত থেকে ছিট্‌কে আসে ভূখণ্ড, রাতের চিতাশয্যায় দিনের হয় নবজন্ম, কুঁড়ি থেকে কেঁদে ওঠে ফুল। আর বলব বিরজা?···

বলো।

খেলা করেছিলে তোমরা একসঙ্গে। পুতুল নিয়ে খেলেছিলে খেলেছিলে দেহ নিয়ে।

লজ্জা দিয়োনা জয়ন্ত।

সেদিন দুই দেহ ছিল একাকার। একই আত্মার দুই আসন। পদ্মার সঙ্গে যোগ ছিল ব্রহ্মপুত্রের, লক্ষ্য গেল ভ্রষ্ট হয়ে। তুমি চলে যাবার পর কাটল নেশা। কিন্তু জানো বিরজা, জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল

লুণ্ঠিত হ'লে মানুষ কেমন ক'রে কাঁদে? তুমি কি কখনো পরশ-পাথর হারিয়েছ?

না।

হারিয়েছিল সে। হারিয়েছিল তার সব, তার পরমার্থ। পুড়তে লাগল আকাশ, জিহ্বা মেলে দিল তেপান্তর, পৃথিবী হোলো কণ্টকশয্যা।

বিরজা বললে, পাগল সে।

পাগল সে, তাই সে জানত না যে, সতেরো বছরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয় না সতেরো বছরের মেয়ের। শাস্ত্রে নাকি আছে, এমন কাজে হয় পরমায়ু ক্ষয়! কিন্তু অনেক বেশি যে ক্ষয় হোলো। পরমায়ুর চেয়েও যে তার দাম অনেক বেশি। সে কথা কাকে বোঝানো যায়?

তারপর বলো শুনি।

কাঁদল সে। কাঁদল গিয়ে মাঠে মাঠে, কাঁদল ঘরের কোণে। রাতজাগা পাখীর করুণ কণ্ঠে ফুটল তার হৃদয়ের ভাষা, নিজেরই বুকের কান্না শুনলে সে কান পেতে, জানলে না কেউ। দিনে দিনে বাড়ল ফাঁক, বেড়ে উঠল মরুভূমি। তোমার আলোয় নিজেকেই দেখত সে বারে বারে, আলো গেল নিবে, ম্লান জীবনের বোঝা টেনে টেনে চলতে লাগল সে। সান্ত্বনা ছিল না।

দুজনেই চুপ করলো। গোধূলির লাল ছেয়ে গেল আকাশে আকাশে। দুই ধারের মাঠে মাঠে নামল ধূসর ছায়া, দূরে গাছের চূড়ায় পাখীরা সুরু করেছে কাকলী, অবগাহন করে নিচ্ছে সূর্যের শেষ রক্তাভায়। সেইদিকে চেয়ে রইলো দুজনে।

সে আমার ইচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতা ছিল না জয়ন্ত। বিরজা বললে।

প্রথমটা উত্তর এল না জয়ন্তর মুখে। একটু থেমে সে বললে, তার জন্যে অনুযোগ নেই বিরজা, সংসারে এই ঘটে সচরাচর। আমার

বলার কথা যে, এই বেদনাটা পুরুষের। এর পরেও যা নিত্য ... সেটা প্রকাশ করতেও বাধা নেই।

বিরজা বললে, সেটা এই যে সাত বছর পরে তুমি বিবাহ করেছ।

হ্যাঁ, তাই বলব। যে-সমস্যার জটিলতায় ছিল না মনের শান্তি, কালের দৃষ্টি করলে সেই সমস্যার সমাধান। একদিন সবই সহ্য হয়ে যায়। নিজের মধ্যে খুঁজে পায় সান্ত্বনা। শ্রীরাধার প্রেমকেও ম্লান করেছিল এই মহাকাল, একশো বছর পরে তাঁকেও ভুলতে হয়েছিল এই ভালোবাসা। সময়ের স্রোতে সব যায় ভেসে। এবার তোমার কথা বলো বিরজা।

বিরজা বললে, আমার কথা সামান্য। যে অর্ঘ্য সাজিয়েছি দিনে দিনে, তাই দান করেছি নির্দিষ্ট মানুষকে। ঘর করেছি স্বামী নিয়ে, পূজা দিয়েছি নিত্য, ব্যতিক্রম ঘটেনি। ঘটবার ত কথা নয় জয়ন্ত; পূজা দেবার জন্য যার জন্ম, দেবতার দরজা পেলেই তার আনন্দ।

জয়ন্ত হেসে বললে, তবু একটা কৌতূহল থেকে যায় যে।

জানি তোমার কৌতূহল। স্বীকার করে যাবো তাই অকপটে। দীর্ঘকাল ধরে যে সংসার নিজের বলে রচনা করেছি সেখানে আমার ফাঁকি নেই। তোমাকেও আজ দেবোনা ফাঁকি। অপমান করব না আপন চরিত্রকে। আমার স্বামী, আমার সন্তান, আমার সুখশান্তি— এদের মধ্যে পেয়েছি সুন্দর করে নিজেকে। আজ আমি নিজের কাছে অত্যন্ত ছোট হয়ে যাব, যদি বলি স্বামী ছাড়া আর কেউ ছিল আমার মনে। এত বড় অশ্রদ্ধেয় কথা বলবার আগে আমার যেন মৃত্যু ঘটে।

জয়ন্ত বললে, আমিও তাই বলি বিরজা। আমিও এমন কুসংবাদ শুনতে চাইনে যে দীর্ঘ সাত বছর ধরে বঞ্চনা ক'রে এসেছ তুমি স্বামীকে। সেদিন এমনি একটা আলোচনাই হচ্ছিল অনুভার সঙ্গে!

বিরজা এবার হেসে বললে, সব কথার শেষে আসেন অনুভা। অনুভার আলো পড়ে তোমার মুখে।

অস্বাভাবিক নয়।

অল্প সময়ের জন্য দেখলুম তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে। দেখে খুশী হলুম, অমৃত পেয়েছ তুমি। তাঁরও ভাগ্য। তোমাদের মতো মিলন সচরাচর চোখে পড়ে না।

জয়ন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বললে, অনুভাকে তুমি আশীর্বাদ করো বিরজা।

দুজনেই থামল! কথা নেই আর। কথা শেষ হয়ে গেলেই একজনের কাছে আর একজন অপরিচিত। একজন ছোটে আর একজনকে ধরবার জন্য। একসময়ে অগত্যা তারা উঠে দাঁড়াল। বিরজা বললে, এবার ত তোমার ডিউটি? সময় নষ্ট হোলো না ত?

হোলো বৈ কি একটু!

তবে কেন বসেছিলে এতক্ষণ? যদি কিছু হয় আমাকে তুমি গাল দেবে ত? যাও তুমি, আমি ফিরে যাবো এই পথে।

জয়ন্ত বললে, অন্ধকার হয়ে এল যে।

হোকগে, আলো আছে আমার চোখে।

তবু জয়ন্ত তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। কিছুদূর এসে বললে, যদি বাসাটা তোমার চিনে আসি, আপত্তি করবে?

আপত্তি? হেসে বিরজা বললে, তুমি ভারি ছোট হয়ে গেছ জয়ন্ত। চলো না, শোবার ঘর পর্যন্ত দেখে আসবে। তোমার তাড়াতাড়ি রয়েছে তাই জন্যেই,—যে সত্যিই পর হয়ে গেছে তার প্রতি পরের মতো ব্যবহার কোরো না জয়ন্ত।

জয়ন্ত বললে, অপরাধ নিয়ো না বিরজা। তোমার কথা ভাবলে, তোমাকে দেখলে আমার হৃদয়হীন প্রকৃতিটা ভয়ানক হয়ে জেগে ওঠে। তাকে আর আমি সামলাতে পারিনে।

কী অন্যায় করেছি তোমার প্রতি ?

অন্যায় কিছু করোনি। যা হয় কেবল তাই বললুম।

বিরজা বললে, জানো কল্পনাপ্রবণ আমার মন ? তোমার একটি একটি কথা রাতে আমার মনে হবে বিছানায় শুয়ে, জাল বুনতে হবে অন্ধকারে, মন ছুটবে দিকে দিকে। সেই অশান্তির দিকে আমাকে ঠেলে দিয়ো না জয়ন্ত।

জয়ন্ত বললে, আমাদের বয়স হয়েছে দেখা যাচ্ছে, হিতাহিত বোধটা বেড়ে গেছে। যেদিন প্রবাহটা ছিল বেগবান সেদিন বাধা দেয়নি কেউ। ছেলেমানুষীটা ছিল উদ্দাম, অশাস্ত্রীয় কাজ করেছি বারে বারে, মানিনি বিধি নিষেধ।

বাঁ দিকের পথটা ধরে তারা চলতে লাগল। কোথাও কোথাও তখন সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে উঠেছে।

বিরজা বললে, আমি সে দিনের কথা ভুলে গেছি জয়ন্ত।

আমিও ভুলে গেছি, কারণ সে দিনগুলো সত্যি নয়।

নয় ?

না। যাকে স্বীকার করতে লজ্জা তাকে এড়িয়ে যাওয়াই শোভন। সঙ্গত।

তুমি কি মনে করো আমি ভুলে যাইনি ?

ভুললেই বা কী যায় আসে বিরজা ? পথ আমাদের ত এক নয় ?

রক্তাভ হয়ে উঠল বিরজার মুখ। উষ্ণ কণ্ঠে বললে সে, যথেষ্ট তুমি বলেছ জয়ন্ত। পথ এক নয় বলেই হয়ত এত বলতে পেরেছ। বলতে পারো, আমাদের কথাগুলো অনুভার কানে গেলে কী হোতো ? জয়ন্ত হেসে বললে, আমি ভাবছি ক্ষিতীশ বাবুর কথা। তিনি কী মনে করতেন ?

সে কথা আমার চেয়ে তুমি বেশি জানো না। ক্ষিতীশবাবু জানেন, তিনি চোরাবালির ওপর প্রাসাদ তোলেন নি। কিন্তু অনুভা ?

জয়ন্ত আবার হাসলে। বললে, অনুভা জানেন, নির্বোধ যারা তারাই তোলে চোরাবালির ওপর প্রাসাদ। এবার তবে আসি বিরজা।

বিরজা বললে, রাগ ক'রে চলে যেয়ো না, এত দূরে এসেছ, আয়ান ঘোষের বাড়ীটা দেখেই যাও জয়ন্ত।

জয়ন্ত বললে, যাব বৈ কি, চলো। মেয়েরা ঘর দেখাতে পারলে খুসি হয়। কোন্ মন্দিরটিতে তোমার অধিষ্ঠান বলো ত?

এই যে এই বাড়ী।

এই বাড়ী? বাঃ, ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রীর উপযুক্ত বটে। দেউড়ীতে দারোয়ান কই?

আছে, আছে, এসো এখন, আর ঠাট্টা করতে হবে না।

আছে ত দেখছিনে কেন?

বিরজা বললে, যথাসময়ে তার দেখা পাবে।

বাড়ীর ধারে এসে দুজনে দাঁড়াল। কাছাকাছি ছিল না কেউ। বিরজা বললে, আবার যেদিন তুমি আসবে সেদিন পিসিমার কাছে তোমার কী ব'লে পরিচয় দেবো?

জয়ন্ত হাসলে, বললে, হষ্টেলের মেয়েদের মতন বোলো, আমি তোমার দূর সম্পর্কের দাদা!

না, ছি, তার চেয়ে বলব, বন্ধু।

বন্ধু? পাগল তুমি? এখনো ইংরেজ রাজত্ব রয়েছে, এখনো আমরা স্বরাজ পাইনি!—বিদায় নিয়ে দ্রুতপদে জয়ন্ত চলতে লাগল।

টুপিটা মাথায় বসিয়ে নিলে জয়ন্ত ভাল করে, এতক্ষণ সেটা হাতেই ছিল। জামার বোতামগুলো বন্ধ করলে, ঠিক করে নিলে নেক্-টাইটা, তারপর চলতে লাগল সোজা হয়ে। সটান হয়ে।

ঘটে না, ঘটতে পারে না ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। যুগে যুগে মানুষের ভিতর দিয়েই আসে নতুন মানুষ, চরিত্র বদলায় তাদের, রক্তের ভিতর আনে বহু দর্শনের ফল। তারা বেঁচে নেই যারা ঘটাবে সেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। নদী বয়ে গেছে, পলি পড়েছে, ধ্বংস স্তূপের উপর দিয়ে এসেছে নতুন সভ্যতা, দাঁড়িয়ে উঠেছে নতুন লোকালয়। নতুন করে জন্মেছে জয়ন্ত। অতীতের পথে ফেলে এসেছে সে অতীতকালের আনন্দ, অশ্রান্ত গতিতে তাকে চলে আসতে হয়েছে বর্তমান জীবনে, আবার সে কোন্ পিছন পথে ফিরে যাবে পরিত্যক্ত ফুলমালিকার খোঁজে,—এত বড় অনর্থক পরিশ্রমের কাজ মানুষের জীবনে আর নেই।

চলতে লাগল জয়ন্ত সোজা হয়ে। সটান হয়ে। পথ ভুল হবে না, ঠিক পথেই চলেছে সে। একটা কথা বলে আসা হোলো না বিরজাকে। শোনো বিরজা, আকাশে রঙের তুলি বুলোবার বয়স আর নেই আমার, ও কাজ শেষ ক'রে দিয়েছি সতেরো বছর বয়সে, যেদিন তুমি মাথায় সিঁদুর মেখে মোটরে গিয়ে উঠেছিলে। সিঁদুরের ফোঁটা নয়, সেটুকু আমার শেষ রক্তবিন্দু। আজ প্রার্থনা করি, তুমি সুখে থাকো।

স্ত্রীলোক বুঝবে না পুরুষের ব্যথাটা ঠিক বাজে কোথায়।—কথাটা মনে আসতেই খুসি হয়ে গেল জয়ন্ত। খুসি মনে সে এসে পৌছলে ষ্টেশনে, একরাশি আলো এসে পড়ল তার পরিশ্রান্ত মুখে। ঘাম ফুটেছে কপালে। ভুলেই গিয়েছিল এটা শীতকাল।

ভূতের উপদ্রব সুরু হয়ে গেল মাথার মধ্যে। তার স্ত্রী, তার নতুন সংসার, তার চাকরি—মিথ্যে কি এসব? এদের ছাপিয়ে উঠবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি?

এক পেয়ালা চা খেয়ে সে এসে বসলো ষ্টেশন-মাষ্টারের ঘরে। যে ট্রেণে তার বাবার কথা, সেখানা চলে গেছে একটু আগে। আর একখানা আসবে দেরিতে।

মাষ্টার মশাই বললেন, চৌধুরীর শরীর বুঝি ভাল নয়?

আজ্ঞে না। আবার সেই মাথার যন্ত্রণাটা·········আজ সকাল থেকেই—

ছুটি নিলেই ত পারো দুদিন, ক্যাজুয়াল্ লীভ্।

অন্তত আজকের দিনটা যদি পেতুম।

বেশ ত। কম্ম্ বেটাকে পরের গাড়ীতে ছেড়ে দিই, কি বল?

আপনার অনুগ্রহ মাষ্টার মশাই।

ছুটি গেল মঞ্জুর হয়ে। মাষ্টার মশাই উপদেশ দিলেন বাসায় গিয়ে শুয়ে থাকতে। টুপিটা আবার মাথায় বসিয়ে খুসি হয়ে বেরিয়ে এল জয়ন্ত। যাক্ নিষ্কৃতি আজকের মতো। কেমন একটা ক্লান্তিতে তার শরীর আচ্ছন্ন হয়েছে। এমন আলস্য ছিল না তার। ষ্টেশন্ থেকে বেরিয়ে সে বাসার পথ ধরলে।

রাত কিছু বেশি হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে পথ জনবিরল। নক্ষত্রের সভা বসেছে আকাশে, সে সভায় নেই চন্দ্রালোক, কাজ চলছে অন্ধকারে। এই আকাশটা তার জীবনের মতো, জীবনের মতো বিপুল। অসংখ্য তারকার মতো অগণ্য অভিজ্ঞতা তার। বহু তারা গেছে অস্পষ্ট হয়ে, বহু ফুটেছে নতুন করে। সন্ধ্যার সময়ে ছিল একটি মাত্র তারা, উজ্জ্বল দীপ্ত। তখন সন্ধ্যা।

মাঠের পথে বাঁক নিলে জয়ন্ত। অনিচ্ছায় অজ্ঞাতে চলতে লাগল পা দুটো। এমন আসে দিন যখন আপন ব্যক্তিত্বের উপর মানুষ অধিকার হারায়, সেদিন চলাটা এলোমেলো, পতন ঘটে ছন্দের। প্রবৃত্তির তাড়া নেই জয়ন্তর মনে, সে সম্পূর্ণ সচেতন। তবু কোথায় আলগা হয়েছে তার চিত্তের বন্ধন। যে যন্ত্রের কল-কব্জাগুলি আঁটা, তার কাজ চলে নিখুঁৎ, ছন্দের বন্ধনে যেমন কবিতার লীলা, কিন্তু স্ক্রু একটা আলগা হলে খিচ্ বাধে মাঝে মাঝে সেই যন্ত্রে। মাঠ ঘুরে

চলেছে জয়ন্ত। এ মাঠ যেন সেই তেপান্তরের, পার হওয়া যায় না অথচ যেতে ভাল লাগে হেঁটে হেঁটে। এর পরে আছে শিশুকালের সেই রূপক অরণ্য, সাত সমুদ্র আর তেরোটি নদী, তারপর সেই সোনার দেশের সোনার রাজকন্যা। এ বেশ লাগছে। সংসার করেনি জয়ন্ত, বিবাহ হয়নি তার, দাসত্বের শৃঙ্খলে নেই তার মন বাঁধা, সহজ হয়ে গেছে সে। যেমন সহজ হয়েছিল শেষ কৈশোরে, প্রথম যৌবনে। সে রোমান্টিক্ যুগের মানুষ, তাতে তার লজ্জা নেই। বস্তুতান্ত্রিকতা এসেছে তার মনে অবস্থার গুণে, এ বস্তু নেই তার রক্তে। কিছু মিথ্যার মোহ, কিছু রঙ, কিছু অবাস্তব কল্পনা এরা তার চিত্তলোকে ভেসে ভেসে যায় মেঘের মতো, ছায়া আর মায়ার মতো।

ঠিক আছে সে, এ ঠিক পথ। ওই তো মাঠের পথ ঘুরে ভাঙা মন্দিরটার পাশ দিয়ে চলে গেছে, ওধারে সেই ডাঙা যেখানে হয় শবদাহ, ওটার পরেই অজয় নদীর খাল। কিন্তু আর অগ্রসর হওয়া নিরর্থক। ফিরলে জয়ন্ত।

ঠাণ্ডা বাতাস লাগচে মুখে চোখে, হাত বুলিয়ে সে দেখলে হিম হয়ে গেছে মুখখানা, চোখে এসেছে একটি জড়তা। জড়তা নয় ঘুমের, নয় ক্লান্তির। প্রাণের ভাষা লেখা হচ্ছিল চোখের তারায়, সে ভাষা কল্পান্তকালের, মানব-হৃদয়ের চিরন্তন বাণী। লজ্জা নেই তার, রূপকথার শিশু সে। এখনো বাঁশীর গভীর ভাষায় তার ঘটে চিত্তবিভ্রম, এখনো যমুনার তরঙ্গ এসে লাগে তার হৃদয়ের তটে। খুসি হয় সে আঁধার রাত্রির অভিসারের কৌতুকে। কল্পকামনার মোহ এখনো মরেনি তার মনে।

পথের উপরে সে দাঁড়ালে স্থির হয়ে। রাজকন্যার প্রাসাদের নির্জন কক্ষে প্রদীপ জ্বলছে। বিরহ-শয়নে রয়েছেন প্রিয়া। ডাকবে নাকি সে বিরজাকে? কেন ডাকবে? কী কথা বলবে? কাল-কালান্তরে কী কথা বলা হয়নি তার? উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষে সে চারিদিকে তাকাতে

লাগল। মানুষ-জন কাছাকাছি কেউ নেই। নীচের ঘরগুলিতে আলো নিবে গেছে। দেউড়ীতে নেই দারোয়ান,—ভাগ্যি নেই!

জয়ন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগল। বস্তুতান্ত্রিকরা বুঝবে কেমন করে এই ঘোরাঘুরির উল্লাস! তারা মেরেছে সহজ হৃদয়াবেগের টুঁটি টিপে। দুরাশার পাশে পাশে উপগ্রহের মতো চলাফেরা, জীবন্ত কামনার মতো। যেমন ঘোরে মধুমক্ষিকা, যেমন ঘোরে ভ্রমর···পুষ্পপরাগ চোখে বুলিয়ে নেবার মোহ, অঞ্জনের অনুরাগ। এ আনন্দ গন্ধের, এ আনন্দ সুরাবিষ্ট বায়ুতরঙ্গের।

না, ডাকতে পারলে না জয়ন্ত। স্বর ফুটল না। বিরোধ বেধে গেল ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের, বিরোধ বাধল কণ্ঠের সঙ্গে প্রাণের। ধীরে ধীরে আবার পা বাড়ালে সে। চলেই যেতে হোলো তাকে, জীবনে সংযমের প্রয়োজন আছে।

রাত হয়েছিল গভীর। বাড়ীর দরজায় উঠল এসে। এ পথ জয়ন্তর পরিচিত। বাইরের বন্ধ ঘরে তখনো সুর করে মহারাজ পড়ছে তুলসীদাসের রামায়ণ। দরজা ঠেলে ঢুকলো সে শোবার ঘরে।

টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে বড় ঘড়িটায়। আলোয় দেখা গেল একটু আগে বেজেছে এগারোটা। অনুভা ঘুমিয়ে রয়েছেন লেপ মুড়ি দিয়ে খাটে, সোনার পালঙ্কে বাস্তবকালের রাজকন্যা। চোখের পল্লবে নিদ্রারসের নিবিড়তা। হেসে দাঁড়ালে জয়ন্ত কাছে এসে। সুর করে ধরবে নাকি সে একটা বেহাগ? মন ভরে উঠল হঠাৎ কৌতুকে। হাত বাড়িয়ে টান মেরে খুলে দিলে লেপটা। কিন্তু তারপর আর চোখ রাখতে পারলে না সেদিকে, লজ্জায় নিলে মুখ ফিরিয়ে।

জেগে উঠল অনুভা। ওমা, তুমি? ফিরলে যে আজ এর মধ্যে?

জয়ন্ত হেসে বললে, দুরন্ত জন্তু, পালিয়ে এলুম দড়ি ছিঁড়ে। ঠাঁই দেবে না আজকের রাতটা?

হেসে বললে অনুভা, পাগল হয়ে উঠলে বুঝি আজ? শরীর ভালো আছে ত?

ভালো আছে বলেই ত এলুম। একটু হেসে জয়ন্ত টুপি আর গায়ের কাটটা খুলে রাখলে। খুললে জুতো আর মোজা।

দিদিকে দিয়ে এলে পৌঁছে? মিনিকে?

হ্যাঁ, যথা সময়ে।

চমৎকার মানুষ।—উঠে বসলে অনুভা। তারপর বললে, ভাগ্যি খাইনি এখনো? খেয়ে আসা হয়নি সে ত দেখতেই পাচ্ছি। চলো।

যাই। বলে জয়ন্ত সটান এসে ঢুকলে লেপের মধ্যে। কাছে টেনে নিলে অনুভাকে, তার গলার মধ্যে মুখ লুকিয়ে চোখ বুজলে। কিছুকাল তার অপব্যয় করার মতলব।

এর পরে বলা বে-আইনী। আলোটা রইল সাক্ষী।

২

দিন চারেক পরে। বিরজার দরজায় এসে দাঁড়ালে জয়ন্ত। একটি লোক এল বেরিয়ে। বললে, কা'কে চান্?

এ বাড়ীর বৌকে। আছেন তিনি?

লোকটা আপাদমস্তক তাকালে জয়ন্তর দিকে। তারপর বললে, ঠাট্টা করছেন নাকি?

আজ্ঞে না। আপনাদের বৌ-ঠাকরুণকে আমার দরকার।

কি উদ্দেশ্যে আসা?

উদ্দেশ্যটা খুব স্পষ্ট নয়। নেই তিনি?

লোকটি বললে, মনে হচ্ছে আপনি ঠিকানা ভুল করেছেন।

আজ্ঞে না। বলে দিচ্ছি, যাঁকে চাই তিনি খুব সুন্দরী, চোখ দুটি একটু কটা, চুলের রঙ একটু তামাটে। মেলে না?

তাঁর নাম কি বলতে পারেন?

নাম বিরজা দেবী। দয়া করে ডেকে দিন্ একবার, বিশেষ গোপনীয় কথা আছে।

বলুন না কি দরকার?

জয়ন্ত বললে, আপনি সম্ভবত তাঁর কর্মচারী, তাঁকে ভিন্ন আমি বলতে পারিনে আর কাউকে।

তবে দাঁড়ান, তাঁকে খবর দিই।

লোকটি গেল ভিতরে, এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সে। পিছনে পিছনে বিরজা। জয়ন্তকে দেখেই সে আনন্দে একপ্রকার গলার শব্দ করে' উঠল। বললে, কি আশ্চর্য, এত দেরিতে এলে? পথ চেয়ে ছিলুম বসে। এসো। এঁকে চিনতে পেরেছ ত? তোমার ক্ষিতীশবাবু!

দেখেই চিনেছি প্রথমে।—জয়ন্ত বললে, উপযুক্ত অমন একজোড়া গোঁফ, ঠিক যেন মালিকানা স্বত্বটার দিকে নির্দেশ করে দিচ্ছে। বিবাহের পূর্বে কোনো স্ত্রীলোকের ভালোবাসা পেয়েছিলেন ক্ষিতীশবাবু?

হাসি ফুটে উঠল ধীরে ধীরে ক্ষিতীশের মুখে। বললে, ঠিক মনে পড়ছে না।

তাই রেখেছেন গোঁফ।

হাসলে তিনজনে। সহজে হাসি থামল না বিরজার। ক্ষিতীশ তারপর বললে, কিন্তু চিনলুম না আপনাকে।

আমি জয়ন্ত। একবার দেখা হয়েছিল আপনাদের শুভ-দৃষ্টির সময়ে, বিরজা তখন ছিলেন আমার মাথায়, আপনার অবসর ছিল

না তখন পদদলিত মানুষটির দিকে তাকাবার। যাক্ ও কথা, আপনি এলেন কবে?

বিরজা বললে, বিনা নোটিশে গেরস্থকে সাবধান না করেই হঠাৎ কাল এসে হাজির। অর্ঘ্য পাওনা হয়েছে।

ধন্য স্বামী দেবতা।—হেসে উঠল জয়ন্ত।

ক্ষিতীশ বললে, হঠাৎ দুদিক থেকে শরনিক্ষেপ করলে আমার হবে উভয় সঙ্কট। দয়াপূর্বক এবার অন্দর মহলে প্রবেশ করুন।

দোতলায় শয়নকক্ষে এসে ঢুকল তিনজনে হাসি মুখে। মাথার টুপিটা জয়ন্ত ছুঁড়ে রাখলে বিছানায়। বিরজা বললে, অনুভাকে আনলে না জয়ন্ত?

জয়ন্ত বললে, সংসারী মানুষ তিনি, নতুন ঘর ফেলে আসতে তাঁর মন চাইল না। ত্রিকোণাকার গল্পে তাঁর আনাগোনাও বিশেষ অসুবিধে।

ক্ষিতীশ হেসে বললে, আমি ছিলুম ইঞ্জিনীয়ার, কিছু সুবিধে তাঁর করেই দিতে পারতুম জয়ন্তবাবু।

তবে গিয়ে তাঁর কাছে প্রস্তাব করুন? সুবিধাজনক উত্তর বোধ হয় পাবেন না। ভাল কথা, আমার পরিচয়টা সম্ভবত দিয়ে রাখেন নি বিরজা। তাই না?

বিরজা বললে, তুমি নিজেই দেবে তাই চুপ করে ছিলুম। এবার ওঁর কৌতূহল পরিতৃপ্ত করো।

পুরুষের কৌতূহল যে পরিণামের দিকে, কি বলুন ক্ষিতীশবাবু?

দোহাই, ক্ষমা করুন আমাকে। কৌতূহল আর আমার নেই। পরিচয়টা ক্রমশ প্রকাশ্য।

মিনি এসে দাঁড়াল। জয়ন্ত তাকে কোলে তুলে নিলে। আদর করে বললে, এর গায়ের গন্ধে তরুণ কিশোর থমকে দাঁড়ায় পথে; আগুন জ্বলে ওঠে আকাশের হাওয়ায়।

বিরজা বললে, কিশোরের প্রকৃতিটা কস্তূরী হরিণের। ছুটে ছুটে বেড়ায় পথে পথে, আনমনে খুঁজে খুঁজে। গন্ধটা তার নিজেরই।

ক্ষিতীশ বললে, কবি আর সমালোচকের বিতর্ক, পাঠক শোনে খুসি হয়ে। দাঁড়ান্, যন্ত্রকে সচল রাখতে গেলে তৈলসিক্ত করা দরকার। চা আনাইগে।

ক্ষিতীশ পালাল।

বিরজা উঠে গিয়ে খুললে ড্রয়ার, বার করলে উপহারের সেই হারছড়াটা, পরালে এসে মিনির গলায়, তারপর পুনরায় বললে, এ হার পরতুম রাতে নিজের গলায়, উনি আসার আগে।

জয়ন্ত বললে, আবার প'রো যেদিন জ্যোৎস্না রাতে বসবে গিয়ে বকুলতলায়। ডেকেছিলে কেন শুনি চাকরের হাতে চিঠি পাঠিয়ে ?

তার হয়ে উত্তর দিলে মিনি। বললে, আপনার যে নেমন্তন্ন !

মা হেসে বললে, মিনির আজ জন্মতিথি। উনি ছুটে এসেছেন কলকাতা থেকে উৎসব করতে।

জয়ন্ত বললে, এর নাম বালীগঞ্জী আতিশয্য ! কোটি কোটি নিরন্ন দেশবাসী রয়েছে, সেই দলিত ক্লিষ্ট দরিদ্রদের চেয়ে তোমাদের জন্ম-তারিখের দাম বেশি কেন হবে ?

বিরজা বললে, শরতের রোদ্দুরে মেঘ ডাকলে হাসি পায় জয়ন্ত। তুমি গল্প করতে এসে নির্বোধের মতো প্রচারকার্য ক'রে যেয়ো না। দেশের ভূতকে ডাকিনি উৎসব সভায়।

আজকের কলহটাও আনন্দদায়ক। খোঁচা দিয়ে খুসি হোলো দুজনেই। কিয়ৎক্ষণ পরে জয়ন্ত বললে, অভ্যাগতরা কোথায় ?

বিরজা বললে, অন্দরমহলের উৎসব, অন্যের প্রবেশ নিষেধ। তুমি আজ বরণীয় অতিথি। অনুভাকে আনলে না কেন ?

শরীর ভাল নেই তাঁর।

অসুখটা কি?

অসুখ নয়, শরীর খারাপ।

সন্দেহজনক নাকি?—বিরজা হাসলে।

ওটা তোমাদের এলাকা। আমার দৃষ্টিই আছে, অন্তর্দৃষ্টি নেই—ঘরখানার চারিদিকে তাকাতে লাগল জয়ন্ত। এই পরিপাটি আসবাব-গুলির গায়ে লেখা হয়েছে সাত আট বছরের ইতিহাস অল্পে অল্পে। সমস্তটাই জুড়ে রয়েছে স্বামী, সংসার, সন্তান; এখানে কোথাও তার স্থান নেই, চিহ্ন নেই, সে গেছে হারিয়ে। গেছে তলিয়ে।

ফিরে এল ক্ষিতীশ। হেসে বললে, এমন নাটকীয় নীরবতা কেন আপনাদের?

জয়ন্ত বললে, পরিচয়ের ফলাটায় মর্‌চে ধরেছে, পালিশ করছি সেটা মনে মনে। পাতানো সম্পর্ক কিনা, সূত্রটা তাই খুঁজে পাচ্ছিনে।

বিরজা হেসে বললে, থাকলে ত খুঁজে পাবে!

ক্ষিতীশ বললে, খুঁজে আর কাজ নেই আসুন এবার। আসন পেতে এসেছি নিজের হাতে।

বিরজা আগে আগে বেরিয়ে এল। পিসিমা এসে বসেছিলেন আহারাদির জায়গাটায়। আদর করে জয়ন্তকে ডাকলেন, এস বাবা।

জলযোগ সুরু করবার পর পিসিমা উঠে গেলেন, বিরজা এসে বসলে তাঁর জায়গায়। বললে, বেয়াড়া সময়ে তোমার ডিউটিটা পড়েছে। সবার যখন বিশ্রামের পালা, তুমি তখন বেরুলে জীবন সংগ্রামে! এমন কাজ ভাল নয়।

কমলালেবুর কোয়া মুখে দিয়ে জয়ন্ত বললে, উপায় নেই। দাসত্বটাই যেখানে বড়, সুবিধা অসুবিধার প্রশ্ন সেখানে উঠতে পারে না। তুমি মনিব হলে আমার অনেক সুবিধে ছিল বিরজা।

মিনিকে কোলে নিয়ে এসে দাঁড়াল ক্ষিতীশ। বললে, জন্মতিথিতে

মিনিকে হার দিয়ে হার মানালেন আমাদের। অন্তত অনুভা দেবীর জন্মতিথিটা কাছাকাছি হলে আমরাও শোধ নিতে পারতুম জয়ন্তবাবু।

জয়ন্ত মুখ তুলে বললে, যা দিয়েছি তার শোধ নেই ক্ষিতীশবাবু। ওটা আসল জমা দিলাম, আপনি দিতেন ওর সুদ।

বিরজা বললে, হয়েছে মশাই হয়েছে, থামো। লক্ষ্মী হয়ে খাও এবার। মুখ অত আল্‌গা কেন?

ক্ষিতীশ হেসে চলে যাবার সময় বললে, নাঃ, বুঝলুম না কিছুই। চোখের জন্যে দেখছি চশমাই নিতে হবে।

খেতে খেতে হেসে উঠল জয়ন্ত। হাসতে লাগল বিরজা।

এখন যাবে কোথায় জয়ন্ত?

দেখতেই পাচ্ছ, যাব ডিউটিতে।

আবার আসবে ত একদিন?

আসবার আর কোনো ছুতো নেই।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করলে বিরজা। পরে বললে না এলে কীই বা করতে পারি। বোনদের ব'লো, দেখা হয়েছে আমার সঙ্গে।

জয়ন্ত বললে, বোনেদের তাতে স্বার্থও নেই, আনন্দও নেই। যদি কিছু থাকে সে আমার।

তোমার কি স্বার্থ?

শুনতে চেয়োনা বিরজা সব কথা স্পষ্ট করে।

মাথা হেঁট করে নিঃশব্দে বিরজা বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপরে হেসে বললে, মনে পড়ছে তোমার একদিনের খাওয়া। এমনি করেই বসেছিলে খেতে, আমি লুট করেছিলুম তোমার থালা,—তোমাকে বঞ্চিত করাতেই ছিল আনন্দ।

জয়ন্ত বললে, মনে পড়ছে একটু একটু। আমাকে উপবাসী রাখাই ছিল তোমার খেলা। আর একদিনের কথা মনে আসছে। যেদিন

তুমি ঘরে খিল বন্ধ করে আমাকে তোমার গানের খাতা দেখিয়েছিলে। তাতে একটা বেফাঁস কথা লেখা ছিল।

ওমা, তুমি বড় মিথ্যেবাদী জয়ন্ত!

লজ্জা কোরো না, দোষ ত্রুটি নিয়েই ছিল আমাদের বন্ধুত্ব।

আমার বাপু সেসব মনে পড়ে না।

আমারো সেসব মনে পড়া উচিত নয়। কিন্তু ছেলেমানুষেরা যদি ছেলেমানুষী করেই থাকে কিছু কিছু, সেটা অপরাধের কথা নয়।

আহার সেরে উঠে দাঁড়াল জয়ন্ত। বিরজা তোয়ালে দিল তাকে হাত মুছতে। বললে, কিন্তু এসো আর একদিন, আমার যাবার আগে।

তুমি চলে যাবে?

আর থাকব কতদিন, ওঁর একা অসুবিধে হচ্ছে কলকাতায়।

আমি ত বোধ হয় বদ্‌লি হয়ে যাবো এখান থেকে।

কোথায়?

ঠিক নেই কিছু এখন।

সামাজিক সৌজন্য ও ভদ্রতায় গেল কিছুক্ষণ। যাবার সময় ক্ষিতীশ হেসে বললে, ঠাকুর বিসর্জন দিচ্ছি আপাতত, কিন্তু কানে কানে বলি, পুনরাগমনায় চ।

জয়ন্ত হাসলে। বললে, এমন পূজো যেখানে, দেবতার সেখানে নিত্য আবির্ভাব হবে ক্ষিতীশবাবু। টুপিটা মাথায় চড়িয়ে সে বিদায় নিলে।

পিছনে পিছনে এল বিরজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে। এল সদর দরজা পর্যন্ত। দেখলে কেউ কোথাও নেই। বললে, দাঁড়াও জয়ন্ত।

জয়ন্ত দাঁড়াল।

হাত থেকে খুললে বিরজা আংটিটা। বললে আমার সাধ এইটি তুমি অনুভার হাতে পরিয়ে দিয়ো।

ছিঃ বিরজা, এ নীচতা তোমার। হারের বদলে দিতে এসেছ আংটি আমাদের এত ছোট মনে করেছ?

খপ করে তার হাত ধরলে বিরজা। বললে, আমি যে অনেক নীচে নামতে পারি, এই আংটি রইল তার সাক্ষী। বলে সেটা জোর করে পরিয়ে দিলে জয়ন্তর হাতে। এবং আর সে দাঁড়ালে না মুহূর্তমাত্র, যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে।

পথে নামল জয়ন্ত দ্রুতপদে। কঠিন হোল উদ্গত আনন্দটাকে চেপে রাখা। এই পাড়া থেকে কিছুদূরে এগিয়ে গিয়ে উচ্চরোলে সে হাসবে একবার, হাসবে প্রাণের ক্ষুধা মিটিয়ে। আংটিটা রয়েছে তার আঙুলে, কাঁপছে সেই আঙুলটা, অবশ হয়ে গেছে, সাহস হচ্ছে না নিজের হাতের দিকে তাকাবার। বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুসারে তার অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে—হর্ষ, কম্প, স্বেদ আর পুলক। পা দুটো নিজের পা নয়, বেপরোয়া চলছে সে দুটো; চলতি ভাষায় তাকে বলে দৌড়ানো। আজ তার জয়গৌরবের ভাষা লেখা হবে মহাকালের খাতায় তারকার অক্ষরে, সাক্ষী থাকবে এই কালো চুল এলো-করা যোগিনী রাত্রি।

কিছুদূর গিয়ে সে ধরাল একটা সিগারেট। দেশলাইয়ের কাঠির আলোয় দেখলে সে নিজের মুখ, অনুভব করে নিলে তার মুখের রোমাঞ্চ আনন্দটা। বাঁ হাতটা তুলে সেই আলোয় দেখলে একবার আংটিটা, লাল চুনী বসানো আংটি; যেমন লাল বিরজার মাথায় সিঁদুরের ফোঁটা। সাপের মতো কঠিন করে জড়িয়েছে তার আঙুলে, তার হাত, তার দেহ, তার আত্মা। এ ভার সে বইবে কেমন করে? কোথায় রাখবে সে এই আংটি? তার প্রিয়তমা স্ত্রী, যত্নের সংসার, বহুশ্রমলব্ধ চাকরী, নিশ্চিন্ত সুন্দর জীবন—এদের ছাপিয়ে মূর্তিমান প্রতিবাদের মতো দাঁড়িয়ে উঠবে এই গরলাধার অঙ্গুরীয়! দেবে সব ভাসিয়ে, দেবে সব পুড়িয়ে? হে

চন্দ্র শুক্লপক্ষের, হে আকাশ, তোমরা জানো একটিমাত্র নারীকে আমি প্রাণের গভীর মমতায় ভালবেসেছি, দৈবক্রমে তিনি আমার স্ত্রী।'

চলার গতি জয়ন্তর হোলো মন্থর। তাই ত, এ কী হোলো আজ? ভাবলে, এই চিত্তচাঞ্চল্যটা নির্বোধের। কে না জানে তার জীবনটা দাঁড়িয়ে উঠেছে চোরবালির চরে নয়, প্রস্তরময় কঠিন ভিত্তির উপর। দীর্ঘপথ পার হয়ে আসতে অনেক পরিচয় ঘটে, তারা সত্য নয়, লক্ষ্যটাই সত্য, যেখানে এসে থেমেছে সে। থেমেছে সে অনুভার আশ্রয়ে। বিশ্বাসের মধ্যে, সততার মধ্যে, আন্তরিকতার মধ্যে পেয়েছে সে অনুভাকে।

এই সত্যাপলব্ধি তাকে দিল পথ দেখিয়ে। হে চন্দ্র শুক্লপক্ষের, ধন্যবাদ তোমাকে। হাত থেকে আংটিটা খুলে সে ছুঁড়ে দিল মাঠের উপরে। হারিয়ে গেল সেটা অন্ধকারের দিকে, অনন্তকালের দিকে, পাওয়া যাবে না আর।

তারপরে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগল ষ্টেশনের পথে।

৩

সেলাই নিয়ে বসেছিল বিরজা। ওটা অবলম্বন, উপলক্ষ্য, আসলে চেয়ে ছিল সে জান্‌লার বাইরে। জান্‌লার এইদিকটা পূর্বমুখী, সূর্যোদয় দেখা যায়, দেখা যায় পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়। এখন দুপুর অপরাহ্নের দিকে যাচ্ছে গড়িয়ে। শীতের বেলা, হাওয়া উঠেছে মাঠে মাঠে। রাঙা পথটা চলে গেছে সোজা; দূরে গিয়ে ঘুরে গেছে ডাইনে। তারই কোলে উঁচু নীচু প্রান্তর। ঘূর্ণী হাওয়ার ফুৎকারে ধুলো উড়ছে থেকে থেকে। দূরে থেকে দূরান্তর পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে দেখে নেওয়া যায়।

এমন করে এই পথটা কোনোদিন চোখে পড়েনি বিরজার। চোখ চেয়ে থাকলে চোখে আসে একটা ঘুমের নেশা।

এমন ব্যথা তার ভিতরে কোথাও নেই, যে-ব্যথাটা দাগা পায়। কোনো অভাব নেই তার, নেই কোন অভিযোগ। উদার ওই বিপুল অবকাশের দিকে চেয়ে অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার কথা নয় তার, চিন্তার বিলাস নেই মনে, আনন্দ আর ঐশ্বর্য তার দরজায় বাঁধা। অর্থাৎ বিরহ-বেদনাটা তার অপরিচিত। সেলাইটা আবার সে হাতে তুলে নিলে নিঃশব্দে। এই উন্মনা চেয়ে থাকাটা তার নূতন।

সাঁওতালি মেয়ের দল মাথায় বোঝা নিয়ে চলেছে পথে। কারো কারো গলায় প্রবালের মালা, হাতে কাঁকন, মাথার খোঁপায় বা কারো ফুল গোঁজা, কারো পায়ে রূপোর বেড়ি। সকলেই মনের খুসিতে চলেছে। এরই মধ্যে দুই একদল বাঙালী গৃহস্থ বেরিয়েছেন ভ্রমণে। ওদিকে একটা ঘোড়া নিয়ে একদল চাষী বালক ছুটোছুটি করছে।

পিছনে এসে দাঁড়াল ক্ষিতীশ। বললে, পিসিমা একটু ভাল আছেন, ট্রেনে নিয়ে যেতে আর কষ্ট হবে না, বুঝলে ?

হুঁ। বিরজা বললে।

ভাবছ কি বসে বসে বলো ত ?

বিরজা তাকাল তার দিকে হেসে। খুসি হয়ে বললে, ভাবছি জয়ন্তকে। বলেছে কল্‌কাতায় গিয়ে অনুভাকে রাখবে কিছুদিন আমার কাছে। আজ একবারটি আসে না সে ?

হেসে ক্ষিতীশ বললে, ডেকে আনব ?

কি বলবে গিয়ে ?

বলব, জয়ন্তবাবু, চলুন একবারটি। সেদিন কিছু কথা বাকি ছিল বিরজার, আজ সেটুকু শুনে আসবেন।

বিরজা বললে, কিন্তু কোনো কথা যে বাকি নেই। এলে কি বলব ?

তা হলে মুখোমুখি বসে থাকবে?

শীতের শেষের ঘূর্ণী হাওয়ার দিকে চাইলে বিরজা। বললে, সত্যি জয়ন্তকে আমার মনেই ছিল না এতকাল। কেন যে ছিল না সেই কথাটা ভেবেই আশ্চর্য হই। অথচ যখন ছিলুম কাছাকাছি, ভারি ভাল লাগত ওকে। ইস্কুল পালিয়ে বাঁশী বাজাতে শিখেছিল, সেই বাঁশী আমাকে শোনাত কাঠগোলার পাশে নিয়ে গিয়ে। ছেলে ছিল ভারি দুরন্ত।

এমন কথা শুনতে ক্ষিতীশের বাধা নেই, কেন নেই তা জানে সে। ঈর্ষা নেই স্বামীত্বের দিক থেকে, কারণ তার আট বছরের স্ত্রী বিরজা, সন্দেহ করার ক্ষুদ্রতা আসতে পারে না মনে। চিত্তের সঙ্গে চিত্তের বন্ধন সেখানে, সাগরের গভীর অন্তরের মতো নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি, মালিন্য নেই সেই জপের আসনের চারিদিকে।

ক্ষিতীশ বললে, খুসি হয়েছি ওকে দেখে, ছেলেটি বড় ভালো।

দুঃখে মানুষ হয়েছে। মা মরে গিয়েছিল ছোটবেলায়। দয়া আর অবহেলার ভিতর দিয়ে বড় হয়ে উঠেছে। নালিশ জমেছে তাই মনে মনে।

তা দেখলুম। তার ছাপ রয়েছে মুখে চোখে।

বিরজা আবার তাকাল পথের দিকে। ধীরে ধীরে বললে, কতদিন কেটে গেল তার পর!

সংসারের কথা উঠল একে একে। খরচপত্রের কথা, কলকাতার বাসার বিলি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা। ক্ষিতীশ বললে, তবে এমাসের চাল-ডাল আর এখানে কেনবার দরকার নেই, কি বল?

বিরজা বললে, যদি ফুরিয়েই যায় তবে খুচরো কিছু কিছু কিনে নিলেই চলবে।

চাকর বামুনদের মাইনে?

কলকাতায় গিয়ে দেব। ডাক্তার আর ওষুধের টাকাটা কেবল শোধ করে যাবো। ওমা, তুমি বিছানার চাদরখানা গায়ে জড়িয়েছ কেন?—বলে বিরজা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আঁচলের চাবি দিয়ে খুললে তোরঙ্গটা। কাশ্মিরী একখানা শাল বের করে দিলে ক্ষিতীশকে। বললে, খোলো চাদরটা, এইখানা জড়াও গায়ে। বলবে কি পিসিমা?

বেলা আর বাকি নেই। সান্ধ্য ভ্রমণে বেরোয় তারা নিয়মিত ওটা দাঁড়িয়ে গেছে অভ্যাসে। মিনির তাগিদকে এড়ানো কঠিন, মাবে সে টেনে পথে বের করবেই। আজ ক্ষিতিশ চলল সঙ্গে। বনমালী চাকরও র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে এল বেরিয়ে। ওজন বেড়েছে সকলের খোলা মাঠের বাতাস খেয়ে।

একটিমাত্র রাজপথ, আর সবগুলি শাখা প্রশাখা। সব পথ, সব বাড়ীগুলো বিরজার মুখস্থ হয়ে গেছে। স্বাস্থ্যলাভের জায়গাগুলির মতো বৈচিত্র্যহীন আর কিছু নেই, একই দৃশ্যের প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি। যাদের বায়ুসেবনের ইচ্ছা প্রবল, তারা যায় অজয়ের খাল পর্যন্ত, আর নইলে ভগ্ন মন্দিরটির নির্জন চত্বর অবধি।

সময়টা যেন কোনো রকমে খরচ করে দেওয়া। এখানে বসলে তারা, বসলে ওখানে। নিত্য যারা আসে যায়, আলাপ হোলো তাদের সঙ্গে। প্রাণের সম্পর্ক নেই, নেই আত্মীয়তার উত্তাপ, সামাজিক সৌজন্য আর ভদ্রতা। কাটল সময় এমনি ক'রে। আদব কায়দায় দুরন্ত যারা শহুরে মানুষ, বিশেষ করে বাঙালী সম্প্রদায়, তাদের সঙ্গে সহজে মিল খায় না বিরজার। ছোট ছোট বক্রোক্তি, অকারণ চাপা হাসি, চোখে মুখে অহমিকার প্রকাশ, শিক্ষার অভিমান,—সরকারি বড় বড় চাকুরের পরিবার পরিজন তারা। তাদের ওজন-করা কৃপা-মিশ্রিত সৌজন্য বড় ভয়ানক। হাসি পায় বিরজার তাদের চেহারা দেখলে।

মাঠের পারে সূর্যদেব নামলেন অস্তাচলে। সেই পরিচিত বড় তারাটা আকাশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হেসে উঠল। মেঘে মেঘে অস্ত উৎসবের রঙ এল ফিকে হয়ে। আলো জ্বালা হোলো কোথাও কোথাও। বিরজা বললে, চল বাড়ী যাই। অ বনমালী, মিনিকে ঠেলা গাড়ীতে তুলে নে বাবা।

ক্ষিতীশ বললে, আমি ভাবছিলুম তুমি বুঝি আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাবে জয়ন্তর ওখানে।

এতক্ষণ একথাটা মনে ছিল না বিরজার। এল দুর্বলতা মনে। প্রস্তাবটিকে সহজে সে পারলে না সাদরে গ্রহণ করতে। তাকাল সে ক্ষিতীশের মুখের দিকে! বললে, যাবার ইচ্ছে যদি, বলোনি কেন এতক্ষণ?

ক্ষিতীশ বললে, ভাবছিলুম তুমিই বলবে আগে। কতদূর এখান থেকে?

দূর আছে খানিকটা, সন্ধ্যেও হয়ে এল, আর একদিন বরং যাওয়া যাবে।

সেই ভালো। শোনো শোনো, তোমাকে ডাকছেন কে যেন পিছন থেকে।

ফিরে দাঁড়াল বিরজা। হেসে বললে, আসুন বৌদি, শরীর কেমন আপনার?

আমি তবে এগোই মিনিকে নিয়ে, তুমি এস।—বলে ক্ষিতীশ পা চালিয়ে দিলে।

বৌদি এলেন। চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী। স্বামী এখানে ডাক্তারী করেন। স্ত্রীর হাঁপানির অসুখ। বললেন, ভাল আছি একটু। খবর পেলুম ওঁর কাছে, আপনার পিসিমা ভালো আছেন। ক্ষিতীশবাবু এলেন কবে?

এই দিন দশেক হোলো। আপনি ত যাবেন ওই পথে। আমি আজ ক'দিন বাদে বেরিয়েছি।

বর বুঝি বন্দী করেছেন এসেই ?

বিরজা হাসলে। বললে, না বৌদি, স্বেচ্ছাবন্দী। ভ্রমণে বেরোই মনে মনে। তা'তে যাওয়া যায় অনেক দূর। আপনার সঙ্গে কে আছেন ?

একা বেরিয়েছি আজ, চলুন না খানিকটা ?

কিছুদূর গিয়ে বৌদি বললেন, কাটল কিছুকাল আপনাদের নিয়ে। এক এক সময় কেউ থাকে না এদেশে, তখন ভারি কষ্ট। বাড়ী এসে গেছে, আসুন না ভেতরে ? বসে যান্ একটু।

না বৌদি, ডাক্তারবাবু খুসি হবেন না সন্ধ্যের পর আমাকে বাইরে থাকতে দেখে। পালাই চুপি চুপি। আসব আর একদিন।

বিদায় নিয়ে বৌদি গেলেন চলে। বিরজা ফিরল বিপরীত মুখে। কিছুদূর আবছায়া অন্ধকারে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়াল সে। তাকালে এদিক ওদিক। এই পথ দিয়ে কিছুদূর ঘুরে গেলেই জয়ন্তর বাসা। যাবার কথা মনে হতেই ভয় হোলো তার—অথচ ইচ্ছার কাছে সে নিরুপায়। মনে হোলো যেতে তাকে হবেই, না গেলেও পা দুটো যাবে তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে ; কোনো মেয়েরই যেমন স্বাতন্ত্র্য নেই, তেমনি তারো নেই। অতএব যেতে হোলো তাকে, উপায় ছিল না পা না বাড়িয়ে।

এমন অবস্থাটাকে কী বলা যায় ? এ কি কেবল নিজেকে ভালো ক'রে জানবার কৌতূহল ? জানবার আছে কি, সবই ত স্পষ্ট। মন থেকে যে চলে গেছে তাকে মনের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আকুলি বিকুলি। সব মেয়ের মতোই সে, তার মন থেকে বিদায় নেয়না কেউ, সেখানে আজ সে হঠাৎ আবিষ্কার করে বসেছে জয়ন্তর অস্পষ্ট পদচিহ্ন। হ্যাঁ, দেখবে সে ভাল করে, দেখতেই সে চায়। হৃদয় নিয়ে খেলা নয়,

সৌখীন চিত্তবিলাস, মিথ্যা অভিনয়। যে সংসারটা তাকে কেন্দ্র ক'রে তার চারিদিকে বিস্তারিত, সেখান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলে দেখা যায় সে নিতান্তই একা ; সেখানে তার সজীব নতুন প্রাণ, সে স্ত্রী নয়, সন্তানের মা নয়, সংসারের নিত্য কর্তব্যের বাঁধনে সে বন্দিনী নয়,—সেখানে তার আজো রয়েছে অভিসারের আকর্ষণ, নারীর নিত্যকালের চিত্তপিপাসা।

পথের এদিকটা নির্জন, দিনের বেলায়ও লোক চলাচল স্বভাবত কম। দুইধারে কয়েকখানা বাংলা অনেকদিন থেকেই পড়ে রয়েছে খালি হয়ে। সরকারি আলো কখনো জ্বলে কখনো জ্বলে না—শুক্লপক্ষের দিকে প্রায়ই আলো দেখা যায় না।

বোঝা গেল তার মনটা রয়েছে সচেতন। অথচ চেতনা নেই পা দুটোয়, অবাধ্য হয়েছে তারা আজ। মনে মনে কথা গোছানো নেই, হঠাৎ দেখা হলে বলবার কথা যাবে ফুরিয়ে। আর কীই বা আছে বলবার? অনুভার স্বাস্থ্যের খবর নেবে? ছি, যদি তারা উল্টো বোঝে? সে অপমান যে সইবে না!

তবু চলছে প্রাণ। এই চলাটা রয়েছে মেয়েদের মধ্যে চিরদিন ধরে, এই ভ্রমণ পিপাসা তাদের সহজাত। চোখে ভীরুতা, কিন্তু দৃষ্টিটা পড়ে রয়েছে আপন প্রাণের দিকে আত্মগত হয়ে। আর ভীরুতা রয়েছে বুকে—যে পথ দিয়ে অভিসারিকার বেশে যুগযুগান্তকালের শ্রীরাধিকা চলেছেন ঘনশ্যাম রাত্রির রহস্যের দিকে।

রোমাঞ্চ হোলো বিরজার সর্বদেহ। শাল মুড়ি দিয়ে জ্যোৎস্নার আলোয় সে চলতে লাগল দ্রুতপদে। একটি অনির্বচনীয় সুখাবেশে তার চোখে স্বপ্ন নেমেছে তন্দ্রার মতো জড়িয়ে। বিচিত্র অনুভূতি ছিল তার মনে, এ যেন দুর্লভের আকর্ষণে দুঃসাহসের দিকে যাত্রা। দুঃখ নেই, ছিল অন্তর্গত আনন্দ। সকল পিপাসার পাশে রসের

পিপাসু। আপন গন্ধে ব্যাকুল হয়ে ছুটোছুটি পথে পথে। আজ নেই তার মনে চারিপাশের বহুমানবের সমাজ, সব খুলে খসে পড়ছে আভরণের মতো।

পথ পার হয়ে কিছুদূর এসে দরজায় সে থামল। ভিতরে ঢুকল ধীরে ধীরে সে যেন দেখতে গেছে, দেখা দিতে যায়নি। আলোটা ছিল না কাছাকাছি। যাক্ বাঁচা গেল, কৈফিয়তের দায় থেকে আত্মরক্ষা করতে পারলে সে। এমন কোনো কথা ছিল না যার জন্য এমন ক'রে এই সন্ধ্যায় তার আসার দরকার ছিল। এবার তার রুদ্ধ নিশ্বাসটা হাল্‌কা হয়ে পড়তে লাগল।

কৌন্ হ?

কে, মহারাজ নাকি? এই এসেছিলুম তোমার বাবুর খবর দিতে, যাচ্ছিলুম ফিরে এই দিক দিয়ে। সব ভাল ত?

মহারাজ কাছে এসে জানালে সব ভালই আছে। মিনির খবর নিলে সে। বললে, বৌমা আর বাবু গেছেন ট্রেণে চড়ে' পরের ষ্টেশনে বেড়াতে। আসবেন এখনই।—মহারাজ তাকে অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানালে।

বিরজা বললে, রাত হয়ে গেছে, আজ আর নয়, আর একদিন আসব। বোলো তোমার বাবুকে। আর একটি কাজ করো বাবা, আমাকে খানিকটা এগিয়ে দাও; এসো।

আবার নামল বিরজা পথে। পথে নেমে জিজ্ঞেসা করলে, আমার কথা কিছু শুনেছ ওঁদের মুখে মহারাজ?

মহারাজ চলতে চলতে বললে, কিছুই শোনেনি সে। কষ্টে বিরজা হাসলে একটু। এইবার লাগল ঠিক জায়গায় আঘাত। মেয়েরা সইতে পারেনা পুরুষের ঔদাসিন্য, অবহেলা। এমন কি শাস্তিও তারা সয়, যদি সেখানে থাকে কোনো প্রাণের ইতিহাস। তার সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য

নেই, এতই মূল্যহীন সে? তার ব্যবহারে, তার স্নেহে এমন আন্তরিকতা কি একটুও বাজেনি, যার জন্য অন্তরালে তাকে নিয়ে চলে আলোচনা,—নিন্দা ও প্রশংসা? চোখের আড়ালে গেলেই কি মনের আড়াল পড়ে? তবে কি মানুষ চলে গেলেই সবাই তাকে ভুলে যায়?

জানে সে, জানে এই বেদনাটা কাল-কালান্তের। চলে যেতে হবে তাকে একদিন, সেই যাওয়াটা হবে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাওয়া, রেখে যেতে সে পারবে না কোনো স্থায়ী পরিচয় এই পৃথিবীর কোনো একখানে, বাঁচতে পারবে না সে কোনো মানুষের কণ্ঠে, তবু একান্ত অবহেলায় তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করাটা বাজল তার বুকে কঠিন হয়ে। বাজল করুণ হয়ে।

এবার তুমি যাও মহারাজ, আমি চলে যেতে পারব।

চলিয়ে আওর থোড়া—

না, না বাবা, না, তুমি যাও এবার। পথ আমি চিনতে পেরেছি।—কাঁপতে লাগল বিরজার কণ্ঠ। ঝড়ে যেমন কাঁপে সমুদ্র, ভূমিকম্পে যেমন কাঁপে লোকালয়।

মহারাজ আর গেল না।

কয়েক পা দ্রুতপদে গিয়ে আবার ফিরলে বিরজা। বললে, শোনো বাবা একটি কথা বলি। তুমি ওঁদের লোক, তবুও এই অনুরোধটি রেখো, আমি যে এসেছিলুম, এই যেন তাঁরা জানতে না পারেন।

চেষ্টা করলে সে তার আত্মমর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে, কিন্তু দৈন্যের ভিতর দিয়ে এই চেষ্টা, তাতে তার চোখেও এল জল। কিন্তু দাঁড়ালে না সে আর, শালখানা আগোছাল অবস্থায় কোনোমতে ধরে পা দুটো চালাতে লাগল প্রাণপণে।

বৌদি আছেন নাকি বাড়ীতে?

ভিতর থেকে ডাক শুনে অনুভা এল বেরিয়ে। কিন্তু সুমুখে অপরিচিত লোক দেখে মাথায় সে দিলে ঘোমটা টেনে।

আসুন বৌদি আপনাকেই আমার দরকার, বিশেষ দরকার।

আপনাকে ত চিনতে পাচ্ছিনে?—অনুভা বিনম্র কণ্ঠে বললে।

ক্ষিতীশ হাসলে। বললে, চেনবার দরকার নেই। আমি চিনি জয়ন্তবাবুর স্ত্রীকে, এতেই আপাতত চলবে। আসুন এখন সেজেগুজে, নিয়ে যাই আপনাকে।

বিপদে পড়লে অনুভা। মহারাজ এসে ঢুকল মিনিকে কোলে নিয়ে। তাকে দেখেই ঝাঁপিয়ে গিয়ে কোলে নিলে অনুভা। আদর করে বললে, তোমার মা কই?

এইবার আমি কে বুঝে নিন্ বৌদি। মা কোথায় সে কৈফিয়ৎ আমি দেব। অজয়ের ধারে আজ সাঁওতালিদের মেলা, খেলা হবে তীর-ধনুকের। দোহাই, বিশ্বাস করুন, আপনার স্বামী এবং আমার স্ত্রী আছেন সেই মেলায়, বনমালী আছে সঙ্গে। মিনির ওপর ভার পড়ল আপনাকে নিয়ে যাবার।

অনুভা হেসে বললে, তবে আপনি এলেন কেন? আপনাকে ভার দিলে কে জামাইবাবু?

দিলে কে? দাসখৎ লিখে দিয়েছি যার কাছে তিনি। সাহস করে পাঠালেন আমাকে আপনার সকাশে, তিনি বেশ জানেন বিপদের আশঙ্কা নেই। পাকা দলিলের সম্পত্তি, বাজেয়াপ্ত হবার ভয় রাখেন না।

মহারাজ চেয়ার এনে বসালে ক্ষিতীশকে। হেসে অনুভা ঢুকল ঘরে গিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে সে আবার এল বেরিয়ে। দেখা গেল থালায় ছাড়ানো কমলালেবুর কতকগুলি কোয়া আর কিছু নতুন গুড়ের সন্দেশ। ডান হাতের গেলাসে ঘোলের সরবৎ।

দিন, এইজন্যেই ত এলুম। এ অভ্যেস আমার আছে বৌদি, বিনা উৎসবে আমি নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াই, পর্বের দিনে খুঁজে পায়না কেউ আমাকে। এই রোদ্দুরে সরবৎটা লাগবে চমৎকার। দেরি হয়ে গেল, বোধ হয় দুটো বাজে। মিনিকে নামিয়ে দিন্ কোল থেকে!

অনুভা বললে, ওঁকে যে কতদিন বলেছি একবার মিনিকে আনতে! উনি আমার একটুও বাধ্য নয় জামাইবাবু।

পোলিশটা শুনতে ভাল বৌদি, সহানুভূতি প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে।—বলে ক্ষিতীশ শেষ করলে সরবতের গেলাসটা, পরে নিলে সন্দেশের রেকাব। পুনরায় বললে, চলুন, আপনার মামলার বিচার হবে আজ, বিচারের ভার নেবেন বিরজা। আমি হবো পাবলিক প্রসিকিউটর, বাদীর পক্ষ থেকে গোপনে ঘুষ খেয়ে চললুম, বিকৃত করে মামলা সাজাবো প্রতিবাদীর বিপক্ষে। তারপর বিরজার চেম্বারে যাতায়াত করে আপনার পক্ষে মামলা জিতিয়ে দেব।

অনুভা হেসে বললে, সর্বনেশে লোক আপনি দেখছি! সরকার থেকে আপনার রায়বাহাদুর খেতাব পাওয়া উচিত।—আবার ভিতরে গিয়ে সে ঢুকল কাপড় ছাড়তে।

বাসায় তালা বন্ধ করে মহারাজও নেমে এল পথে। কাঁধে তুলে নিলে মিনিকে। একটি পুতুল সে সংগ্রহ করে রেখেছিল ইতিমধ্যে, সেটি এবার হাতে গুঁজে দিলে মিনির। অন্তরের সুর ছিল তার এই মেয়েটির সঙ্গে। বয়সের পার্থক্যটা তাদের আলাপে বাধা ঘটালো না; গল্প চলতে লাগল।

অনুভা বললে, উনি বেরিয়েছেন সকালে খেয়ে দেয়ে। কোথায় মেলা, কোথায় কাণ্ড কারখানা এই উনি করে বেড়ান্ সারাদিন।

কিন্তু আপনাকে এড়িয়ে যাবার তাৎপর্যটা কি বৌদি?

অনুভা হাসলে। বললে, তাৎপর্য কিছু নেই, আমি এখন এড়িয়ে

থাকি ওঁকে। পুরুষ মানুষ দুর্দান্ত, বাইরে বাইরে থাকাই ভাল। ওদের বাসা আস্তাবলে, গাড়ী টানলেই আপনাদের মানায়।

আপনার এই ব্যক্তিগত আক্রমণের তাৎপর্য? ক্ষিতীশের চোখে ফুটল সহাস্য কৃত্রিম অনুযোগ।

যেমন দেখছি। আমি সঙ্গে থাকলে উনি ঘুরবেন সারাদিন টো টো করে। পেরে উঠব কেন পাল্লা দিয়ে বলুনত? একেই আমি মোটা মানুষ!

পথটা ঘুরে রেললাইনের দিকে চলে গেছে সোজা। রোদ আর ধূলোয় হাঁটতে হাঁটতে তারা এসে পড়ল মাঠের ধারে। ধানের ক্ষেত, কিন্তু ধান কাটা হয়ে গেছে, দু'চারটে খড়ের আঁটি ছড়ানো এখানে ওখানে। তারই একধারে খানিকটা সমতল জায়গায় লোক সমাগম হয়েছে। সহর থেকে এসেছেন অনেকে। পাশেই বসেছে দোকান দানি। ছুটোছুটি করছে ছেলেমেয়েরা। ভিড় হয়েছে সাঁওতালি স্ত্রীপুরুষের। এখানে নাকি বর ও কন্যা নির্বাচিত হবে।

দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়ে জয়ন্ত আর বিরজা এল এগিয়ে। অনুভা গিয়ে হেসে ধরলে বিরজার হাত। বললে, নিজে গেলেন না পায়ের ধূলো দিতে, পাঠালেন বুড়ো বরকে। বেশ যা হোক।

ক্ষিতীশ কৃত্রিম বিস্ময়ে বললে, অবাক করলেন বৌদি। এত করে কানে মন্ত্র দিতে দিতে এলুম পথে, অবশেষে বুড়ো বলে অপছন্দ?

বিরজা বললে, পাঠিয়েছিলুম কারণ স্বার্থ ছিল। তোমার তরুণ দেবতাটিকে রেখেছিলুম কাছে নিজের দরকারে।

জয়ন্ত বললে, ক্ষিতীশবাবু, দরকার এখনো ফুরোয়নি, নাটকের শেষ অঙ্ক বাকি। ভাবছিলুম দুজনে যে অনুভার সঙ্গে আপনার আলাপটা আর একটু দীর্ঘ হবে।

বিরজার চোখ পড়ল জয়ন্তর চোখে।

অনুভা হেসে বললে, তবে সময় দিয়ে যাচ্ছি দিদি। গান শেষ হলে আবার আরম্ভ হবে অভিনয়। চলুন জামাইবাবু, এবার পছন্দ হয়েছে আপনাকে, চড়ি গিয়ে দুজনে ওদিকে নাগর-দোলায়।

জয়ন্ত হাসলে। বললে, একেই বলে মেয়েদের খোঁটা। বেশ, খুব বাহাদুর, এমন হাসির চেয়ে কাঁদলেও যে ছিল ভাল!

সবাই হাসতে লাগল। বিরজা পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরলে অনুভাকে। চুম্বন করলে তার মাথায়। বললে, সময় দিতে হবে না বোন্, সময় গেছে ফুরিয়ে। কতকটুকু ধরে রাখতে হয়, কতটুকু হয় ছাড়তে—এ তুমি জানো দেখে আনন্দ পেয়ে গেলুম।

দুজনে গল্প করতে করতে গেল কিছুদূর। ক্ষিতীশ রইল জয়ন্তকে নিয়ে। সহরের সম্ভ্রান্ত মেয়ে যাঁরা এসেছেন মেলায়, যাঁরা কিছু পরিচিত, তাঁদের সঙ্গে বিরজা একে একে পরিচয় করিয়ে দিল অনুভার। তাঁরা কেউ হাসলেন ঠোঁটে, কেউ হাসলেন দাঁতে, কেউ বা আলাপ করলেন আন্তরিকতার সহিত। কুমারী মেয়েরা তাকালেন অনুকম্পাভরে। চলে গেল যখন তারা, তখন সুরু হোলো তাদের আভরণ ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে টীকা-টিপ্পনী। যাঁরা নীরবে রইলেন তাঁদের চোখে ফুটল তাচ্ছিল্য।

একটু নির্জ্জনে এসে বিরজা বললে, জয়ন্ত আজ এসেছে অনেকক্ষণ, আমাদের অনেক আগে। হুজুগ একটা পেলে ও ঝড়ের আগে দৌড়য়, এই স্বভাবটা ওর চিরকাল। এসে দেখি রোদে মুখ রাঙা ক'রে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অনুভা বললে, আমার চেয়ে আপনি ত ওঁকে ভালই জানেন দিদি।

ভাল করেই জানতুম, কিন্তু সেই জানাটা ত একটু একটু করে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তুমি দেখে নিয়ো বোন্, ওকে যতই জানবে ততই জানবার ইচ্ছা হবে প্রবল, ততই ভাল লাগবে ওকে।

কথায় ফুটল বিরজার অপরিমেয় মমতা, সেটা গভীর হয়ে স্পর্শ করলে অনুভাকে। বললে, আমি শুনে খুব খুসি হয়েছি দিদি যে, আপনাদের মধ্যে সত্যিই ভালোবাসা ছিল।

বিরজা রইল চুপ ক'রে। ওদিকের একধারে সুরু হয়েছে তীরধনুকের খেলা, অন্যধারে মেয়েপুরুষের গ্রাম্য নৃত্য। একটা দল মাদল বাজিয়ে ধরেছে গান। হাত তালি দিয়ে তাল দিচ্ছে কেউ কেউ। তাদের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে উঠে আসছে এক একজন তরুণ, কোনো কোনো মেয়ের মাথার খোঁপায় হেসে পরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ধুঁতরো ফুলের মালা। উচ্ছ্বসিত আনন্দে তখন হেসে উঠছিল অনুভা।

এক সময়ে সে বললে, শুনলুম দিদি, আপনারা শীঘ্রই চলে যাবেন। থাকুন না আর কিছু দিন?

বিরজা বললে, খুসি হও থাকলে?

ওমা, খুসি হইনে? নিজের লোক পেয়েই গেলুম যদি বিদেশে এসে, তবে ছেড়ে দেব কেন সহজে? এখানে মেলা-মেশা করবার মানুষ পাইনে।

তাহলে তোমার সুবিধের জন্যে থাকব, এই বলচ?

অনুভা হেসে হাত চেপে ধরলে বিরজার। বললে, হার মানলুম। হার মানাতেই আমার আনন্দ দিদি।

তার কপালের চুলগুলি গুছিয়ে দিলে বিরজা, এবং সেই অবসরে দেখে নিলে একবার অনুভার সুন্দর মুখখানি প্রাণের সমস্ত কৌতূহল নিয়ে। তারপর বললে, থাকলেই খুসি হও,—আচ্ছা থেকেই যাব আর কিছু দিন। উনি কালকেই চলে যাবেন, ছুটি ফুরিয়েছে, দেখছি তবে যাবার সময়ও আমাকে একলা যেতে হবে। তুমি যাবে ত একদিন আমার ওখানে জয়ন্তকে নিয়ে?

একদিন কেন, রোজ যাব, পাতব গিয়ে ঘরকন্না আপনার বাড়ীতে। —অনুভা হাসতে লাগল।

বিরজা বললে, দেখি হাত ?

হাত তুললে অনুভা।

আংটিটা পারোনি কেন ভাই ?

অনুভা তাকাল নির্বোধের মতো। বললে, কোন্ আংটি দিদি ?

যেটা পাঠিয়ে দিলুম জয়ন্তর হাতে তোমার জন্যে, দেয়নি জয়ন্ত ? বোধ হয় ভুলে গেছে তবে।

আংটিটাই অনুভার কাছে বড় কথা নয়, গোটা চার পাঁচ আংটি তার হাতবাক্সতে জমা, বড় হচ্ছে দিদির স্নেহোপহার। বললে, ভুলে গেছেন ? এমন ভুল ত হয় না ওঁর ? কই, ওঁর হাতেও ত দেখিনি সেটা ?

বিরজা নির্বাক হয়ে তাকালে তার দিকে। আঘাত বাজল তার মনে মনে। কোথায় যেন সে নিজেকে অপমানিত মনে করলে। ছোট হয়ে গেল। দাবি নেই তার, জোর ক'রে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছিল দাবি, পেল প্রত্যাখ্যান, ছিঁড়ে গেল সূত্রটা। জ্বালা ক'রে এল তার চোখদুটো।

মাথা হেঁট করলে অনুভা। বললে, বুঝলুম না দিদি, এমন ভুল উনি কেন করলেন।

করুণ হাসি হাসলে বিরজা। বললে, ভুল সে করেনি অনুভা। ভাঙা মন্দিরকে সে স্বীকার করলে না, করলে না তার সংস্কার, ভেঙে সমভূম ক'রে দিলে।

কিন্তু দিদি, বঞ্চিত হলুম আমি যে।

বঞ্চিত নয় ভাই, পেলে বেশি ক'রে। ভবিষ্যতটা তোমাদের হোক বড়, মুছে গেল ইতিহাস। আচ্ছা, চললুম বোন এখনকার মতো, যেয়ো একদিন। ওরে বনমালী, মহারাজের কাছ থেকে নে মিনিকে। চল্ বাড়ী ফিরি, বেলা আর বাকী নেই।—বলতে বলতে বিরজা প্রায় দ্রুত-পদেই চলতে লাগল সকলের আগে। জয়ন্ত লক্ষ্য করছিল তাকে দূর থেকে।

অনেক পিছনে রয়ে গেল ক্ষিতীশ, ক্ষিতীশের পাশে পাশে বনমালীর কাঁধে মিনি। ফিরে চাইলে না আর বিরজা। প্রয়োজন ছিল না পিছন ফিরে তাকাবার। কর্কশ অসমতল মাঠ, পায়ের ঘুন্টিপরা জুতোর ভিতর দিয়ে ফুটল এক আধটা খড়ের খোঁচা, ছোড়ে গেল পা, ভ্রূক্ষেপ করলে না সে। এই খুব ভাল হয়েছে, গেল অল্পের উপর দিয়ে। এমন কাজ আর হবে না। অধিকার সে বেশি করে নিতে গিয়েছিল, এসেছিল সে সীমা-রেখার উপর—জানিয়ে দিলে ওরা তার মূল্য কতটুকু। কবেকার গতযুগের পরিচয়, তারই সূত্র ধরে এই গায়ে-পড়া ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন ছিল না। ভালোবাসার সম্পর্কটা কাঁচের মতো ভঙ্গুর, ভাঙলে জোড়া লাগতে চায় না।

সাত বছর চলে গেছে, ভুলে যাওয়া উচিত ছিল সব। তার স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে জয়ন্ত ছিলই না, থাকলেও ছিল সীমান্তের বাইরে। যা স্বাভাবিক। এখন সে গেল দূর থেকে দূরান্তরে। যাক গে। এই ভাব-বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাওয়া বিরজার ভাল হয়নি। তার স্বামী, তার সন্তান, তার সংসার। জয়ন্তকে নিয়ে এ কদিনের চিত্তবিলাস কেনই বা তাকে ভূতের মতো পেয়ে বসেছিল? কী চাইতে গিয়েছিল সে? কেন প্রশ্রয় দিতে গিয়েছিল এই অসামাজিক চাঞ্চল্যকে?

ছুটল বিরজা। ছুটেছে সে যেন মাঠের পর মাঠ, ছুটেছে যেন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, উদয় থেকে অস্ত। পথ ফুরিয়ে সে পৌঁছবে তার পরম আশ্রয়ে। শেষ লক্ষ্যে।

ফুরোল পথ। বিস্রস্ত গায়ের চাদরখানাকে গুটিয়ে এক পা ধুলো নিয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে সে এসে উঠল দরজায়। ঝি আসছিল বাইরে, তাড়াতাড়ি সে বললে, চিঠি এসেছিল রে?

কোথাকার চিঠি বৌমা?

কোথাকার? কোথা থেকে চিঠি আসা সম্ভব? আসেনি

কল্‌কাতা থেকে? দেখিগে—বলে নিজেই সে ছুটল অন্দরে। তর তর করে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। চেঁচিয়ে বললে, ও ঝি, কমলালেবু কিনে আনতে বলেছিলুম মিনির জন্যে, হয়েছিল আনা? দেখি পিসিমা কেমন আছেন। ঠাকুর এখনো রান্না চাপায়নি? এরা সব ভারি অবাধ্য হয়ে উঠেছে!

গেল সে শোবার ঘরে। বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেললে গায়ের শালখানা। সেদিন টুপিটা যেমন করে ছুঁড়ে দিয়েছিল জয়ন্ত ওই বিছানার উপর। গায়ের ফ্লানেল-ব্লাউজটা সে খুললে, কাপড়খানা ছেড়ে পরলে অন্য একখানা আটপৌরে সাড়ী। প্রশ্ন করলে, উনি এখনো আসেননি রে? গল্পে একবার মাত্‌লে আর বাড়ীর কথা মনে থাকে না। আশ্চয্যি মানুষ!

কা'র সঙ্গে কথা হোলো তার ঠিক নেই। তারপর সে ঘুরলো ঘরময়, দাঁড়ালো গিয়ে জান্‌লার ধারে, ঘুরে এল বারান্দায়। হ্যাঁ, এইবার সে পিসিমাকে ওষুধ খাওয়াবে। ঘরে সব অগোছালো হয়ে রয়েছে, বিছানাটা ওলোটপালট—ঝড় বয়ে গেছে যেন ঘরে। আজ সে নিজের হাতেই করবে সব, ঝিয়ের সাহায্য নেবে না। হাসলে সে একবার। হারমোনিয়মটা সঙ্গে এনেছে, গান গায়নি একদিনো। গাইবে নাকি একটা পূরবী এই ভরসন্ধ্যায়? বড় করুণ রস—থাক্।

পায়ের শব্দ হোলো সিঁড়িতে। ভয়ে তার গলা বন্ধ হয়ে এল। জয়ন্ত আবার এল নাকি তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করতে? আবার এল ঝড়? আবার এল বন্যা? প্রলয়ের হাসি দাঁড়িয়ে দেখার সাধ নেই আর।

ছুটে গেল বিরজা খাটের পাশে ভীরু শশকের মতো, ছেলেমানুষের লুকোচুরির মতো। এমন সময় ক্ষিতীশ এসে ঢুকল ঘরে। হেসে বললে, ওকি হচ্ছে গো?

হেসে উঠল বিরজা, ফেটে উঠল। যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল তার

এই চৌর্যবৃত্তি। হাসতে হাসতে ছুটে গিয়ে দুই হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলে স্বামীকে। বললে, জানতুম তুমি আসছ, জব্দ করছিলুম তোমাকে।

আরো জব্দ?—ক্ষিতীশ হেসে বললে, জয়ন্তর সম্বন্ধে তোমার পক্ষপাতিত্ব দেখে বৃদ্ধবয়সে প্রায় বিদ্বেষ এসে গিয়েছিল আমার মনে। আর খেলা বাকি নেই ত?

তার গলার মধ্যে মুখ ও মাথা ঘষে বিরজা আদর করলে, আদর জানালে। প্রাণের একটি অশ্রুত অসংবদ্ধ ভাষা ফুটে উঠতে লাগল তার মুখে। সে ভাষা নিবিড় রসাবেশের—তার মধ্যে বাক্যগত স্পষ্ট অর্থ নেই, আছে কেবল কণ্ঠের অস্ফুট ধ্বনি।

তৃতীয় দিনের বিকালে অনুভাকে নিয়ে জয়ন্ত এসে দাঁড়ালে ক্ষিতীশের বাড়ীর দরজায়। ভিতরে যাবার আগে ডাকলে একবার। সাড়া এল না। দোতলার দিকে মুখ তুলে আবার ডাকলে সে। তবু উত্তর নেই। বিপদ কিছু ঘটেনি ত এদের?

দু'জনেই ভিতরে ঢুকল। অনুভা বললে, নেই ত কেউ? চলে গেছে নাকি সব?

চিন্তিত হয়ে জয়ন্ত বললে, বোধ হয় চলেই গেছে। খাঁ খাঁ করছে।

ঠিক পেলে না দুজনে হঠাৎ কি করা যায়। সব বাড়ীটা তারা ঘুরে ঘুরে দেখলে। বাড়ী বদল করার জঞ্জাল উড়ছে হাওয়ায় হাওয়ায়। পায়রাগুলো ডাকছে কার্ণিশে। নেই তারা কোথাও, তারা পালিয়েছে। কান্না এল অনুভার চোখে। বললে, অপরাধ করেছিলে তুমি, দাওনি তুমি আংটি আমাকে, ফেলে দিয়েছিলে মাঠে,—দিদি ব্যথা পেয়ে গেছেন। এই ত তোমার বদলি হবার কথা হচ্ছে, কলকাতায় গিয়ে তোমাকে নিজের অপরাধ স্বীকার করতে হবে।

চুপ করে রইল জয়ন্ত। বলবার আছে কি?

তুমি না চাইলে আমাকেই ক্ষমা চাইতে হোত্রো তোমার হয়ে। অপরাধ জমা রয়ে গেল চিরকালের জন্যে।

তাই ত। উদাসীন হয়ে চেয়ে রইল জয়ন্ত। একবার তার মনে প্রশ্ন এল, আবার গেল মিলিয়ে। নীরব নির্জন পুরীতে মাঝে মাঝে অনুভার এক একটা কথা চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে এসে বাজতে লাগল তার কানে। জীবনের অগ্রগমনের পথে সকলেই অপরিচিত, সেই আঁকাবাঁকা পথের কোনে এক-খানে দেখা হয়ে যায় চেনা মানুষের সঙ্গে, কথা জমে ওঠে পরস্পরের কণ্ঠে, আবার তারা যায় হারিয়ে, আবার যায় তলিয়ে।

নিশ্বাস ফেললে জয়ন্ত। ধূলাবালির উপর বসে পড়লে সে ক্লান্ত হয়ে।

অনেকক্ষণ সে বসে রইল, তারপর উঠল ধীরে ধীরে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল দু'জনে। অনুভা বললে, কল্‌কাতায় গেলে আবার দেখা হবে, কেমন?

জয়ন্ত তার কাঁধের উপর হাত রেখে হাসল। বললে, নাই বা হোলো। চলো যাই এখন, অনেকটা রাস্তা যেতে হবে।

৫

নিয়তির রথ ছুটল আবার। স্রোতের টানে ভাসল জীবন। মহাকালের খাতায় জমা হোলো অনেকগুলি বছর। দেখা হোলো না আর কা'রো সঙ্গে কা'রো, ভুললে তারা পরস্পরকে।

চাকরির উন্নতি হয়েছে জয়ন্তর। সংসার হয়েছে বড়, অনেক পাখী অনেক দিক থেকে এসে বাসা বেঁধেছে তার গাছে। কলরব করে, করে কোলাহল। অনেক পরিশ্রমে জয়ন্ত ব্যাঙ্কের খাতায় জমিয়েছে অনেক

টাকা। ঘুষখোর জয়ন্ত চৌধুরী বলে একটা জনশ্রুতি রটে গেছে তার কর্মক্ষেত্রে। সে নাকি অনায়াসে রুই-কাৎলা গিলে খায়। কেন খাবে না? সংসার কি কাউকে ছেড়ে কথা কয়? অমন অনেক দরদী বন্ধু দেখা গেছে জীবনভোর, যারা নামাবলী গায়ে চড়িয়ে বকধার্মিক সেজে আসে হিতোপদেশ শোনাতে। তার মাথায় টাক্ পড়েছে একটু একটু, একটু ভুঁড়িও হয়েছে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের চাকচিক্য দেখা যায় তার সর্বাঙ্গে। দু'হাতে তিনটে আংটি। স্নান করবার সময় একটা চাকর তাকে তৈলমর্দিত করে। এ নিয়ে একদিন বৌদি করেছিলেন পরিহাস, জয়ন্ত একটা চোখ কুঞ্চিত ক'রে ব্যঙ্গোক্তি করেছিল, দুঃখ সয়েছি অনেক বৌ-ঠাকরুণ, বিলাসিতাটাও সয়ে যাবে।

শোনা যায় জয়ন্তবাবু নাকি হ্যাণ্ডনোটে লোককে টাকা ধার দিয়ে গোপনে তেজারতি কারবার করেন।

ছেলে মেয়ে চারটি। বড় ছেলেটি স্কুলে পড়ে। অনুভা দেবীর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ নাকি ভাল নয়, সংসারের কোনো পরিশ্রমই তিনি পেরে ওঠেন না। ঝি-চাকর-ঠাকুর কেবল তাঁর হুকুমেরই অপেক্ষা করে। ছোট মাসিমা আছেন সংসারে তাঁর করুণার প্রার্থিনী হয়ে, তাঁর ফাই-ফরমাসের পুতুল হয়ে। শেষের একটি সন্তান নষ্ট হয়ে যাবার পর থেকেই শরীরের গতিক ভাল নেই অনুভার।

কিছুকাল পূর্বে সহরের দক্ষিণপাড়ায় বিঘা তিনেক জমি কেনা হয়েছে, একখানা বড় বাড়ী তৈরী করা হচ্ছিল, তারই একটা প্ল্যান্ নিয়ে তর্কবিতর্ক চলেছে। একদিন সকালে জয়ন্তবাবু এসে ঢুকলেন স্ত্রীর ঘরে। ঘর তাঁদের পরস্পরের আলাদা।

জেগে আছ নাকি? ওগো শুনচ?

উষ্মকণ্ঠে স্ত্রী বললেন, ঘুমোতে আবার দেখলে কবে এমন সময়ে, যত অনাছিষ্টি কথা!

অমন তিরিক্ষি মেজাজ কর্‌ছ কেন? বাড়ী হবে, না আমার শ্রাদ্ধ হবে, পিণ্ডি হবে!—জয়ন্তবাবু মুখ বিকৃত করলেন।

তোমার মেজাজও যে দেখছি বরফের মতো ঠাণ্ডা! সুদের টাকায় বুঝি কেউ ফাঁকি দিয়েছে?

জয়ন্তবাবু বললেন, বাজে কথা রাখো। জমি তুমি দেখে এসেছ সেদিন। পথটা পড়ে পশ্চিমে, পশ্চিম-মুখো বাড়ী না হলে আর উপায় নেই।

অনুভা বললেন, যা খুসি করোগে, পরামর্শ করতে এস না আমার কাছে। নানান জ্বালার শরীর আমার। দক্ষিণ দিকে সদর দরজা করতে যদি না পারো, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ো, থাকব সেখানে গিয়ে।

এর উত্তরে জয়ন্তবাবু যে সকল আলাপ এবং আলোচনাদি করলেন, উভয়ের পূর্ব জীবনের সঙ্গে যাদের কিছুমাত্র পরিচয় ঘটেছিল, তারা এঁদের নৈতিক অধঃপতন দেখে হয়ত স্তম্ভিত হয়ে যাবে। মধুবর্ষণ চলতে লাগল অনেকক্ষণ। কোথায় ছিল একটা ছিদ্র, কালক্রমে সেই ছিদ্রপথ দিয়ে এসেছে মনের মালিন্য, ছোট ছোট অহঙ্কার, দুর্বিনীত মাৎসর্য—তাদের পথরোধ করা যায়নি। ছিল না সেই শক্তির আয়োজন। ভুলেছে তারা নিজেদের, ভুলেছে পূর্বজীবন।

জয়ন্তবাবু রাগ করে বেরিয়ে গেলেন। বলে গেলেন যাবার সময়, অত যদি সখ তবে যেয়ো বাপের বাড়ীতে, একলা থাকবো নতুন বাড়ীতে ছেলে মেয়ে নিয়ে।

উত্তর এল, তাই থেকো। বাঁচি তাহলে। বিয়ে ক'রো আর একটা।

আবার একদিন বোঝাপড়া হয়ে গেল। হতেই হবে, না হয়ে উপায় নেই। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে। বললেন, শোনো বৌ, ভারি সুবিধে

হয়েছে। সোনার দর উঠেছে উনত্রিশ টাকা, গয়নাগুলো এইবেলা বেচে দিই, আমার ত কুড়ি টাকা দরে কেনা। লাভ আছে বেশ।

লাভ-লোসকানের জ্ঞান অনুভার কম নয়। বললে, তা না হয় দিলে, কিন্তু আমার এই ফারফোরের অনন্ত জোড়া বেচতে দেবো না, তা বলে দিচ্ছি।

হেসে বললেন জয়ন্তবাবু, আচ্ছা না হয় অনন্তর দিকে চোখ আমার নাই পড়ল।—বলে তিনি চলে গেলেন।

সেবার গহনা বিক্রী করে' লাভ হোলো প্রায় দু'হাজার টাকা, কেনা দাম ছাড়া।

একদিন তিনি প্রস্তাব করলেন, নতুন মোটর কিনলুম, চড়লে না তুমি একদিনো। চলো না দেখে আসবে আজ বাড়ীটা কতদূর হোলো।

শরীর যে ভালো নয়।

গাড়ী করে' যাবে-আসবে, কষ্ট কিছু নেই।

রাজি হলেন অনুভা। শরীরটাকে সোজা করে' দাঁড় করাতে তাঁর কষ্ট হয়। অসুখ বলে' নয়, মেদ ও মাংসের ভারে তিনি ভারাক্রান্ত। সহজে হাঁপিয়ে পড়েন, হাঁটতে পারেন না, গাড়ীর পা দানিতে উঠতে গেলে মাথা যায় টলে'।

তবু বেরুলেন তাঁরা। দুটি ছেলেমেয়ে সঙ্গে চলল, দুটি রইল ঝি'র হেপাজতে। দাই গেল সঙ্গে তাঁর তদ্বিরে। সমস্ত পথটা শেষ হোলো হিসাব-নিকাশে। এসে নামলেন নতুন বাড়ীর বাগানে। বাড়ী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

দাইয়ের সঙ্গে অনুভা চারিদিক দেখা-শোনা করতে লাগলেন, জয়ন্তবাবু ইমারতের মধ্যে ঢুকে এক জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। তাকালেন একবার সকল দিকে। এত বড় বাড়ী এ তল্লাটে আর

কারো নেই, সবাইকে দিয়েছে টেক্কা। হ্যাঁ, এই তিনি চেয়েছিলেন, এর চেয়ে বড় কাম্য আর কি ছিল তার জীবনে? আর কি কাম্য থাকতে পারে মানুষের? যতদূর মনে পড়ে, শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত —এই ঐশ্বর্যের স্বপ্নই তিনি দেখে এসেছেন। পরিশ্রম করেছেন অক্লান্ত, দুঃখ পেয়েছেন প্রচুর, প্রবঞ্চিত হয়েছেন বহুবার, প্রতারণা করেছেন তিনি অনেককে। নিজের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, অর্থের জন্য কখনো কখনো নামতে হয়েছে অনেক নীচে। আজ ডুবলো সব, ডুবলো তাঁর দুর্নাম আর কলঙ্ক, ডুবলো দুঃখের স্মৃতি। সার্থক হোলো তাঁর জীবনসাধনা।

তবু এখনো অনেক বাকি। আরো অর্থ চাই, অনেক উপার্জন এখনো করতে হবে। এমনি অট্টালিকা তুলতে হবে শহরের চারিদিকে চারখানা। টাকা চাই, টাকা, টাকা! বন্যার মতো চাই ঐশ্বর্য, চাই প্রতিষ্ঠা সমাজে, যশ চাই। তাঁর চারিদিকে যত মানুষ, সবাইকে করতে হবে করতলগত, অনুগত। হাত পাতবে সবাই এসে তাঁর দরজায়, তিনি দেবেন তাঁদের হাত তুলে। এখনো অনেক আশা।

অনুভা এসে ডাকলেন তাঁকে, তিনি সচকিত হয়ে বললেন, চলো এবার।

সকলের পিছনে পিছনে তিনি গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসলেন। ছুটল গাড়ী। একটা কথা তাঁকে মনে রাখতেই হবে, যে-ক্ষুধা তাঁকে চিরকাল উদ্বিগ্ন করে রেখেছে, যা তাঁকে স্থির থাকতে দেয়নি কোনো-দিন, ঐশ্বর্য ও সম্ভোগের সেই ভয়ঙ্কর ক্ষুধাকে রাবণের চিতার মতো জাগিয়ে রাখতে হবে আমরণ। সেই অভাববোধের নিবৃত্তি নেই। এই সত্য তাঁর। এর কাছে বলি দিতে হয়েছে হৃদয়াবেগ, মমত্ববোধ, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য, বিসর্জন দিতে হয়েছে মানবত্বের সকল মহিমা।

গৃহপ্রবেশের একটা আয়োজন চলছে। সাতদিন আগে থাকতে বাড়ীর জিনিষপত্র নতুন বাড়ীতে চালান দেওয়া হচ্ছিল। আরো কিছু [illegible]বের দরকার। যথাসময়ে অর্ডার পাঠানো হয়েছে ল্যাজারসের ওখানে। বাড়ীর দুটো দরোয়ানের জন্য দুটো বন্দুকের লাইসেন্স নেবার দরখাস্ত করা হয়েছে পুলিশকোর্টে। এন্‌কোয়ারী হয়ে গেছে।

ওই যা, তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, কাজের ভিড়ে আমারো মনে নেই, কাল একটা ভারী মজা হয়েছিল পথে।

কি গা ?—মুখ ফিরিয়ে বললেন অনুভা।

গাড়ী করে' আসছিলুম বেলেঘাটার ওখান দিয়ে, চৌরাস্তার কাছাকাছি যখন এসেছি···দশহারায় গঙ্গাস্নানের যাত্রীরা চলেছে, খুব ভিড়—এই যে সরকার মশাই, টাকা নিতে এসেছেন ত ? দিই দাঁড়ান। —জয়ন্তবাবু উঠে যাবার সময় বললেন, হ্যাঁ বলছি তারপর, টাকাটা আগে দিয়ে দিই ওঁকে।

টাকা দিতে গিয়ে তিনি মনোনিবেশ করলেন কার্যান্তরে। মজার ঘটনাটা বলবার আর সময় পাওয়া গেল না। অনুভা ছোটমামীর সঙ্গে আলাপ করতে গেলেন ওবাড়ীর মানদার বিবাহের সম্পর্কে। রাত্রে আবার স্বামী-স্ত্রী নানা কথা কইতে বসলেন, কিন্তু বেলেঘাটার চৌরাস্তার কথাটা আর উঠলই না।

আবার একদিন কথায়-কথায় পড়ল মনে। জয়ন্তবাবু বললেন, আচ্ছা বৌ, ইতিমধ্যে একদিন দেখা হয়েছিল একজনের সঙ্গে, বলেছি তোমায় ? ওই যা সেদিন যে যাবার কথা ছিল তার কাছে !—বাইরের দিকে তিনি তাকালেন। বললেন, মনে নেই।

অনুভা তৈরী করছিলেন কবিরাজী ঔষধ। বললেন, কাকে আবার দেখলে বাপু, জানিনেকো !

ঔষধের দিকে তাকিয়ে জয়ন্তবাবু বললেন, পানের রস আর মধু, এই অনুপান ত ?—হ্যাঁ, দেখলুম সেই স্ত্রীলোকটিকে, সেই যে সেই—

কে ? আহা, নামটা বলো না ছাই।

নাম শুনলে কি মনে পড়বে ? আমি ভুলে গিয়েছিলুম···নাম বিরজা। ছোটবেলায় ছিলুম এক বাড়ীতে।

অনুভা বললেন, সেই সেবার ভাব হয়েছিল মধুপুরে, তার কথা বলছ ? মনে পড়ে একটু একটু।

ও, তুমি তবে দেখেছ তাকে। বছর পনের আগে, নয় ?

এই ষোলয় পড়েছে। তারপর, কি বললে ?

বললে আর কি, বিশেষ ক'রে যেতে বলে দিলে একদিন। সে অবস্থা আর নেই। ওই ত কাল এসেছিল তার বড় ছেলেটা আমার এখানে। আজ আমার যাবার কথা ছিল। তোমাকেও যেতে বলেছে।

আমাকে ? অনুভা বললেন, আমার কি আর উড়ে-উড়ে বেড়াবার শরীর ? আমি যাব না।

আমারো এখন যাওয়া সম্ভব নয়।—বলে' জয়ন্তবাবু সদর মহলে বেরিয়ে গেলেন।* বাড়ী বদল করবার সময় এখন, তাঁর ফুরসৎ কোথায় ?

কিছুদিন কাটল। গৃহপ্রবেশের উৎসবটা শেষ হয়েছে। এসেছে সৌভাগ্যের জোয়ার, আবার যেন পরামর্শ চলছে কোথায় জমি কেনবার। সরকার মশাই আনাগোনায় লেগেছেন। এমন দিনে জয়ন্তবাবুর মনে পড়ল সেই বিরজাকে। মনে পড়বার কারণ ছিল, তাঁর দপ্তরে বিল-এর ফাইল্ ওলটাতে গিয়ে বেরুলো একটা ঠিকানা; কার ঠিকানা, অনেক চিন্তার পর মনে পড়ল জয়ন্তবাবুর। সেদিন মনস্থ করলেন তিনি, আজ না হয় একবার যাওয়াই যাক্, বলেছিল অত ক'রে তার ছেলে। আজ

তিনি ওটা শেষ করবেন। ওই পথ দিয়ে তিনি অমনি চলে' যাবেন রাজাবাগানের ইটখোলায়।

ঠিকানাটা হাতে নিয়ে যথাসময়ে তিনি গাড়ীতে উঠে বসলেন। গরমের দিন, এত ঘোরাঘুরি করা তাঁর অভ্যাস নয়। যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে যাবার সম্বন্ধে এমন কিছু কৌতূহলও নেই তাঁর। আর কৌতূহল কি থাকে মানুষের চিরদিন?

ওহে কেশব, ফেরবার পথে শিয়ালদার হাটে একবার গাড়ী থামিয়ো। কতকগুলো কাঁচের বাসন দেখতে হবে।

ড্রাইভার বললে, আচ্ছা।

যথাসময়ে গাড়ী এসে পৌঁছল। নামলেন তিনি দরজায়। দরজা সেটা নয়, একটা সঙ্কীর্ণ পথ। সবারই যাতায়াত চলতে পারে সেখান দিয়ে। এমন জায়গায় কি তাঁর মতো লোকের আসবার কথা? একটু থমকে দাঁড়ালেন জয়ন্তবাবু, বললেন, এইটেই ত ঠিক নম্বর, কেশব?

আজ্ঞে হ্যাঁ, এইটেই, নম্বর রয়েছে যে ওপিঠে। বাড়ীর কর্তার নামটা বলুন না, ডাকি।

কর্তার নাম? মনে পড়ে না বাপু, চিনি তাঁর স্ত্রীকে। বুঝলে না হে, পনেরো আর দশ, পঁচিশ বছর হোলো? উচ্চকণ্ঠে তিনি ডাকলেন।

একটি ছোট মেয়ে বেরিয়ে এল। বললে, কে গা?—কিন্তু সুমুখে হোমরা চোমরা লোকজন দেখে পালালো সে তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে। জয়ন্তবাবু আর এক পদ অগ্রসর হলেন

এই যে, কেশব, দেখা পেয়েছি এদের। আচ্ছা এবার তুমি বসোগে গাড়ীতে, আমার বেশি দেরি, হবে না। তারপর, কী খবর?—বলতে বলতে জয়ন্তবাবু ভিতরের একটি মাটির উঠানে প্রবেশ করলেন।

একখানা চওড়া রাঙাপেড়ে সাড়ী আর টক্‌টকে সিঁদুর মাথায়,

এই পরিচয়টা নিয়ে বিরজা দাঁড়ালে জয়ন্তবাবুর সুমুখে। সবিনয়ে বললে এতদিন দেরি করে' আসা হোলো ?

তিন চারটি ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল মাকে। মা বললে, সবাই প্রণাম কর মামাকে।—

এমন সময় একটি তরুণ কিশোর এসে দাঁড়াল হেসে। সেও প্রণাম করলে পায়ে। জয়ন্তবাবু কেবল বললেন, তুমি সেই গিয়েছিলে, আর ত গেলে না হে ?

উত্তর দিল বিরজা। বললে, যাবে কেন ? মামার যদি স্নেহ না থাকে, ভাগ্নের কি সম্মানবোধ নেই ?

মুখ তুলে তাকালেন জয়ন্তবাবু। হ্যাঁ, এই সেই বিরজা,—সমস্ত আগুনটা জ্বলে' শেষ হয়ে গেছে, একখানা আংরামাত্র জ্বলছে এখনো। এই জ্বলাটুকুও ফুরিয়ে যাবে হয়ত একদিন। মনে পড়ে না ভাল, শেষ দেখা হয়েছিল এর সঙ্গে কবে। বহুকাল পূর্বে,—যৌবনে, কোথায় যেন একটা সমারোহ ছিল এই [illegible] কেন্দ্র ক'রে।

একখানা পুরানো মাদুর পেতে বসানো হোলো তাঁকে। একটু দূরে মেঝের উপর বসলে বিরজা। জয়ন্তবাবু চেয়ে চেয়ে দেখলেন একবার চারিদিকে। যতদূর পর্যন্ত স্মরণ করা যায়, এদের অবস্থা ত' এমন ছিল না। এ যে দারিদ্র্য! এ কথাটা তিনি ভোলেননি, এদের স্বচ্ছল অবস্থা দেখেই একদিন অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি ঐশ্বর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করবার। অর্থের প্রতি প্রথম মোহ এসেছিল এই [illegible] সংসর্গে এসে।

কথা কইল. বিরজা এবার। বললে, গণেন ফিরে এসে জানালে, তুমি নাকি এখন খুব বড়লোক।

তুমি! তুমি ব'লে কোনো বাইরের লোক ডাকে না তাঁকে আজ। এমন স্পর্ধা নেই কারো! যারা সমসাময়িক, সমবয়স্ক, ঠাট্টা-তামাসা

চলত যাদের সঙ্গে, তারা পর্যন্ত আজ সম্ভ্রম ক'রে চলে, হুকুম মানে, নমস্কার জানায়। এই স্ত্রীলোকটি জানে তাঁর পূর্ব পরিচয়, এর ঘনিষ্ঠতাকে এড়ানো দরকার, একে প্রশ্রয় দিলে তাঁর আত্মাভিমান যাবে খাটো হয়ে, খেলো হয়ে। মুখ তুলে বললেন, আমার চেয়েও ত বড় লোক রয়েছে দেশে।

বৌ কোথায়, কেমন আছেন ?

শরীর তেমন ভাল নয় তাঁর।

কথা থামলেই যেন একটি বুকচাপা নীরবতা। তখন জয়ন্তর মনে হয়, দিনান্তকালের ভাঙা হাটে এ যেন পসরা নিয়ে ছুটে আসা, এত বড় নিরর্থক কাজ কিছু নেই আর।

বিরজা বললে, এটা আমার ননদের বাড়ী, তাঁর অবস্থা তেমন ভাল নয় ত! তবু থাকতে হয়।

কেন থাকতে হয় তা জানবার প্রয়োজন নেই জয়ন্তর। সে কেবল বললে, ছেলেপুলে ক'টি এখন ?

আমার ? মিনিকে বোধ হয় তুমি দেখেছিলে,—তার কোলে গণেন, আরো তিন চারটি তারপর। যা কিছু ছিল সব গেছে মিনির বিয়েতে, আমি এখন দেউলে। ম্লান হাসি হাসলে বিরজা।

কে শুনতে চাইছে আর্থিক অনটনের ইতিহাস ? জয়ন্ত বিরক্তি বোধ করলে একটু। সংসারে নিত্য ঘটে এমন ঘটনা, এর অগণ্য উদাহরণ! অত কথা শোনবার মতো সহানুভূতিশীল মন কোথায় তার ? শুকিয়ে গেছে সব।

নিতান্ত কিছু খবর নিতে হয়, তাই জয়ন্ত এক সময় জিজ্ঞাসা করলে, ইনি কোথায় ?

ইনি মানে তোমার ক্ষিতীশবাবু ? আছেন অমনি একরকম, বোধ হয় ভালই আছেন। চাকরি গিয়েই ত এত বিপদ। ভাল চাকরি

করতেন, তারপর বেশি মাইনে পেয়ে গেলেন ব্যাঙ্কে, ব্যাঙ্ক গেল ফেল্ হয়ে। চারশো টাকা মাইনের চাকরি।

মুখখানা জ্বলে' উঠে আবার ছাই হয়ে গেল বিরজার। সে বলতে লাগল, সম্পদের দিনে মনে থাকে না দুঃখের দিন আসতে পারে। যা কিছু জমা ছিল গেল এই পাঁচ বছরে। মেয়ে বড় হোলো গলায়-গলায়, যথাসর্বস্ব গেল তাকে পার করতে।

জয়ন্ত বললে, ব্যাঙ্কটা ফেল্ হয়ে গেল ?

গেল কয়েকজনের কারসাজিতে, যাদের টাকার ভাগ ছিল। তারা বেশ গুছিয়ে নিলে। কিন্তু জমা ছিল যাদের তারা হোলো সর্বস্বান্ত। মানুষকে মানুষ কতই ঠকালে।

উত্তর দিলে না জয়ন্ত। কে না জানে মানুষ মানুষকে ঠকায়! কিন্তু কথা বলবার জন্য আসেনি জয়ন্ত, আসেনি দুঃখ-দুর্ভাগ্যের ফিরিস্তি শুনতে। এসেছে সে অনুরোধে, দেখা দিতে এসেছে মাত্র। সকলের চেয়ে ভাল ছিল, এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দেখা না হওয়া। আজ জয়ন্ত মনে করতে চায় না তার বাল্যকালকে, মনে করতে গেলে সন্ত্রস্ত হয়, লজ্জিত হয়। এই জীবনেই জন্মেছে যে বহুবার, যৌবন শেষ হয়ে যাবার পর আবার সে জন্মগ্রহণ করেছে। ছিল সে পরিত্যক্ত, ছিল উপেক্ষিত, নিরর্থক জীবন যাপন করেছে সে নিঃসঙ্গ হয়ে। নতুন করে আবার জন্মেছে সে নতুন কালে। নিজ জীবনের জন্মদান করেছে সে আজ, নিষ্ঠুর হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে আপন ঔদ্ধত্যে। শুনবে না সে দারিদ্র্য, কান দেবে না কান্নার দিকে। কে প্রবঞ্চনা করেছে কা'কে, কে হয়েছে প্রতারিত, কে মাথা হেঁট করেছে চিরদিনের মতো—কে জানতে চায় এসব ?

চুপ করে রইল সে। বেশিক্ষণ বসবার তার সময় নেই। যেতে হবে তাকে ইটখোলায়, লোহা-লক্কড়ের অর্ডার দিতে যাবে সে বড়বাজারে। শিয়ালদা হাটের কথা সে ভোলেনি।

বিরজা বললে, এমন বদলে গেছ যে তোমাকে আর চেনাই যায় না ভাই।

ভদ্রতার হাসি হাসলে জয়ন্ত। বললে, চেনা কি তোমাকেই যায়? তুমিও ত বুড়ো হয়ে গেছ। গায়ের চামড়া ঢিলে হয়ে গেছে।

আপন দেহ সম্বন্ধে উদার ঔদাসীন্য প্রকাশ ক'রে ম্লান হেসে বিরজা বললে, তা ত গেছেই। যায় সবই একদিন।

তবু জলযোগ জয়ন্তকে করতেই হোলো। দুটি মাত্র মিষ্টি ও এক গেলাস জল। গলা দিয়ে নামতে চাইল না, জিহ্বা অস্বীকার করল, নড়ল না দাঁত—কণ্ঠও রোধ হয়ে এল। এক সময় সে দাঁড়ালো উঠে। বললে, আচ্ছা আবার কখনো দেখা হবে।

বাধা দিলে না বিরজা। বেঁধে রাখার মতো সম্বল আজ তার কোথায়? কেবল মুখ ফুটে বলতে পারলে, এমনি করেই দিন যাচ্ছে জয়ন্ত। ছেলেপুলেরা খেতে পায় না, ওদের স্বাস্থ্যও নেই, ভবিষ্যতও নেই ভাই। আচ্ছা, গণেনের একটা চাকরি কোথাও জোটে না? পড়াশুনো ছাড়িয়ে ওকে যে বসিয়ে রাখতে হয়েছে!

যা ভয় করেছিল জয়ন্ত তাই। এর নামই ত সাহায্য চাওয়া! সাহায্য সে করবে না, পরের দুঃখ মোচন করবার জন্য সে দাঁড়িয়ে ওঠেনি, তার স্বোপার্জিত ঐশ্বর্যের মধ্যে এই সব অনাথ-আতুরদের তিল মাত্র স্থান দিতে সে রাজি নয়। না, না, সে এমনিই। এমনিই নিষ্ঠুর সে।

বললে, "যে বাজার পড়েছে, চাকরি-বাকরি পাওয়াও কঠিন। ক্ষিতীশবাবু কি করছেন এখন?

ব'লো না তাঁর কথা। বুড়ো হয়ে মতিচ্ছন্ন ধরেছে। মাসের মধ্যে এক আধদিন বাড়ী আসেন। ঘুরে বেড়ানো হয় পথে পথে। —তারপর নিশ্বাস ফেললে বিরজা, পুনরায় বললে, চারশো টাকা মাইনের চাকরি ছিল একদিন।

হ্যাঁ, এই চারশো টাকাই জীবনে সকলের চেয়ে বড়। টাকার মধ্যে নিহিত যৌবন, টাকার মধ্যে মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব। টাকা মানে প্রেম। কে গ্রাহ্য করত জয়ন্তকে দশ বছর আগে, কে নিত খোঁজ? তার যত কলঙ্ক, যত লজ্জা, যত অপযশ—সবার বেসুরো কণ্ঠ একদা ডুবে যাবে রূপোর শব্দ ঝঙ্কারে।

চোখে জল এল বিরজার। আঁচলে অশ্রু মুছে বললে, এমন সর্বনাশ যারা আমার করেছে জয়ন্ত, আজ তারা বসে রয়েছে সকলের মাথার ওপরে, শুনতে পাই তারা দেশের মান্যগণ্য লোক।

কিন্তু কে দায়ী তার জন্য?—জয়ন্ত বললে।

তার গলার আওয়াজ শুনে আর কথা এল না বিরজার মুখে, মুখ নামিয়ে নিলে। এবং তাকে সান্ত্বনার কোন কথা না ব'লে, কোনো আশ্বাসবাণী না দিয়ে, সৌজন্য ও ভদ্রতার কোনো চিহ্ন না রেখে জয়ন্ত কেবল বললে, যাকগে বাজে কথা। আচ্ছা, আসি আজ।—বলে' সে মুখ ফিরিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

মুখখানা কঠিন হয়ে উঠেছিল তার, কাছাকাছি কেউ থাকলে তার এই দয়াহীন সহানুভূতিহীন মুখের চেহারা দেখে হয়ত ভয় পেয়ে যেত। কেন—কেন তা সে জানে না, কেউ জিজ্ঞাসা করলেও সে বলতে পারত না। কেন এসেছিল সে, কেন তাকে ডাকা হয়েছিল? দারিদ্র্যের চেহারা সে আর সহ্য করবে না। যৌবনকালের হৃদয় তার ম'রে গেছে। গেছে শুকিয়ে। তার জন্মান্তর ঘটেছে।

সে যেন পালিয়ে এসে নিজের মোটরে উঠল। বললে, চল।

গলার ভিতরে মিষ্টান্নের স্বাদটা তখনো তার কিট্‌কিট্ করছিল। প্রতিবাদ করছে সমস্ত শরীর, হয়ত এখুনি বমি হবে। বিরজার সমস্ত দারিদ্র্যটা যেন তার কণ্ঠের ভিতর চেপে বসেছে, গা ঘিন্ ঘিন্ করছে। কেন এমন হবে? একজনের দৈন্য আর একজনকে কুণ্ঠিত করে কেন?

তার কল্যাণ কামনা করেছিল কে? সে ছাড়া জানত কে তার জীবন সংগ্রামের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস? এরা সেদিন কোথায় ছিল। অপমান দারিদ্র্য, লজ্জা একাই ছিল তার।

কানে এখনো বাজছে বিরজার কথা। তীরের মতো, অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতো। তার স্বামী প্রতারিত হয়েছে কর্মক্ষেত্রে, সে বঞ্চিত হয়েছে সংসারে, অনটন আর অনাহার—এতে জয়ন্ত চৌধুরীর কি আসে যায়? তাকে দুরবস্থার কাহিনী শোনানোর মধ্যে কি একটি চাপা সূক্ষ্ম বিদ্বেষ নেই? আজ সবাই তাকে ঈর্ষা করে।

মোটর ছুটছে। এই মোটরে চড়ার আরামটুকু তার, তার স্বোপার্জিত। জীবনের পেয়ালায় মধুসঞ্চয় করেছে সে বিন্দু বিন্দু, একান্ত একাকী সে নিঃশেষে পান ক'রে নেবে। নাড়ীর বন্ধন নেই কারো সঙ্গে, আত্মীয়তার সম্পর্ক সে অস্বীকার করেছে; মোহ নেই, নেই আসক্তি—পৃথিবীতে সকলের সঙ্গেই তার পাতানো পরিচয়, পথের আলাপ, এক মুহূর্তে কাছে টেনে পর মুহূর্তে সে দূর করে দিতে পারে।

আশ্চর্য হয়ে যায় সে এই স্ত্রীলোকটির সহিত নিজের সম্পর্কের কথা স্মরণ করে'। হাসি পায়, একদিন সে নাকি একে ভালোবেসেছিল। জীবনের প্রথমার্ধটা যে তার নির্বুদ্ধিতার কাহিনীতে ভরা এতে আর সংশয় নেই। সে কি কোনোদিন কাউকে ভালবেসেছে? তার স্ত্রী, যে আজ বসে রয়েছে স্বামীর ঐশ্বর্য আর প্রতিষ্ঠার উচ্চ আসনে, দম্ভ ও আত্মপরতায় সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করাই যার রীতি ও চরিত্র—তার সম্বন্ধেই কি তার কোনো আন্তরিক মমত্ববোধ আছে? শুধু প্রয়োজন, শুধু শুষ্ক কর্তব্য, এ ছাড়া আর কিছু নেই। গাড়ী ছুটে চলেছে, তার সঙ্গে ছুটেছে তার মন। সে যেন পালাতে পারলেই বাঁচে।

জানে সে—জানে এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক। মানুষ কাঙাল, মানুষ অসহায়। উদার হৃদয়াবেগ ও অসীম সহানুভূতিতে তাদের বিচার

করা প্রয়োজন, কিন্তু এ পৃথিবীতে সেও যে কিছু পায়নি। পিতৃমাতৃহীন সে আবাল্য, পরের অনুকম্পার ছিটায় সে মানুষ, দীর্ঘকাল সে চলে' এসেছে ছায়ালেশহীন মরুময় সংগ্রামের পথে, বিবাহিত জীবন তার সুখকর নয়—কলহ ও সংশয়ে চিরদিন কণ্টকাকীর্ণ; আজ পুরাতন হৃদয়াবেগ সে কোথায় খুঁজে পাবে?

কোন্ পথ দিয়ে কোন্ পথে গাড়ী ছুটেছে তার আর খেয়াল নেই। পথ, ঘাট, জনতা—সবগুলো যেন কুণ্ডলাকার, ঝাপ্‌সা সব যেন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য। আড়ষ্ট হয়ে সে বসে রইল। কেন এমন হয়! কেন মনে হচ্ছে নিজের বুকের উপর দিয়েই তার নিজের এই বিলাস-বাহন আপন কঠিন চক্রের দাগ রেখে রেখে ছুটে চলেছে বিদ্যুৎ গতিতে! এই যে মনোবিকার—এর কথাও সে জানে। যখনই নব নব পথ আবিষ্কৃত হয়েছে তার সম্মুখে, তখনই একটা অজ্ঞাত অপরিচিত রহস্যময় ছায়ামূর্তি তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে সচেতন করেছে তাকে। সে সচকিত হয়েছে, সতর্ক হয়েছে, নিজেকে লুণ্ঠনকারী বলে' একটা অদ্ভুত ধারণা তার জন্মেছে। কিন্তু মানুষের কেন এমন হয়? কেন সুখসৌভাগ্যের দিনে অস্বস্তির কাঁটা খিচ্‌ খিচ্‌ করে মনে?

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মোটর থামতেই সে সজাগ হয়ে বসল। কেশব বললে, নামবেন ত শিয়ালদার বাজারে?

এসেছে নাকি? ওঃ, এইত বাজার। না, আজ থাক্ হে কেশব, তুমি সোজা চলো ইটখোলায়।

কেশব আবার গাড়ী ছেড়ে দিল।

সার্কুলার-রোড দিয়ে মোটর ছুটল। একটা কথা জয়ন্ত ভোলেনি, বিরজার কাছ থেকে তাড়াতাড়ি সে উঠে এসেচে। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি প্রত্যাখান করলে সে। সে যেন জানিয়ে দিয়ে এল, কেমন অকারণে মানুষের সঙ্গে সে দুর্ব্যবহার করতে পারে! মানুষকে আঘাত করে' সে

একটা অহেতুক আনন্দ পায়, অম্লান বদনে সে নির্যাতন করতে পারে, হাসিমুখে পারে সে দুঃখ দিতে। কিন্তু আর একটু তার কাছে বসে' থাকলে কি ভালো হোতো না? কেনই বা এমন নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য প্রকাশ করে' এল? কেন এল দারিদ্র্যকে অপমান করে'? তবে কি মানুষের চরিত্র তার নিজের কাছেও দুর্জ্ঞেয়?

অনন্ত সংশয় আর অনন্ত জিজ্ঞাসা—এই নিয়ে জীবন। নৈলে বিরজাই বা অমন ক'রে তাকে প্রশ্ন করল কেন। কে তাকে ঠকিয়েছে? একজনের দুর্ভাগ্যের জন্য আর একজনের সৌভাগ্য দায়ী, এই কি তার প্রশ্নের নিগূঢ় তাৎপর্য? তবে কি সমগ্র দরিদ্র্য মানব সমাজকে পদদলিত ক'রে জয়ন্ত চৌধুরীর ঐশ্বর্যের দম্ভদৃপ্ত রথ উন্মাদের মতো ছুটেছে? একজনের ভাগ্য আর একজনের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে—অর্থনীতির কি এই চরম নীতি?

কতক্ষণ পরে আবার মোটর থাম্‌ল। আবার সজাগ হোলো জয়ন্ত। পথের পাশে ইটের কল্‌ দেখে বিতৃষ্ণায় তার মন ভ'রে উঠল। মনে হোলো, একটা হীন প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে সারাজীবন ধ'রে সে ইটের পরে ইট সাজিয়ে চলেছে, প্রকাণ্ড ইমারতের মধ্যে সে দিনের পরে দিন ধরে মৃত্যুকেই আমন্ত্রণ করেছে। সম্পত্তির এই মোহ তার জীবনের সকল ধর্মকে বিষাক্ত ক'রে দিচ্ছে।

উত্যক্ত হয়ে বললে, নামব না এখানেও, বরং চলো তুমি, বড়বাজারে,—কিম্বা আজ থাক্‌ সব, বুঝলে কেশব, একটু মাঠের দিকে গাড়ী নিয়ে চলো খোলা হাওয়ায়।

নিজের ভাবান্তর প্রকাশ পাওয়াতে নিজেই সে লজ্জিত হোলো কেশবের কাছে। কিন্তু কেশব আর কিছুই বললে না, নীরবে গাড়ী ছুটিয়ে দিল। তখন সন্ধ্যার আলো জ্বলে' উঠেছে রাজপথের দুইধারে।

শয্যায় শুয়েছিল জয়ন্ত নিমীলিত চক্ষে। মাথার দিকে পথের জান্‌লাটা খোলা। দরজার কাছে পায়ের শব্দ হতেই সে চোখ খুলে তাকাল। ঘরখানা দুলছে, কড়িকাঠের ফাটল্ দিয়ে একটা দুরন্ত রক্তের প্রবাহ তার দৃষ্টির উপর দিয়ে নেমে চারিদিক প্লাবিত ক'রে দিচ্ছে। অন্ধকার, এক বিরাট পৈশাচিক অন্ধকার, দানবের মতো ভয়ঙ্কর। একটা বৃহৎ কৃষ্ণকায় পাখী প্রকাণ্ড দুই ডানা বিস্তার ক'রে জয়ন্তর বুকের উপর চেপে বসছে। চোখ তার বন্ধ হয়ে গেল।

পায়ের শব্দ কাছে এসে থাম্‌ল। ক্ষীণকণ্ঠে জয়ন্ত বলতে পারল, কে, বৌ?

তিনি নন্, আমি। তাঁর শরীর খারাপ। এখন কেমন লাগছে আপনার?

ও, সরকার মশাই। আপনি রাজমিস্ত্রির টাকাটা—

ভুল করছেন, আমি সীতেশ ডাক্তার। আজকে আপনি একটু ভালোই আছেন, ওষুধটা বদলে দিয়ে যাব।

জয়ন্ত চোখ চেয়ে তাকাল। সীতেশ বললে, আমি ভেবেছিলুম এতদিন পরে আর আপনার ব্লাড প্রেসার বাড়বে না, এমন ত হবার কথা নয়! কেন হোলো?

জয়ন্ত হাসলেন। এই ছোক্‌রা সুন্দরকান্তি ডাক্তারটির সব কথা তাঁর কানে যায় না, একে অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখতেই তাঁর ভালো লাগে। নূতন জীবন, নূতন রূপ, নূতন মন। এর অতীত নির্মল ভবিষ্যৎ অপূর্ব সম্ভাবনায় অত্যুজ্জ্বল। এর মতো অম্লান জীবন একদিন তাঁরো ছিল!

সীতেশ পুনরায় বললে, বরফটা থামালেন কেন?

বড় মাথায় লাগে যে হে।—মৃদুকণ্ঠে বললে জয়ন্ত।

একটু লাগবে বৈ কি, তাব'লে বন্ধ করা ত চলবে না—এই ব'লে

সীতেশ বসে' গেল প্রেস্‌ক্রপসন্‌ লিখতে। ফলের রস খাবার ব্যবস্থা হোলো। নানা উপদেশ দিয়ে বিদায় নিলে সে একসময়। কিয়ৎক্ষণ পরে ছোক্‌রা চাকরটা বরফের ব্যাগ নিয়ে এসে জয়ন্তর মাথায় ধ'রে বসল।

গত দুই দিনের ইতিহাস জয়ন্তর আর মনে নেই। তিনি নাকি বিছানা থেকে পড়ে' গিয়েছিলেন, হাতটা এখনো আড়ষ্ট। যে জীবনকে নিয়ে এত ভয় ও ভাবনা, এত আশা ও আকাঙ্খা, আয়োজন ও সমারোহ, সে জীবন এতই ভঙ্গুর, এতই ক্ষণস্থায়ী। একটি মুহূর্তেই ছেড়ে চ'লে যেতে হয় সব, বেঁধে রাখবার কোনো উপায় নেই।

তোর মা কোথায় রে হরিপদ?

হরিপদ বললে, তিনি রান্নাঘরে।

ও।—ব'লে জয়ন্ত আবার চুপ ক'রে গেল। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় সে বললে, একবার ওঠ্‌ত দেখি, জান্‌লাগুলো সব খুলে দে।

হরিপদ ব্যাগ রেখে উঠে জান্‌লাগুলো সব খুলে দিয়ে এল। একরাশ বাইরের আলো আর হাওয়া এসে ভিতরে ঢুকল। শুয়ে শুয়ে বিছানা থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। মধ্যাহ্নের রৌদ্রকিরণে আকাশ কোমল নীল, কোথাও কোথাও লঘুপক্ষ মেঘের দল বাতাসে ভেসে চলেছে। তাদেরই নিচে নারিকেল ও সুপারিগাছের জঙ্গল দিগন্তরেখায় গিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। শুধু চেয়ে থাকা, শুধু মনে মনে ভাবা। কোনো কোনো পরম মুহূর্তে অননুভূত সৌন্দর্যোপলব্ধিতে তার আত্মার মূল পর্যন্ত রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে। তখন মনে হয়, এমন ক'রে বুঝি আর কোনোদিন দেখা হয়নি। একটা কথা কিছুকাল ধরে তাকে বিভ্রান্ত করেছে! সে একা, নিতান্তই সে একা। যে সংসার, যে ঐশ্বর্য ও সামাজ সে সৃষ্টি করেছে, সেখান থেকে নিঃশেষে বিচ্ছিন্ন, তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তার শেষ পাওনা তাকে দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু কী সে? কী পাওয়া গেল এতকাল ধ'রে?

প্রাণঢালা পরিশ্রম দিয়ে যা রচনা করা গেছে সে যে নিজেরই আবরণ, নিজেরই বাধা। তার কর্মজীবন প্রায় শেষ হতে চলল, কিন্তু সেই কর্মের যে ফলাফল তারই বস্তুপুঞ্জের চাপে, তারই অচল জড়ত্বের মোহে প্রাণ হোলো কণ্ঠাগত। রেশমের সূতো বুনতে গিয়ে মৃত্যুর ফাঁস সৃষ্টি হয়েছে।

গলার আওয়াজে তিনি সজাগ হলেন। ফিস ফিস ক'রে কে যেন কথা কইছে দরজার কাছে।

কে রে হরিপদ ?

হরিপদ বললে, অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন ব'লে—একটি ছোক্‌রাবাবু—কিন্তু আপনার শরীর ত এখন—

নাম কি তার ? কোত্থেকে এসেছে ?

হরিপদ দরজার দিকে চেয়ে কা'কে যেন কী জিজ্ঞাসা করতে গেল, কিন্তু ছোক্‌রাবাবুটি এবার সটান ঘরে ঢুকে বললে, মামাবাবু, আমি গণেন।

ও, এসেছ ? বসো ওই চেয়ারটা টেনে। খবর সব ভাল ?

হ্যাঁ, ভালো। আপনার এমন অসুখ হোলো কবে থেকে ?

জয়ন্তবাবু বললেন, এটা ছিলই। কখনো বাড়ে, কখনো থাকে চুপ করে। যাক্‌, তোমার কাজকর্মের কোনো উপায় হয়নি, কেমন ? বাজার আজকাল বড়,—হ্যাঁ, তোমার মা কিছু ব'লে দিয়েছেন নাকি ?

গণেন একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বললে, কিছুই ব'লে দেননি। আমি যে আপনার কাছে এসেছি তাও জানেন না তিনি।

ব'লে আসোনি ?

বলতে গেলে তিনি আসতে দিতেন না মামাবাবু। আপনার বাড়ীতে আসা মা'র পছন্দ নয়।

ওরে যাক্, আর বরফ দিতে হবে না। তুই এখন যা হরিপদ।—বলতে বলতে জয়ন্ত সোজা বিছানায় উঠে বসল। হরিপদ আইস্ ব্যাগটা হাতে নিয়েই ঘর থেকে গেল বেরিয়ে।

জয়ন্ত ছুরির ফলার মতো হাসলে। হাসলে যেন আগুনের ফুল্কির মতো। হেসে বললে, সে কি হে গণেন, আমার বাড়ীতে আসবার জন্যে লোকে যে ব্যাকুল হয়।—আহত ও অপমানিত মুখখানা ফিরিয়ে সে পুনরায় বললে, তিনি পছন্দ করেন না তুমি এলে কেন?

চৌদ্দ পনেরো বছরের ছেলে, কিন্তু উত্তরটা দিলে ভাল। বললে, আমাকেই যখন সব দায়িত্ব নিতে হয় তখন অন্যের কথা শুনলে চলবে কেন? আমার একটা উপায় আপনাকে ক'রে দিতেই হবে মামাবাবু।

উপায়? আমি ত কাউকে সাহায্য করিনে গণেন, ওটা আমার আসেনা, পছন্দও নয়। তুমি পাস করেছ?

পরীক্ষা দিয়েছি এবার, আশা করছি স্কলারশিপ পাবো। কিন্তু পড়া আর হবে না মামাবাবু, রোজগার করতে হবে। কিন্তু আপনি সাহায্য করবেন না কেন? আপনার এত টাকা, আর আমরা গরীব। আমরা যদি খেতে না পাই, আপনি মুখে ভাত তুলবেন কেমন ক'রে?

জয়ন্ত হেসে বললে, একে বলে কালের হাওয়ায় মানুষ! তুমি যে রকম বক্তৃতা করলে গণেন, বাংলা দৈনিক কাগজের সহ-সম্পাদক হবার তুমি উপযুক্ত! মাথার মধ্যে কোনো—'ইজ্ম্' ঢোকেনি ত?

গণেন অপ্রতিভ হয়ে লজ্জায় চুপ ক'রে রইল।

তোমার বাবা কোথায়?

তাঁর একটু মাথার দোষ হয়েছে, হাঁসপাতালে আছেন।

ও। আচ্ছা, তোমার মা কিছু বলেছেন আমার কথা?

বলেননি কিছু, তবে সেদিন আপনি চ'লে আসার পর তিনি

অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন, আমাদের সেদিন আর রান্নাবান্না হয়নি।—এই বলেই গণেন হেসে উঠল।

হাসলে কেন হে?—জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে।

মা বড় সেন্টিমেন্টাল্, পরদিন সকাল বেলা উঠে আপনাকে তিনি গালাগাল দিতে লাগলেন; ছোট ছেলেকে যেমন তার মা ধম্‌কায়।—গণেনের মুখে হাসি থাম্‌ল না।

জয়ন্ত আস্তে আস্তে আবার বিছনায় শুয়ে পড়ল। চোথ বুজে বললে, উঠে বসতে গেলে মাথা টলটল করে। তুমি আর একদিন এসো গণেন, একটা ব্যবস্থা তোমার হয়েই যাবে।

গণেন খুসি হয়ে উঠে দাঁড়াল, এবং মামাবাবুর পায়ের ধূলো নিয়ে নিঃশব্দে হেসে গেল বেরিয়ে। চোথে ও মুথে তার দিগ্বিজয়ের আনন্দ।

দেয়ালের ফাটল দিয়ে দুরন্ত একটা রক্তের প্রবাহ নেমে এসে সকল দিক প্লাবিত ক'রে দিচ্ছে। একটা বৃহৎ কৃষ্ণকায় পাখী প্রকাণ্ড দুই ডানা বিস্তার ক'রে জয়ন্তর বুকের উপর চেপে বসবার চেষ্টা করছে।

চোথের পাতা ভয়ে কাঁপতে লাগল।

৬

জয়ন্তর পা টলছিল পথে চলতে, পায়ে হাঁটার অভ্যাস তার বহুদিন থেকে নেই। মাথাটা ঝুঁকে পড়ছে, ভিতরে অসুখটা এখনো প্রবল। পথে তার সঙ্গী নেই। ছিল কবে? স্ত্রী, সন্তান, বন্ধুসমাজ, কর্মজীবনের সহকর্মী—এরা সবাই তার জীবনের গতিকে অনুপ্রাণিত করেছে, এরা উপকরণ। সমস্তর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলে দেখা যায়, একটি অসীম চিত্তের ক্ষুধা নিয়ে মানুষ একা। জয়ন্ত একা।

একটা গ্যাসপোষ্ট হেলান্ দিয়ে সে দাঁড়াল, হাঁপাতে লাগল। পথের

লোকের এবার বিশ্বাস করতে আপত্তি ঘটবে না যে, সে মাতাল। মাতাল হতে পারলে সে খুসি হোতো। মদ সে খায়নি, পাছে সর্বস্বান্ত হয়! দু মিনিট দাঁড়িয়ে আবার সে চলতে লাগল। আজ সে মুক্তি নিয়েছে। পথের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া, সর্বসাধারণের সঙ্গে; ওই দিন-মজুর যারা রাস্তা কেটে কেটে মানুষের পায়ে চলার সুবিধা নিয়ে রক্তক্ষরণ করছে—ওদের ভিতরে আপন আত্মাকে উপলব্ধি করা, ছুটে পালিয়ে আসা মহানগরের লোকযাত্রার ধূলির তলায় জীবন-তৃষ্ণার অনন্ত ব্যাকুলতায়,—এই ভালো। আজ কেবল ভালোর দিকে তার মন ছুটছে। পিছনের অতীতটা তার বাধা, স্বরচিত বস্তুপুঞ্জ তার পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে। তবু বেশ লাগল জীবনটা। কিছু স্নেহ, কিছু ভালোবাসা, কিছু বাৎসল্য, নানা রসে আত্মবিকাশ। গড়ল সংসার, সৃষ্টি করলে সম্পদ, নানা পাখীর বাসা দিলে বেঁধে—তাদের ভিতর দিয়ে আপন পথ করলে পরম পরিণামের দিকে। এবার শেষের খেলা, অপরিচয়ের দিকে যাত্রা, অনির্বচনীয় কিছুর দিকে হাত বাড়াবার কাল, তার আগে মুক্তি পেতে হবে আপন সৃষ্টির বন্ধন থেকে। এই জয়ন্তর চরিত্র—নানা অসংলগ্নতার জটিলতা থেকে সুসমন্বয়ের দিকে তার গতি।

সঙ্কীর্ণ এক গলির পথে ঢুকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সে ডাকল, গণেন আছ?

উত্তর এল, কে?

না দেখলে চিনবে না, বেরিয়ে এসো।

যে বাইরে বেরিয়ে এল সে বিরজা। হঠাৎ সে স্তম্ভিত হয়ে বললে, একি, জয়ন্ত? এ কি অবস্থায় এসেছ?—ছুটে এসে বিরজা তার হাত ধরলে। বললে, অসুখ করেছে দেখছি, এমন চেহারা হোলো এর মধ্যে? এসো, ভেতরে এসো। ছেলেপুলেরা কেউ বাড়ী নেই।

ভেতরে যাব না বিরজা।

কেন আসবে না, আসতেই হবে তোমাকে। আজ তোমাকে জানিয়ে দেবো, দুঃখীর নিঃস্বার্থ সহানুভূতির যোগ্য তুমি। তোমার অহঙ্কারকে আমার চোখের জলে মুছে দেবো। এসো জয়ন্ত।

না বিরজা, যাব না।

আসবে না? তবে এই নাও আবার বুক পেতে দিচ্ছি, অপমান ক'রে যাও পথের কাঙালকে, তোমার লজ্জা দিয়ে আমার যেন মরণ হয়।—বলতে বলতে বিরজা জয়ন্তর হাত ধরে' ঝর ঝর ক'রে কাঁদতে লাগল।

জয়ন্ত তার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে এল পথের মোড়ে। বললে, এসো আমার সঙ্গে।

কোথায় যাব জয়ন্ত?

পথে পথে।

কি বলছ তুমি? ব'লে ভূতাবিষ্টের মতো বিরজা তার বহুপূর্ব অতীত জীবনের এই পরমাত্মীয় সঙ্গীটির সঙ্গে পরম নির্ভরতায় চলতে লাগল। ভাবল না সে ঘরের কথা, ভাবল না সে সকল দরজা খুলে রেখে আসার কথা।

জয়ন্ত রুদ্ধকণ্ঠে বললে, আমায় মুক্তি দাও বিরজা। নীরবে আমার অনুরোধ রক্ষা ক'রে আমার চলবার পথ ক'রে দাও।

কি বলতে চাও জয়ন্ত?

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন পথে ছেয়ে এসেছে। ধারে সবুজ প্রান্তরের কাছাকাছি এসে দু'জনে দাঁড়াল। চন্দ্রের আলো এইবার স্পষ্ট হয়ে উঠবে। নিকটবর্তী কলিকাতা শহরের দিকে চেয়ে জয়ন্ত ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, বলো প্রতিবাদ করবে না, বলো আমার অপমানের প্রতিশোধ নেবে না? বলো, বলো আগে প্রত্যাখ্যান করবে না আমার প্রার্থনা?

কি চাও তুমি? শেষের দিন ঘনিয়ে এসেছে, কী দিতে পারি তোমাকে?

কিছু দিয়ো না। চাইনে ভালোবাসা, সে অমৃত পেয়ে গেছি তোমাদের হাতে। চাইনে মন, চাইনে স্বর্গ।

তবে?

জয়ন্ত ব্যাকুল হয়ে বললে, কিছু দিতে চাই বিরজা, কিছু গ্রহণ ক'রে আমার ভার লাঘব ক'রে দাও। দয়া কচ্ছিনে, দান কচ্ছিনে, আমি চাইছি মুক্তি।—বলতে বলতে জয়ন্ত, চল্লিশ ডিঙিয়েছে যার বয়স, যে-জয়ন্ত চোধুরী বিপুল সম্পত্তির অধিকারী,—একটি দরিদ্রা দুঃখিনী স্ত্রীলোকের হাত ধ'রে বালকের মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বিরজা কেবল পরম স্নেহে ডান হাতে তাকে ধ'রে বললে, সব আমাদের গেছে জয়ন্ত, গেছে জীবনের বসন্তকাল, কিন্তু যায়নি সেই অল্পবয়সের মন। এসো আমার সঙ্গে। আজ তোমাকে ছাড়ব না, থাকবে চলো আমার কাছে।

জয়ন্ত রাজি হয়ে চলতে লাগল বিরজার হাত ধরে'।

নববোধন

১

কুলেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী নামটা অতি দীর্ঘ। এতই দীর্ঘ যে তাড়াতাড়ি বানান লিখতে গেলে অক্ষরের জটলায় পথ হারাতে হয়। মধ্যপদ লোপ ক'রে কুলেন চক্রবর্তী রাখা হোলো, কিন্তু তাতেও চক্রবর্তী জায়গা জুড়ে বসলেন অনেকখানি। শেষকালে নামটাকে একেবারে লোপ ক'রে দিয়ে বলা হোলো কুচক্রী। তিনটি অক্ষরের এমন সহজ ব্যবহার্য নাম যিনি রাখলেন তিনি মামাতো বোনের ছোট ননদ, নাম শর্বরী রায়। কুচক্রী শব্দটা বিপজ্জনক, ভদ্রসমাজের পক্ষে অসুবিধা। তবু অপরের কলঙ্ক-মাত্রই আনন্দদায়ক, সেই কারণে আত্মীয় আর বন্ধুমহলে কুলেন্দ্র ওই নামেই পরিচিত রয়ে গেল। শর্বরীও সহ্য করলো অনেক পরিহাস।

তারপর কালক্রমে যা ঘটলো সেটা সংক্ষেপে এই : শর্বরী কুমারী থেকে হোলো সধবা, সধবা থেকে বিধবা। অবশ্য বিধবা হবার পর ইতিহাসের পুনর্বৃত্তি আর ঘটেনি, অর্থাৎ শর্বরী বিধবাই রইলো। আর ওদিকে 'কুচক্রী' হাকিম হয়ে চ'লে গেল কোন্ খোট্টার মুলুকে। বিবাহ সে করেনি। কেন করেনি সে কথা থাক্।

সংক্ষেপে বললেও সংক্ষিপ্ত করা যায় না। কারণ ওই অপরূপ নামকরণের অজুহাতে যে-সম্পর্কটুকু দাঁড়িয়েছিল সেটুকু পারিবারিক কুচক্রকে অতিক্রম ক'রেও মধুর বন্ধুতায় চিত্তগ্রাহী এবং ওর মধ্যে যদি লুব্ধতা ও চাঞ্চল্য না থাকে তবে এই নবনামের সেতুর দুই পারে মানবতার মহৎ মহিমা কীর্তিত হবে। শর্বরী তাই বিশ্বাস করতো

এবং আশ্চর্য, এই বিংশ শতাব্দীর হতাশা, সন্দেহ, অশ্রদ্ধা আর নাস্তিক্যবাদের যুগে কুলেন্দ্রও এই বিশ্বাসকে সম্মান ক'রে চলতো। চিঠিপত্রের চলাচল ছিল নিয়মিত, আর সে সব চিঠি বড়ই নৈরাশ্যজনক; কারণ ব্যক্তিগত আলাপ অপেক্ষা নৈর্ব্যক্তিক আনন্দের মাত্রা ছিল বেশি, বাস্তব অপেক্ষা অতিপার্থিব এবং আধিভৌতিক অপেক্ষা আধিদৈবিক! চিঠির প্রথমে থাকে, 'প্রিয় কুচক্রী', শেষের দিকে থাকে, 'ইতি—কলিকাতা।' ওদিক থেকে আসে, 'প্রিয় শর্বরী, ইতি—প্রবাসী' অর্থাৎ নাম-সই না থাকায় উভয়ের আনন্দ এবং পরিচিত হাতের লেখার ভিতর দিয়ে উভয়কে নব নব রূপে আবিষ্কার। ছেলেমানুষী হোক, তবু নিত্য নতুন ভঙ্গীর খেলায় মনের নিদ্রালু অবস্থাটা সজাগ থাকে, এটা কম লাভের কথা নয়। সচকিত হবার আগ্রহেই শর্বরীর সজাগ মন ডাক-হরকরার পথের দিকে চেয়ে থাকে। ওই চিঠিগুলিতে কিছু পাওয়া যায় না, অশোভন ও অসম্ভব প্রাপ্তির এক বিন্দু আশাও সে করে না, কিন্তু পুরুষের লেখনী-স্খলনের সুদূর দুরাশায় প্রতিপত্রের প্রতি অক্ষরে ঘুরে ফিরে তার লোলুপ দৃষ্টি উজ্জ্বল উল্লাসে যেন একটা সর্বনাশের সন্ধান ক'রে বেড়ায়। খুঁজে না পেয়ে এক সময় অবসন্ন হ'য়ে বলে, হে বিজয়ী বীর!

সম্প্রতি অরণ্যকাণ্ডের আলাপ চলছিল চিঠিপত্রে! বাঘের পিঠে কেন হোলো চাকা, কেন ডোরাকাটা; সজারুর পিঠে কাঁটা কেন, বন্য খরগোসের গায়ে কেন ধূসর লোম, আর অরণ্যের শিকড়ে পাতায় লতায় জটায় আলোয় অন্ধকারে কেন এমন ধ্যানরহস্য—কুলেন্দ্র এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। শর্বরী সন্দেহক্রমে লিখলো, তুমি কি আজকাল বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াও? কুলেন্দ্র জানালো, হ্যাঁ, হাকিমী অবস্থাটা গৌণ, মুখ্য হোলো অরণ্য। জন্তুর পিছনে বন্দুক নিয়ে ছোটায় বুকের রক্ত উত্তাল তরঙ্গে মাতে। জন্তুটা উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হোলো অনাবিষ্কৃত

জীবনের সন্ধানে নিরুদ্দেশ হওয়া,—সাধুভাষায় যার নাম অজানার আকর্ষণ। দুর্গম ব'লেই আনন্দদায়ক নয়, মানব-সমাজের বাইরে একটা অদ্ভুত অনৈসর্গিক প্রাণের স্বাদ—তাই এত মনোহর। শর্বরী জানতে চাইলো, কেন তোমার এই খেয়াল? উত্তর এলো অনেক বিলম্বে—মানুষের মধ্যে আর বৈচিত্র্য খুঁজে পাইনে। পলায়মান হরিণের উদ্দাম দ্রুততায়, বাঘের পদচিহ্নিত পথরেখায়, অরণ্যময় বনস্পতির নির্জন ছায়ায় খুঁজে পাই মানবোত্তর আকর্ষণ। জন্তুর রক্তের গন্ধে, বনকুকুরের পায়ের শব্দে, কাঠবিড়ালী আর গিরগিটির আওয়াজে, আরণ্যক পাখীর ডানার ঝাপটায় ভালো লাগে নিশ্বাস নিতে। বন্দুক নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই নতুন পৃথিবীতে।

শর্বরী লিখলো, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তুমি যেখানে ঘুরে বেড়াও সেটা পৃথিবীরই অংশ। পৃথিবী ওখানে তার স্বভাবের আদিম অবস্থায় রয়েছে, তাই আমাদের আদি চৈতন্যকে এত আকর্ষণ করে। তবু হৃদ্‌কম্প হয় তোমার জীবনের ক্লান্তির দিকে চেয়ে। —আমি দেখতে চাই তোমার অবসাদের চেহারা কেমন। এবার তোমাকে দেখে আসার অনুমতি পাঠাবে। ইতিমধ্যে তোমার বন্দুকের গুলীতে বাঘের হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্নভিন্ন হোক, কিন্তু শার্দূলরাজের থাবায় আমার ভাঙা কপাল আবার না ভাঙে ব্যাঘ্রবাহনের দরবারে এই মিনতি জানাই। শর্বরী মৃত্যু সইবে, অপমৃত্যু নয়।

তারিখ ও সময় সহ অনুমতিপত্র এসে হাজির হোলো।

২

ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ। শীতের কুয়াসায় আর রাত্রির অন্ধকারে থোট্টার মুলুকে অর্থাৎ বিহারের একটি ক্ষুদ্র মহকুমার ক্ষুদ্রতর

একটি স্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়ালো। সরকারী কেরোসিনের টিমটিমে আলো ও আকাশের অস্পষ্ট নক্ষত্র ছাড়া দৃশ্যমান সৌরজগতে আর কোথাও আলো নেই। সম্প্রতি বড় একটা বন্যায় বহু গ্রামের মূল উৎপাটিত হয়েছিল সুতরাং লোকালয় বলতে যৎসামান্যই।

একজন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে শর্বরী গাড়ী থেকে নামলো, কুলেন্দ্র এগিয়ে এসে হাসিমুখে বললে, সুস্বাগতম্।

শর্বরী অল্প ঘোমটা মাথায় টেনে বললে, তোমাকে এখানে কি ব'লে ডাকবো? হাকিম, না কুচক্রী?

কুলেন্দ্র বললে, এখানকার ডাকঘরের অনুগ্রহে অনেকেই আমাকে ওই নামে জানে। তুমি ত ঠিকানা লিখতে আগে তোমার ওই নামে, নামটা ডাকঘরে রেজেষ্ট্রী করা।

যাক্ ওনামে আর ডাকবো না তোমাকে।—ওরে মহেন্দ্র, জিনিষপত্র দেখে শুনে নে।

হুইস্‌ল্ দিয়ে ট্রেনখানা ধীরে সুস্থে চ'লে গেল। তারপরেই আবার চারিদিকে অবারিত অন্ধকার প্রান্তর। এখানে শর্বরীর প্রথম আসা। কোথাও কিছু দেখা যায় না, শূন্যতা যেন দিগন্তব্যাপী থমথম করছে। তবু একবার ঠাহর ক'রে সে দেখলো, হাকিম সাহেবের নতুন. অতিথির আবির্ভাবে স্টেশনে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, হুকুমের অপেক্ষায় সকলেই তটস্থ।

কুলেন্দ্র বললে, তুমি এসো, জিনিষপত্র নিয়ে মহেন্দ্র ঠিক গিয়ে পৌঁছবে, ব্যবস্থা আছে। ইস, এই ঠাণ্ডায় তোমার গায়ে অত পাৎলা চাদর? শীত করছে না?

সত্যই প্রবল শীতে শর্বরীর কাঁপুনি ধরেছিল। সে হাসিমুখে বললে, যদি বলি করছে?

কুলেন্দ্রর হাতে ওভারকোট ছিল, জামাটা নিয়ে সে শর্বরীর পিঠের

দিকে গায়ের উপর চাপিয়ে দিল। না সমারোহ, না সঙ্কোচ—সুতরাং বলবার আর কিছু রইলো না। শর্বরী কেবল বললে, তোমার ?

আমি এখানকার হাকিম, পদমর্যাদার গরম। এসো—ব'লে কুলেন্দ্র এগিয়ে চললো।

স্টেশন পেরিয়ে এসে দেখা গেল—মোটর রয়েছে ওদের প্রতীক্ষায়। শর্বরী বললে, তোমার মন্দির কতদূর ?

এই ত কাছেই।

তবে চলো হেঁটে যাই।

অতিথিকে কষ্ট দেবো ?

শর্বরী হেসে বললে, কষ্ট না দিলেই কষ্ট পাবো, কুচক্রী।

ধুলো আর কাঁকরে মেশানো পথ। কিছুদূর এসে কুলেন্দ্র বললে, তুমি আর ওই নামে আমাকে ডাকবে না কেন, শর্বরী ?

কুচক্রী তুমি নয়, তাই ডাকবো না।

হ'তে পারিনে ?

না।

মাত্র এই কারণে ?

দ্বিতীয় কারণ আমাদের বয়স হয়েছে। আমার তিরিশের কোঠা, তোমার তারও ওপর। নাম নিয়ে ছেলেমানুষী তামাসা অল্পবয়সে মানাতো।

কুলেন্দ্র হেসে বললে, বয়সটা যে অল্প নয় একথা মনেই থাকে না। মনে করিয়ে দিলে কষ্টও হয়।

কষ্ট কেন ?—শর্বরী প্রশ্ন করলো।

মনে হয় হাকিমীই করলুম, আর কিছু হোলো না।

শর্বরী হেসে উঠলো এবং তার অশ্রান্ত হাসির চূর্ণ আওয়াজগুলো গ্রামের পথ মুখরিত ক'রে তুললো। হাসি থামিয়ে এক সময় সে বললে, আর কিছুটা কি বলো ত ?

কুলেন্দু একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো। তার দিকে সেও হেসে উঠলো। কাষ্ঠহাসি, এমন নিষ্প্রাণ যে নিজেরই লজ্জা করতে লাগলো। অতটা ভেবে সে কথা বলেনি, অতটা অর্থ তার ছিল না। সহসা উত্তরটা তার মুখের কাছে এসেও যেন আবিল হয়ে উঠলো। বললে, আর কিছু নয়। মানে—এই আর কি। এই ধরো, মনে করেছিলুম বিলেত যাবো। কিন্তু যেতে পারলুম কই ?

শর্বরী কথা বললে না। দু'জনের দেখা অনেককাল পরে। দেখা হবার আগে অবধি মনে হয়েছিল কত কথা আছে, কত সংবাদ মনে মনে জমানো, কত সমাজদর্শন আর আধিভৌতিক আলোচনা—কিন্তু মনটা আড়ষ্ট আর অবশ হয়ে এলো। তুষারের স্তর জমে উঠেছে, এ গল্‌বে কি-না জানা যায় না—এর ভিতর থেকে প্রাণের ধারা ছোটানো বড় কঠিন। কিন্তু এই অবস্থা সহ্য ক'রে আতিথ্য নিয়ে ক'দিন সে থাকতে পারবে ? কেন সে এলো, না বুঝে ? কেন সে একথা বুঝতে চেষ্টা করেনি যে, চিঠি লেখালেখিই সহজ, কারণ তার মধ্যে পরস্পরকে চাক্ষুষ দেখা যায় না—সেখানে মন খুলে ধরা চলে অনায়াসে, যেহেতু শরীর-সান্নিধ্য সেখানে নেই। শর্বরীর মনে হতে লাগলো, এর নাম মুক্তি কিছুতেই নয়। চারিদিকের এই অবারিত স্বাধীনতার মাঝখানে এই প্রিয় মানুষটির কাছে একটি রাত্রির বেশি থাকলে কণ্ঠরোধে তার মৃত্যু হবে। বরং তার সেই ভবানীপুরের বাড়ীর তিনতলার একখানা বিশেষ ঘরেই তার জীবনের সকলের বড় স্বাচ্ছন্দ্য। কুচক্রীর অবসাদের চেহারাটা কেমন সে দেখতে এসেছিল, এসেছিল পুরুষকে বিচার করার অভিমান আর অহমিকা নিয়ে। আসার আগে বোঝেনি যে, তার নিজের পুঁজি আরো কম—আনন্দ পাবার এবং আনন্দ দেবার যে স্নায়বিক অজস্রতা সে-বস্তু কালক্রমে তারও ফুরিয়ে গেছে। শর্বরীর মাথা হেঁট হয়ে এলো।

হাকিমের বাংলোটা অনেক বড়। আসতে আসতে অনুভব করা গেল এদিকটা সিভিল লাইন, গ্রামের ছোঁয়াচ থেকে কিছু দূরে। কাল সকালের আগে এর বেশি আর কিছু আবিষ্কার করা যাবে না। তা ছাড়া এখানকার ভৌগলিক অবস্থিতি, দৃশ্যমানতা, পল্লীজীবন অথবা দেশভ্রমণ—এদের জন্যও শর্বরী আসেনি, এসেছিল—কিন্তু থাক সে-কথা। ফটক পার হয়ে ওরা দুজনে বাংলোর দালানে এসে উঠলো। একজন দাই, খানসামা আর পাচক এসে নবাগতাকে দীর্ঘ সেলাম দিল। সমস্ত বাংলোটা জুড়ে তিন চারটা পেট্রোমাক্স্ জ্বলছে।

কুলেন্দ্র তাকে সঙ্গে করে এনে একটা ঘরে ঢুকে বললে, এই তোমার ঘর, ওই দরজা খুললেই বাথ্—যদি ইচ্ছে করো দাই থাকবে তোমার ঘরে।

শর্বরী বললে, কিন্তু এ যে রাজকীয় সম্বর্ধনা—ফুলের তোড়া থেকে নতুন বিছানার চাদর, কিছুই বাকি রাখোনি।

আলোয় উজ্জ্বল ঘর। শর্বরী মুখ তুলে দেখলো কুচক্রীকে এতক্ষণে। এবার তিন বছর পরে দেখা, আধুনিক যুগের জীবনের দ্রুত পরিবর্তনশীলতার মধ্যে তিনটি বছর একটা দীর্ঘ সময়, এই দীর্ঘকালে পৃথিবীর মানচিত্র অবধি বদ্‌লে গেছে—এবং সেই পরিবর্তনের রেখাগুলি কুলেন্দ্রর কপাল আর চোখের পাতার দুইদিকে চিহ্নিত। বয়সের সঙ্গে কেবল গাম্ভীর্যই আসেনি, এসেছে অপরিচিত রুক্ষতা—চিঠিতে যার সংবাদ পাওয়া যায় নি। হাকিম হবার পক্ষে এ চেহারা বেমানান, বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে কুলেন্দ্রকে বেশ মানায়।

শর্বরী বললে, চলো, তোমার ঘরে যাই।—এই ব'লে সে ওভারকোটটা খুলে ফেললো। খানসামা জামাটা নিয়ে স'রে গেল।

কুচক্রীর ঘর নতুন বটে। আছে কেবল একটা বড় বিছানা, সামান্য আসবাব। কিন্তু আর যা আছে তাই দেখে শর্বরী শিউরে

উঠলো। ঘরের চার কোনে চারটি প্রকাণ্ড বাঘ রক্তিম মুখ আর হিংস্র দংষ্ট্রায় অপলক ভয়ংকর চোখে চেয়ে। মাঝখানে দণ্ডায়মান প্রকাণ্ড ভালুক-চারিটা হাত পায়ের থাবায় ভীষণ নখর। দেয়ালে টাঙানো অসংখ্য হরিণের মুণ্ড—এ ছাড়া বানর, হায়না, শূকর—প্রকাণ্ড হলঘর অরণ্যের হিংস্রতায় যেন একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। বিছানার ধারে এসে দাঁড়িয়ে শর্বরী দেখলো, মাথার দিকে একটা স্ট্যাণ্ডে আটকানো তিন চারটে বন্দুক আর রাইফেল, গোটা দুই বর্শা আর টাঙ্গি, ইস্পাতের ফলা বাঁধানো গোটা কয়েক তীর।

সে বললে, বিছানায় তোমার এত বড় ছুরি কেন ?

কুলেন্দ্র বললে, ওটা বালিশের কাছে না থাকলে ঘুম হয় না।—

শর্বরী বললে, কেন ?

দুঃস্বপ্ন দেখি ওটা ছুঁয়ে না থাকলে।—এই বলে কুলেন্দ্র হেসে উঠলো। তার হাসিটা নির্ভরযোগ্য নয়, এতগুলি জানোয়ারের নিঃশব্দ সম্মিলিত আর্তনাদের মতো তার হাসিটাও যেন অমানবিক !

শর্বরী কেবল বললে, তোমাকে আর চেনা যায়না, কুচক্রী।—অর্থাৎ অনেক বদ্‌লে গেছ। তিন বছর বনে জঙ্গলে কাটালে মানুষ তোমার মতন হয়। চলো তুমি অন্য দেশে, দরখাস্ত ক'রে বদলি হও।

ভালুকের দাঁতের ওপর হাতের আঙুলগুলো বুলিয়ে কুলেন্দ্র বললে, মানুষের দেশ আর ভালো লাগে না, সে আমি অনেক দেখেছি—এবং জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে একটা বন্য উচ্ছৃঙ্খল জীবন—আচ্ছা বেশ, কথা হবেখ'ন। তুমি কি খাবে বলো।

নিশ্বাস ফেলে শর্বরী কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, হিন্দু ব্রাহ্মণঘরের বিধবা রাত্রে কি খায় তুমি জান না ?

জানি, তারা কিছুই খায় না।—এই বলে কুলেন্দ্র হেসে বেরিয়ে

যাচ্ছিল, পুনরায় মুখ ফিরিয়ে বললে, এখানে বুড়ি দাই ব্রাহ্মণের মেয়ে, মাছ-মাংস ছোঁয় না, পুজো করে—সুতরাং তোমার সঙ্গে মিলবে ভালো।

কুলেন্দ্র বেরিয়ে গেল। তার আলাপে কোনো সমারোহ নেই, কোথাও উচ্ছ্বাস খুঁজে পাওয়া যায় না—অতিথির প্রতি যে একটা সামাজিক সৌজন্য, সেদিকেও যেন তার ভ্রুক্ষেপ নেই। শর্বরী একবার মহেন্দ্রর নাম ধরে ডাকতে গেল, কিন্তু তার গলার স্বর বেরুলো না। কেমন একটা কাঁচা চামড়া আর রংয়ের গন্ধ, সেই ঘন গন্ধে নিশ্বাস নিতে শর্বরীর শরীর যেন সারাদিনের শ্রান্তিতে অবশ হয়ে এলো।

ঘণ্টা দুই পরে নিজের নির্দিষ্ট ঘরে এসে সে যখন ঢুকলো তখনও কুলেন্দ্র একবার এসে দেখা দিল না। কেমন একটা নিরানন্দে ঘেরা এই বাংলোর আবহাওয়া। অবাঞ্ছিত অতিথির মতো অনাদৃত হয়ে সে থাকবে, এ একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা বটে। কত জানবার, কত জানাবার, কত আত্মীয়পরিজনের কত ইতিহাস, তার অন্তরের কত অপ্রকাশিত কাহিনী—কুলেন্দ্র কিছু শুনতে চাইলো না। অথচ দাবি তার কম নয়, সাধারণ ভাষায় যার নাম প্রণয়কাণ্ড—সেটা না ঘটলেও এই যুবকের সঙ্গে তার বিবাহ ছিল সুনিশ্চিত—তার পরে পারিবারিক চক্রান্তে দুই নদী ব'য়ে গেল দুই খাতে। বিবাহ হ'তে পারেনি কিন্তু বন্ধুতাও নষ্ট হয়নি—সেই বন্ধুতাকে ভালোবাসা বলো ক্ষতি নেই, কিন্তু যৌবনান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়ে যদি আজ এই মিথ্যা প্রচার করতে হয় যে, রঙে রসে মাধুর্যে উত্তাপে দুটি প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, তবে দুজনেই অপমানিত বোধ করবে। সেটা সত্য নয়। একজন গেছে জীবন-বৈরাগ্যের দিকে, আর একজন বন্যতার পথে। শর্বরী স্পষ্ট অনুভব করলে, দুজনকে আজ শারীর-সান্নিধ্যে আনলেও একতা খুঁজে

পাওয়া যাবে না, দুই গ্রহের দুই কক্ষপথ। বিচিত্র ও বিভিন্ন অভ্যাসের ভিতর দিয়ে পরস্পরের স্বভাব দীর্ঘকাল ধ'রে দৃঢ়ভিত্তিতে গ'ড়ে উঠেছে, নতুন ক'রে মাধুর্য আর তারুণ্য আনবার কোনো পথ নেই। একে স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভদ্রমনের কাজ।

৩

অতি প্রত্যুষে উঠলো শর্বরী। গাছপালায় তথনো অন্ধকার জমে রয়েছে, শূন্যলোকে শীতের কুয়াসার ভিতর দিয়ে তারার দল তথনো সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয় নি। শুকতারা জ্বলজ্বল করছে।

স্নান সেরে বেরিয়ে এসে শর্বরী মহেন্দ্রকে ডাকলো। বললে, ভোর বেলা কল্‌কাতার গাড়ী আছে, না রে?

মহেন্দ্র বললে, আছে দিদিমণি।

ওই গাড়ীতেই যাবো। বাবুকে ডেকে তোল দেখি।

কিন্তু বাবুকে ডাকবার আগেই দাই আর আরদালি এসে হাজির হয়ে প্রাতঃকালীন সেলাম ঠুকলো। তথন আকাশ ফর্সা হয়েছে। গ্রাম্য পাখীদের প্রভাতী বন্দনা চলছে। শীতের কুহেলিজালের ভিতর দিয়ে পল্লীশ্রী সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছে। সূর্যোদয়ের বিলম্ব নেই।

মহেন্দ্র বিছানা ও ব্যাগ বেঁধে প্রস্তুত হোলো। শর্বরী বললে, একটা রাত বেশ কাটলো, না রে মহেন্দ্র?

হ্যাঁ, দিদিমণি।

তুই ত একটা উজবুগ, বাংলা দেশের বাইরে কথনো আসিসনি, দেখলি ত কেমন চমৎকার জায়গা! কোথাও পচা জলও নেই, মশাও নেই। ছাতুখোরের দেশ ব'লে ঠাট্টা করিস, অথচ একটা দিনেই ত শরীর সারিয়ে নিয়ে চললি। গাড়ীর সময় হয়েছে, না রে?

আজ্ঞে হ্যাঁ হোলো বৈ কি। আমি কি জিনিষপত্র নিয়ে এগোবো, দিদিমণি ?

শর্বরী দাইকে ডেকে বললে, সাহেবকে একবার ডেকে দাও ত'। বাবারে, কাল সন্ধ্যেরাত থেকে কী ঘুম! বড়দিনের ছুটিটা বুঝি সাহেব ঘুমিয়েই কাটালেন, না কি বলো দাই ?

কিন্তু দাইয়ের বদলে আরদালি জবাব দিল। বললে, সাহেব নিকাল গিয়া, মাঈজি।

নিকাল্ গিয়া ? বেরিয়ে গেছেন নাকি ?

হাঁ জি।

কখন্ ?

আরদালি জানালো, রাত দুটোয় মোটর নিয়ে সাহেব মহাদেওগঞ্জ গেছেন, এইবার ফিরবেন।

শর্বরী প্রশ্ন করলো, কোনো কাজে বুঝি ?

নেহি মাঈজি, জঙ্গলমে। গিয়া শিকার খেল্‌নে।

শর্বরী স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলো। পৌষমাসের রাত দুটোয় মানুষ যায় প্রাণীহত্যার উদ্দেশে। অদ্ভুত পুরুষের মন। কিন্তু কুলেন্দ্রর সঙ্গে দেখা না ক'রেই বা সে যাবে কি ক'রে? অন্তত সামাজিক সৌজন্যবোধেও তাকে অপেক্ষা করতে হবে। পিছনের দিকে সে চাইলো না, অতিথির সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি দিল না, নিজের প্রাণের দায়িত্ব নিল না——শর্বরী পাথরের মতো ব'সে ব'সে দূর মাঠে প্রভাতের আলোর দিকে অপলক চোখে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগলো। কৃষ্ণপক্ষের রাত দুটোয় অরণ্যের ভিতরে গিয়ে সে আনন্দ পায়! নিজেকে অনাদৃত বোধ ক'রে অভিমান তা'র পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো।

মহেন্দ্র প্রশ্ন করলো, ব্যাগ আর বিছানা নিয়ে কি আমি এগোবো, দিদিমণি ?

থাম্।—ব'লে শর্বরী বিরক্ত হয়ে ব'সে রইলো।

প্রায় সাতটার সময় কুলেন্দ্রর গাড়ী এসে বাংলোর ফটকে ঢুকলো। শীতের কাঁচা রৌদ্র রাঙা হয়ে তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলোর কোর্ট-ইয়ার্ডের ঘাসগুলির উপর শিশিরবিন্দু ঝলমল করছে। গাড়ী সটান্ এসে দালানের ধারে থামলো।

শর্বরী মনে করেছিল অসৌজন্যের অভিযোগে কিছু তিরস্কার সে করবেই, কিন্তু গাড়ীর ভিতর দিকে লক্ষ্য ক'রে সে বিস্মিত হোলো। গদীর উপর হেলান দিয়ে শুয়ে কুলেন্দ্র গভীর গাঢ় নিদ্রায় অচেতন। গাড়ী থামলেও তার জাগার লক্ষণ নেই।

খানসামা গিয়ে মোটরের দরজা খুললো। বন্দুক দুটো নামালো, ডাইনামো সুদ্ধ স্পট্ লাইট বা'র ক'রে আনলো, টাঙ্গি আর বর্শা দুটো একজন বা'র ক'রে নিয়ে গেল। এ ছাড়া গাড়ীর মধ্যে খাবারের বাসন, শীতে শরীর গরম রাখার স্টিমুলেন্ট্, কম্বল ও বালিশ, চামড়ার কোট, মাথার টুপি—অর্থাৎ যে-পূজার যে-উপকরণ। সমস্ত ব্যাপারটা চললো যন্ত্রের মতন—সাহেবের তখনো ঘুম ভাঙেনি।

তিরস্কার করার কোনো সুযোগ পাওয়া গেল না, ওদিকে ভোরের ট্রেন নিকটবর্তী স্টেশনের উপর দিয়ে বাঁশী বাজিয়ে চ'লে গেল। শর্বরী উঠে এসে মোটরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকলো, কুলেন্দ্র? শুন্‌ছ?

কুলেন্দ্র চোখ চাইলো। স্বল্পনিদ্রায় রাঙা দুটো চোখ, তার মাথায় কয়েকটা শুকনো লতাপাতার কাঠিকুঠি—ভ্রূক্ষেপ নেই—হাতে কয়েকটা কাঁটাগাছের ছড়ের দাগ। শর্বরী জিজ্ঞাসা করলো, বীরপুরুষ, শিকার ত' করে এলে, জন্তু কই?

মনে হোলো, শরীরটা তার অবসন্ন, জড়তা কাটিয়ে গাড়ী থেকে

সে নেমে এলো। বললে, আজ শিকার জোটেনি—সম্ভর একটা পেয়েছিলুম কিন্তু নিরপরাধকে মারতে মন উঠলো না।—এই ব'লে কুলেন্দ্র একটু হাসলো।

বলো কি, কুচক্রী?—হাসিমুখে শর্বরী বললে, এ বিবেচনাটুকু আছে নাকি তোমার?

কুলেন্দ্র খুব একচোট হেসে উঠলো। তারপর বললে, কী নিবিড় চোখের দৃষ্টি সম্ভরের—অরণ্যের আত্মা যেন সেই চোখে থরথর করছিল। বন্দুকটা আমার হাতে কাঁপলো, মারতে পারলুম না। অনেক মেরেছি।

মারো কেন বলো ত?

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে মুখে পাইপ নিয়ে কুলেন্দ্র বললে, ভাল লাগে। জন্তুকে ত মারিনে, মারি অরণ্যের বুকে গুলী, বনদেবী সন্তানের মৃত্যুতে আর্তনাদ করে ওঠে—ভারি আনন্দ পাই।

শর্বরী তার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর বললে, যাবার সময় আমাকে জানিয়ে গেলে না কেন?

খানসামা চায়ের সঙ্গে প্রাতরাশ এনে রাখলো টেব্‌লের ওপর, দাই নিয়ে এলো গরম জলের গামলা, সাবান ও তোয়ালে। কুলেন্দ্র হাত মুখ ধুয়ে খেতে ব'সে গেল। বললে, রোজই যাই, চুপি চুপি পালাই। রাত্রে বন আমাকে ডাকে, ঘুমোতে পারিনে।

কিন্তু এতে শরীর টিক্‌বে, কুচক্রী?

টি'কে আছে ত' এতদিন। অবশ্য রাতে ঘুম তেমন হয় না। তবে অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, তারা বলে, এ ইন্‌সম্‌নিয়া ছাড়ানো কঠিন।

শর্বরী মাথা নত ক'রে রইলো, কেন রইলো সে কথা আর কারো না জানালেও চলবে। যার কাছে বিদায় নিয়ে চ'লে যাবার জন্য সে ব্যস্ত হয়েছিল, যাবার কথা তাকে জানাতেও আর মন সরলো না। কি

জানি কেন যে-জীবন কুলেন্দ্র যাপন করছে, এর সঙ্গে শর্বরীর অপরাধী মনও যেন জড়ানো।

কুলেন্দ্র প্রশ্ন করলো, তোমাকে জানিয়ে যাইনি তাই বুঝি ফিরে আসতেই যুদ্ধ ঘোষণা করলে? জানিয়ে গেলে তোমার ঘুম ভাঙানো ছাড়া আর কি হোতো?

মুখ তুলে শর্বরী বললে, কেন, তোমার সঙ্গে গিয়ে বন্দুক ধরতুম।

যেতে তুমি?—চায়ের বাটি কুলেন্দ্র মুখের কাছে তুলে নিল।

পরীক্ষা ক'রে দেখলে না কেন?

কুলেন্দ্র সোজা হয়ে বসলো। বললে, কেউ যেতে চায় না আমার সঙ্গে, ওই চৌবে ছাড়া। ওরা কেউ বুঝতে পারে না জঙ্গল কেবল গাছপালা নয়, কেবল জন্তু জানোয়ার নয়—আরো বিস্ময় একটা কিছু—একেবারে তার গভীর অতল তলে না গেলে বুঝতে পারা যাবে না।

শর্বরী বললে, তুমি ত খেয়ালী, এ খেলা তোমার কতদিন চলবে?

কিন্তু এটা খেয়াল নয়, পরীক্ষা করতে পারো। এ খেলার শেষ নেই, কারণ প্রাণের এত বেশি অজস্রতা, এখানে এত অভিনবত্ব যে চিরকাল ধ'রে পুরুষের দুরন্তপনাকে জাগিয়ে রাখতে পারে। অস্ত্রের ব্যবহার না থাকলে নির্জীবতা আসে, স্বভাবের সেই বিকৃতি থেকে প্রথমতঃ মুক্তি পাওয়া যায়। তারপর শক্তি আর উৎসাহের অপরিমেয়তা। স্মরণ করো—পৃথিবীর আদিম অক্ষত মাটির স্তর, যার ওপরে আজো হলকর্ষণ হয়নি, গাছের শিকড় প্রাণশক্তিতে জাগ্রত, কোটরে কীট, সুড়ঙ্গে সরীসৃপ, নানাবিধ পতঙ্গের আনাগোনায় ফুল ফল লতা-পাতা সারাদিন মুখরিত, ডালে ডালে শত বর্ণের পাখী, শাখাবিহারী জানোয়ার—এদের নিচে দিয়ে অজস্র হিংস্র শ্বাপদের চলাফেরা—কুলেন্দ্র প্রাতরাশ শেষ ক'রে গল্প জমিয়ে তুললো।

শর্বরী বললে, তুমি ত ওদের মাঝখানে নতুন?

হ্যাঁ—নতুন।—ব'লে কুলেন্দ্র মাঠের দিকে একবার তাকালো। সকালের মধুর রোদ পায়ের কাছে এসে পড়েছে। দূরে তাল-পিয়ালের সারির দিকে চেয়ে সে পুনরায় বললে, সম্পূর্ণ নতুন আমি সেখানে। তারা সবাই দেখতে পায় আমিও একটা বিচিত্র জানোয়ার—গিয়ে পড়েছি তাদের মাঝখানে। যদি দেখতে পায়—পালায়, কারণ আমি তাদের চেয়ে অনেক বেশি হিংস্র, অনেক বেশি বিশ্বাসঘাতক।

শর্বরী প্রশ্ন করলো, তার মানে?

কুলেন্দ্র বললে, মানুষ মানুষকে বঞ্চনা করে, প্রতারিত করে, রাজ্য কেড়ে নেয়, বিষবাষ্প দিয়ে নিরপরাধ জাতিকে ধ্বংস করে, কল্যাণের সকল পথকে কণ্টকিত ক'রে তোলে। মানুষ যে কত ভীষণ, অরণ্যের সহজ সরলতার মধ্যে না গেলে জানা যায় না। জন্তুর জগতে ভালোবাসা নামক পদার্থ নেই, আছে লালসার উলঙ্গ আকর্ষণ—ভালোবাসা আছে মানব-সমাজে, তাই সে বস্তু নিয়ে এত দুঃখ এত প্রবঞ্চনা আর ব্যথার সৃষ্টি।

একটা উচ্ছ্বাস এসে পড়েছিল শর্বরীর মুখে চোখে। সে তাড়াতাড়ি কি একটা অছিলায় উঠে চ'লে গেল। ফিরলো যখন, অনেকক্ষণ পর, দেখলো গাঢ় নিদ্রায় কুলেন্দ্র অচেতন। বিছানায় গিয়ে শুতে বললে তার ঘুম ভাঙতে পারে, ঘুম তার মূল্যবান্—শর্বরী তাকে আর ডাকলো না, কেবল একবার ঘরে গিয়ে তার নিজের শালখানা এনে তার গায়ে ধীরে ধীরে চাপা দিয়ে দিল।

কলকাতার গাড়ীতে ফিরে যাবার উৎসাহ আপাতত তার আর নেই। নিজেকে অনাদৃত বোধ ক'রে সে ভুল ক'রেছিল, কারণ যার হাতে এই অনাদর—মানুষের দিকে তার আকর্ষণ স্বভাবতই কম। তার মন নেই শর্বরীর দিকে; এ তার ইচ্ছাকৃত অবহেলা নয়, কারণ তার

হৃদয়ের সকল ঔৎসুক্য অরণ্যলোকের নূতনতর জীবনের মধ্যে অভিনব পৃথিবী খুঁজে বা'র করেছে। তার ওপর অভিমান রাখা ছেলেমানুষী। আজ সে স্পষ্ট জানতে পারলো, চিঠির উত্তর কেন আসতো বিলম্বে, কেন সেই বিলম্বিত চিঠির ভাষা হোতো অসংলগ্ন। হৃদয়ের যে অংশটা নিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে কাজ-কারবার, কুলেন্দ্রর সেটা অসাড় ও পক্ষাঘাত-গ্রস্ত, তার ক্ষতিপূরণ হয়েছে শিকারীজীবনে—পুরুষের নিগৃহীত বৃত্তি দুরন্তপনায় পেয়েছে নতুন প্রাণের স্বাদ। যেহেতু যৌবনান্ত-কালে এই অভ্যাস তার সংস্কারে পরিণত হোতে চললো, এখন তাকে মানুষের পথে ফিরিয়ে আনা আর হয়ত সম্ভব নয়। বিদায় নিয়ে শর্বরী এক সময় চ'লে যাবে সন্দেহ নেই, কোনো স্নেহের চিহ্ন কোনো অভিমানের দাগ সে রেখে যাবে না এও ঠিক—কিন্তু বিদায় নিয়ে যাবার সময় তার জীবনের শেষ অবলম্বনকে যে চিরকালের মতো হারিয়ে যেতে হবে এই কথা মনে ক'রে শর্বরীর চোখ ভারাক্রান্ত হ'য়ে এলো।

৪

শীতের অপরাহ্নে চোবে মোটর প্রস্তুত ক'রে এনে বারান্দার নীচে দাঁড় করালো। কী উৎসাহ কুলেন্দ্রর চোখে মুখে। গরম একটা শার্টের সঙ্গে থাকি ব্রিচেজ্ পরা হাঁটুর নিচে ঘোড়সওয়ারের মতো চামড়ার প্যাড, পায়ে কালো বুট। শর্বরীর গায়ে গলাবন্ধ ফ্লানেল বডিস, পরণে শালের শাড়ী, পায়ে মোজা আর ঘুন্টিবাঁধা শ্যু, হাতে দস্তানা, গায়ে জড়ানো মোটা আর মোলায়েম কাশ্মীরী তাপতা। তাকে ভারি সুন্দর মানিয়েছিল। কিন্তু ত্রিশের গা ঘেঁয়ে এলে মেয়েরা নিজেদের রূপ ও যৌবন সম্বন্ধে সচেতন হ'তে ঈষৎ লজ্জা পায় এই যা।

বাংলোর গেট পার হয়ে গ্রামের পথের ধূলো উড়িয়ে মোটর ছুটে চললো দক্ষিণে। শীতের বেলা, গাছ-পালায় রোদ উঠেছে, দিনান্তকালের আকাশ এরই মধ্যে হয়ে উঠেছে হিমধূসর। গাড়ীর মধ্যে আরামে দুজনে বসলো।

কুলেন্দ্র বললে, আমি ভাবতেই পারিনি, আশাই করিনি যে তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

শর্বরী বললে, চারিদিক মাঠ আর গ্রাম দেখছি, এদিকে জঙ্গল কোথায়?

খুব কাছে নয়, পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে। আছে সব, সন্ধ্যা হোক, হঠাৎ একসময় আবিষ্কার করবে বুকের মধ্যে দুরু দুরু কাঁপন, তখনই জানবে এসেছ পৃথিবী ছাড়িয়ে। আগে চলো রায় সাহেবের কুঠিতে।

রায় সাহেবের কুঠি? সে কে?

সে লোকটা থাকে খুনিয়ার ধারেই পাহাড়ের নিচে। খদের ঝরণার পাশে সে বাঘের মাচা বাঁধে। আশ্চর্য, লোকটা বাঙালী। কুঠিবাড়ীটা তারই, সে জমিদার।—খাবার এনেছ সঙ্গে?

শর্বরী বললে, এনেছি, খাবে এখন?

খাবো, কিন্তু তুমি?

ব্যস্ত হোয়ো না, চোবের কাছে ব্যবস্থা আছে।—এই ব'লে শর্বরী টিফিন ক্যারিয়ারের ঢাকা খুলে কড়াইসিদ্ধ, ডালমোট—নিম্‌কি, ডিমসিদ্ধ চা ইত্যাদি বা'র করলো। সযত্ন আহার পেয়ে এই ছন্নছাড়া পরম পরিতৃপ্তিতে খেতে খেতে এক সময় বললে, তুমি ছুঁলে যে এইসব খাবার?

দ্রুতগতি গাড়ীর দোলায় ব'সে স্তব্ধ হ'য়ে শর্বরী কুলেন্দ্রের প্রতি তাকালো। স্নেহের তিরস্কারে সেই দৃষ্টি ক্ষুব্ধ, আহত। তবু নিজেকে সে

দমন করতে পারলো না। বললে, এর আগে আমিষ আমি কখনও ছুঁইনি, তা জানো ?

ও, তাই ন্যাকি ?—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—উচ্চকণ্ঠে পারাবতের পাখার ঝাপটের মতো সশব্দে কুলেন্দ্র হেসে উঠলো। বললে, গঙ্গায় গিয়ে সাতবার না ডুবলে তোমার পাপক্ষয় হবে না শর্বরী, মনে রেখো।

শর্বরী এবার হেসে বললে, সন্ন্যাসীদের আওতায় থাকলে পাপ স্পর্শ করে না।

করে না ত ? আচ্ছা, বেশ—তাহলে যাবার সময় তোমাকে কিছু বক্‌শিস্ দেওয়া যাবে। মনে ক'রে দিয়ো।

কী বক্‌শিস শুনি ?—শর্বরী সহসা উৎসুক হয়ে উঠলো।

কুলেন্দ্র বললে, এবার যে বাঘটা মারা পড়বে তার চামড়াটা। তুমি ব্যাঘ্রচর্মাসনে ব'সে হবে ধ্যানস্থ, সেই তোমার পক্ষে মানানসই হবে।

শর্বরীর নিরুৎসাহ কণ্ঠ থেকে আর উত্তর বেরুলো না।

বহুদূরে এসে পাওয়া গেল বালুময় ছোট নদী। জলধারা অতি শীর্ণ, মোটর তার উপর দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে গেল। পথের দুই ধারে ধানকাটা মাঠ, মাঝে মাঝে শালুকভরা কোনো কোনো 'তালাওর' জল চিকচিক ক'রে উঠছে। কখনো বা চোখে পড়ে আকাশপথে 'চাহা' আর 'বকুলা'র দল সন সন ক'রে উড়ে চলেছে।

আহারাদি শেষ ক'রে কুলেন্দ্র পাইপ ধরিয়ে বসলো বাইরের দিকে চেয়ে। দূর শূন্যে যে 'স্নাইপে'র দল তীরবেগে চলেছে, সেইদিকে তার লক্ষ্য। তাদের উড়ন্ত ডানায় ঝিকমিক করছে অস্তমান সূর্যের রাঙা আলো। রাইফেলের গুলিতে উড্ডীন পাখী মারা যায় এ কথা সে শুনেছে। একান্ত, উদ্‌গ্রীব, উচ্চকিত দৃষ্টিতে কুলেন্দ্র সন্ধ্যায় অদৃশ্যমান পাখীর ঝাঁকের দিকে চেয়ে রইলো।

শর্বরী প্রশ্ন করলো, রায় সাহেবের কুঠিতে কি কোনো কাজ আছে তোমার?

কিছু না, এমনি।

তবে যাচ্ছ কেন?

ওঃ—কুলেন্দ্র মুখ ফিরিয়ে বললে, যাচ্ছি তার কারণ ভীবণ দরকার। আরে সেই ত আসল। তার হাতেই ত যত শিকার। শিকারকে সে পালাতে দেয় না।

সে আবার কি?

লোকটা অদ্ভুত। বাঘকে বন্দী ক'রে রাখে কেবল আলো ফেলবার কৌশলে। রাত্রে সে জানোয়ারের অস্তিত্ব টের পায়, অন্ধকারেই তার চোখ খোলে। লোকটার বাড়ী আসামের দিকে কোথায় যেন, পুরানো কোন্ রাজবংশে ওর জন্ম—আজকাল চামড়ার ব্যবসা করে। যতদূর জানি সংসারে তার কেউ নেই। বেশ লাগে লোকটাকে।

কাঁচের শার্সি সব কটাই বন্ধ, তবু শীতের একটা আড়ষ্ট ভাব রয়েছে। গাড়ীর ভিতরে কম্বল আর গরম কাপড়-চোপড়ের মধ্যে শর্বরী খুব আরামেই ব'সে ছিল। এগাড়ী থেকে আর তার নামবার ইচ্ছা নেই, এমনি ক'রে যদি দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত মোটর চলে তবে সে খুশি হয়। কল্‌কাতায় তার সম্বন্ধে নানা কৌতূহলের শাসন, নানা মানুষের নোংরা ঔৎসুক্য—তাদের মাঝখান দিয়ে আড়ষ্ট পা নিয়ে চলা-ফেরা ভারি কঠিন। কল্‌কাতায় সে দাম্ভিক, সে আত্মাভিমানী, ঐশ্বর্যের অহংকারে মাটিতে নাকি তার পা পড়ে না; তার স্নেহ আর সম্প্রীতির মধ্যেও নাকি উন্নাসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষকে সে কাছে ঘেঁষতে দেয় না, কারণ মানুষ নাকি তার কাছে ছোট, কৃপার বস্তু। বিত্তশালিনী বিধবার সম্বন্ধে মুখরোচক জনশ্রুতি শিক্ষিত জগতে ভারি উপাদেয়।

কিন্তু এখানে? জনশ্রুতির কাঁটা ফুটছে না পায়ের তলায়, লোলুপ উদগ্রজিহ্ব কৌতূহল নেই কোথাও—এখানে সে বেশ আছে। শর্বরী গা-এলিয়ে স্নায়ুতন্ত্রের গ্রন্থি খুলে দিয়ে ব'সে রইলো। কুলেন্দ্র তার প্রিয়, কিন্তু প্রিয় মানুষকেও মেয়েরা ভয় পায়। কুলেন্দ্র ভয়ের পাত্র নয়। চিন্তার গতি, মনের চাকা তার এমন একদিকে—যেখানে আর যাই থাক্ নারীপ্রভাব নেই।

শর্বরী প্রশ্ন করলো, তুমি ত জানতে চাইলে না কুচক্রী, আমি কেমন ক'রে এলুম?

বন্দুকটার উপর হাতখানা রেখে কুলেন্দ্র বললে, যেমন ক'রে স্বাধীন মানুষ আসা-যাওয়া করে সেইভাবে তুমি এলে!

কিন্তু আমি যে মেয়েমানুষ?

কুলেন্দ্র তার দিকে তাকালো। শর্বরী পুনরায় বললে, চাকর সঙ্গে নিয়ে বিধবা মানুষ বেরিয়ে পড়লুম, আমার সাহসের একটু প্রশংসা করবে না?

এর মধ্যে সাহস কোথায়?

বাঃ—শর্বরী একটু হাসলো এবং যেমন ক'রে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুকে খুঁচিয়ে চিড়িয়াখানার দর্শক আনন্দ পায়, তেমনি ক'রে সে বললে, বয়স না হয় হয়েছে, একেবারে বুড়ি ত হইনি! তোমার খোঁজে বেরিয়ে পড়লুম, এ ত' বাঘ শিকারের চেয়েও দুঃসাহস। অন্তত লোকনিন্দার কথাটা—

পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে কুলেন্দ্র বললে, নিন্দার যোগ্য তারা যারা নিন্দাকে ভয় পায়।—চৌবে, চৌবে, উ কা চল্ গৈ?—সহসা ঝনাৎ ক'রে বন্দুকটা সে তুলে ধরলো।

চৌবে বললে, কুচ্ নেহি সাব, এক শিয়ার উতর গ্যা। ইধর জান্‌বর কাঁহা?

কুলেন্দ্র শান্ত হয়ে আবার বন্দুক নামিয়ে রাখলো। কিন্তু সামান্য একটা শৃগালের ছায়া দেখে রুদ্রের বিকৃত মুখের উপর দুইটা পাশব চক্ষুর যে উজ্জ্বল অগ্নিস্রাব একটি মুহূর্তে ঘ'টে গেল, তাই দেখে শর্বরীর মুখে আর কথা সরলো না, একপাশে সে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলো।

প্রান্তর পার হয়ে মোটর সংকীর্ণ পথে প্রবেশ করেছে। অরণ্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মোটরের হেডলাইট্ জ্ব'লে উঠলো। বিপরীত দিক থেকে এক একখানা মাল বোঝাই বয়েল্ গাড়ী পার হয়ে যাচ্ছে, হেড্লাইটের তীব্র আলোয় গরুর চোখগুলো দপদপ ক'রে জ্বলছিল। দূরে বনময় অন্ধকার পার্বত্য-ভূমির গর্তে পথ চ'লে গিয়েছে। পথ আর নেই।

পথের দু-তিনটা বাঁক আর ক্যাল্ভার্ট ঘুরে এসে মোটর সহসা থামলো। চারিদিকে অপরূপ নৈঃশব্দ্য, শীতের হাওয়ায় গাছপালার সরসরানি ছাড়া আর কোথাও সাড়াশব্দ নেই। চৌবে গাড়ী থেকে নেমে দরজা খুলে দিল। কুলেন্দ্র বললে নামো শর্বরী।

শর্বরী গাড়ী থেকে নামলো। কাঁকরের উপরে উপরে তাদের জুতোর খসখস, শব্দটাও যেন সেই নিঃশব্দকে মুখরিত ক'রে তুলেছে। শর্বরী ঠাহর করে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো একটা দালান—তার ভিতর থেকে কেমন একটা প্রাচীন পাথুরে বুনো গন্ধ বায়ুমণ্ডলকে ঘুলিয়ে তুলেছে।

সেই অন্ধকারের ভিতরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় চৌবে ডাকলো, আলীজান্?

হুজোর।—ভিতর থেকে সাড়া দিয়ে তখনই যেন মানুষের এক প্রেতাত্মা বেরিয়ে এলো।

চৌবে বললে, রায় সাব্ ডেরে মে হুঁ?

জি।

ব'ল্লে হাকিম সাব্ আয়া। বাত্তি বানাও।

চতুর্দিকে সর্বগ্রাসী অন্ধকার। শর্বরী কুলেন্দ্রের কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে স্বাস্ত বোধ করলো। সন্ত্রাসের সঙ্গে বুকের রক্ততরঙ্গের উল্লাস—দুইয়ের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণে শর্বরীর পা কাঁপছে। তার অসহায় হাতখানা এখনই কেউ ধরলে ভালো হয়। গলা নামিয়ে কুলেন্দ্র বললে, শর্বরী, দশ মাইলের মধ্যে এ অঞ্চলে কোথাও গ্রাম নেই।

কম্পিতকণ্ঠে শর্বরী বললে, কেন?

অতিকায় একটা সরীসৃপের মতো হিস্‌ফিস্ ক'রে কুচক্রী বললে, জানোয়ারের আনাগোনা!

অন্ধকার ভেদ ক'রে জন্তুর মতো দুটো লণ্ঠন এসে পৌঁছলো। কুলেন্দ্রর পিছনে পিছনে শর্বরী ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। কিন্তু ভিতরে কিছুদূর গিয়ে সহসা তীব্র বীভৎস গন্ধে সে অস্থির হয়ে উঠলো। নাকে কাপড় চেপে বল্‌লে, কি বলো ত?

কুলেন্দ্র বললে,চর্বি গলানো গন্ধ। এসো এই ঘরে। চৌবে, বাতি জ্বালাও।

হিমাচ্ছন্ন একটা পুরাতন ঘর। শাল আর লোহাকাঠের উপর আল্‌কাতরা মাখানো যেন একটা মৃত্যুপুরী। কড়িকাঠের ভিতর ইঁদুরের চলাফেরার শব্দ শোনা গেল। একপাশে প্রকাণ্ড একখানা চৌকী। কয়েদখানার মতো দেয়ালের অনেক উপরে ছোট ছোট দুটো জান্‌লা। আতঙ্কে শর্বরীর সর্বশরীর ঝিমঝিম ক'রে এলো।

কুলেন্দ্র মৃদুকণ্ঠে বললে, একটা স্মৃতি আছে এই ঘরে!

ঢোক গিলে শর্বরী বললে, কিসের?

রায়সাহেব জানে গল্পটা। অনেককাল আগে এই বাড়ীটা ছিল এক ভীল সর্দারের। সেই সময় একদিন এক ইংরেজ দম্পতি এই ঘরে এসে

ওঠে। তাদের শিকারের সখ ছিল। একদিন রাত্রে স্বামী ঘুমোচ্ছে এমন সময় স্ত্রী কি একটা শিকড় শুঁকিয়ে স্বামীকে অজ্ঞান করে; তারপর এক বোতল নাইটিক য়্যাসিড তার গায়ে ঢেলে দিয়ে তাকে পুড়িয়ে মারে।

তারপর?

সেই সময় এক নরখাদক বাঘ এই জঙ্গলে দেখা দেয়। ভীলসর্দার সেই মেয়েটিকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে বাঘের আনাগোনার পথে বেঁধে রেখে আসে।—এই বলে কুলেন্দ্র হাসলো। পুনরায় বললে, পরদিনও সে বাঁধা অবস্থায় ছিল বটে তবে তার দেহের উপরের অংশটা ছিল না। অনেককালের কথা, তখন সিপাহী যুদ্ধের যুগ।

বাইরে পায়ের শব্দ হোলো এবং তারপরেই যাকে দেখা গেল, সে এক দীর্ঘকায় পুরুষ। তাকে দেখে শর্বরী মনে মনে আঁতকে উঠলো। কুলেন্দ্র গিয়ে করমর্দন ক'রে বললে, জয় শিকার।

জয় শিকার।—ঘন কর্কশ গলায় রায়সাহেব হেসে উঠলো।

কুলেন্দ্র পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে, ইনি আমার আত্মীয়া মিসেস চৌধুরী, আমার অতিথি হয়ে এসেছেন।

খুব ভালো, শিকার করবেন আপনি? বন্দুক ধরতে পারেন ত?

ক্লিষ্ট হাসি হেসে শর্বরী বললে, আজ্ঞে না, আপনাদের এই জঙ্গল দেখতে এসেছি।

খুব ভালো, খুব ভালো। হাকিম সাহেবের হাত তৈরি হয়ে গেছে।

লোকটার কথার ভঙ্গীতে যেমন আরণ্যক টান তেমনি দীর্ঘ চেহারায় একটা বন্য বর্বরতা। মুখখানার উপর চার পাঁচটা বড় বড় ক্ষতচিহ্ন, সামনের দুটো দাঁত নেই—সেই কারণে হাসিটা যেন নির্বোধ। চোখ দুটো যেন ভিন্ন প্রকারের, একটা অন্যটার প্রতিবাদ। শর্বরী সন্ত্রস্ত হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। একটু আগে কুলেন্দ্রর ভয়ানক গল্পটা

এবং এই লোকটার দানবীয় আকৃতি—দুয়ে মিলে একটা আতঙ্কময় বীভৎস রস তার মনে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগলো।

শিকারের আলোচনা উঠলো। রাত বারোটার পর যাত্রা করা দরকার। এটা কৃষ্ণপক্ষ, শেষ রাত্রের দিকে জ্যোৎস্না হলেও বিশেষ অসুবিধা হবে না। কিন্তু তার আগে এই ঘরে থাকা শর্বরীর পক্ষে সম্ভব নয়। দু-তিন দিন অন্তত না থাকলে শিকারের খেলা জমবে না। কুঠিবাড়ীর ভিতর দিকে তাদের জন্য দুটো ভালো ঘর নির্দিষ্ট হোলো।

মোটরের সঙ্গে সকল প্রকার গৃহসরঞ্জাম ছিল, ত্রুটি কিছু নেই। নির্দিষ্ট ঘরে সকল বন্দোবস্ত ক'রে বসতে ঘণ্টাখানেক লাগলো। শর্বরী হুকুম দিয়ে বললে, দুটো পেট্রোমাক্স্ সমস্ত রাতই জ্বলবে। এতক্ষণ পরে এইবার সে অনেকটা নিরাপত্তা বোধ করছে। চর্বির কটুগন্ধও এতক্ষণে অনেকটা সহ্য হয়েছে, এখন আর মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে না।

এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে শর্বরীর সহসা চোখ পড়লো, ভিতর দিক থেকে পা টিপে টিপে একটি মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। এমনই সন্তর্পণে এমনই সংশয়ে যে, মনে হোলো, কিছু একটা গভীর রহস্য এই পাথরপুরীকে ঘিরে আছে।

মেয়েটি দ্রুত তার কাছে এলো এবং অকুণ্ঠ নিঃশব্দ হাসি হেসে শর্বরীর একখানা হাত ধ'রে বললে, আগেই দেখেছি—কে তুমি? হাকিমের সঙ্গে এসেছ?

শর্বরী সহসা স্তম্ভিত—এমন নাটকীয় ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে তার অনেকটা সময় গেল। কিন্তু সে ওই কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র, মেয়েটি আর দাঁড়াতে সাহস করলো না, এদিক ওদিক তাকিয়ে পাখীর মতো আবার উড়ে পালিয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে শর্বরী আবার চকিত হয়ে ভিতর মহলের দিকে

চোখ ফেরালো। গর্তের ভিতর থেকে সাপ যেমন বেরোয় তেমনি করে মেয়েটি মুখ বাড়িয়ে আবার দেখা দিল। বন্য হাসি, বন্য চোখ, বন্য মুখের শ্রী। মাথার চুল চারিদিক থেকে টেনে উপর দিকে খোঁপা বাঁধা, হাতে দুগাছা সরু বালা, চেহারায় তরুণ যৌবনের লাবণ্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে —বৈদিকযুগের ঋষিকন্যার মতো।

মেয়েটি আবার কাছে এলো, একখানা হাতে শর্বরীকে বেষ্টন ক'রে চুপি চুপি বললে, তুমি বেশ।

শর্বরী বললে, তুমি কে ভাই, নাম কি?

নাম? আমার নাম ফুলমায়া। আমি মণিপুরের মেয়ে।

দুধে আর রক্তে মেলানো তার গায়ের রং, গায়ে একটা আরণ্যক কৌমার্যের সরস গন্ধ, গোল-গাল, চোখ দুটো সবুজ নীলাভ—নিবিড়ভাবে উচ্ছ্বসিত। মসৃণ চিক্কণ দেহে কেমন যেন পুরুষোচিত বলিষ্ঠতা—ঘন কঠিন স্বাস্থ্যের এমন পরিপুষ্ট দীপ্তি আর কোথাও শর্বরীর চোখে পড়েনি। গায়ে একটা মোটা কাপড়ের জামা, পরণে গাছকোমর বাঁধা একখানা জংলা সূতী শাড়ি।

তার হাসিমুখ একটিবারও ম্লান হোলোনা। শর্বরী সাহস পেয়ে বললে, রায় সাহেব তোমার কে হন্, ফুলমায়া?

কে হন্? ফুলমায়া অনেকবার ঘাড় নেড়ে জানালো, রায় সাহেব তার কেউ হয় না।

তবে এখানে আছ কেন তুমি?

আমাকে এনেছে।

তোমার মা বাবা।

আবার সে হাসিমুখে বার বার মাথা নাড়লো অর্থাৎ জানালো, এই দুনিয়ায় তার কেউ নেই।

তোমার বিয়ে হয়েছে, ফুলমায়া?

বিয়ে!—ফুলমায়া একটু থমকে দাঁড়ালো, বললে, কই না—ব'লেই বাইরে কা'র পায়ের শব্দ শুনে উচ্চকিত কিশোরী হরিণীর মতো লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল।

চৌবে এসে ঘরে ঢুকে হাত তুলে সেলাম জানালো। দুধ, ফল ও কিছু মিষ্টান্ন এবং গরম চায়ের একটা ছোট কেটলী রাখলো পরিষ্কার জায়গায়! চৌবে ব্রাহ্মণ, তার হাতেই শর্বরীর আহারের ব্যবস্থা।

খাবারগুলি সাজিয়ে দিয়ে চৌবে প্রশ্ন করলো, মাঈজি, আপনি শিকারে যাবেন, না এখানেই থাকবেন?

শর্বরী প্রশ্ন করলো, সাহেব কোথায়?

তিনি রায় সাবকে নিয়ে খেতে বসেছেন।

আচ্ছা যাও। তাঁর সঙ্গেই কথা হবে।

চৌবে চলে গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে কুলেন্দ্র এসে ভিতরে ঢুকলো। শর্বরী অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে, আসুন হাকিম সাহেব, আপনি অতিথির প্রতি এত বিরূপ কেন? সেই বসে আছি কখন্ থেকে। কোথায় ছিলেন মধুসন্ধানে?

হাসিমুখে কুলেন্দ্র বললে, আমরা দুজনেই এখন তৃতীয় ব্যক্তির অতিথি। তোমার অসুবিধে হচ্ছে না ত?

একটুও না। ষোড়শ উপচারে এখনই আহার সেরে উঠলুম। তা ছাড়া চারিদিকে দৈত্য দানবের দল, অস্ত্রশস্ত্রের পাহারা, অবাধ আনন্দের জীবন—অসুবিধে দূরের কথা, দুশ্চিন্তা অবধি নেই।—শর্বরী হাসতে লাগলো।

কুলেন্দ্র সন্দেহক্রমে তার দিকে তাকালো। সহসা শর্বরীর এত সহাস্য উচ্ছলতা বিস্ময় বৈ কি। নিজের গাম্ভীর্যকে ডিঙিয়ে এমন রসিকতা করবার মেয়ে সে নয়। শর্বরীও তাকে জানালো

না—ফুলমায়া নামক একটি তরুণীকে সে এখানে দেখেছে। সে হাসিমুখে কেবল বললে, আচ্ছা, এই খুনিয়ার জঙ্গল তোমার খুব প্রিয়, না কুচক্রী ?

কুচক্রী বললে, খুবই প্রিয়। আর কোনো জঙ্গলে এমন নিশ্চয়তা নেই, এমন প্রাচুর্য নেই। সব ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছে করে এখানেই এসে থাকি, একটু সুযোগ পেলেই এখানে ছুটে আসি।—ও কি, তুমি অত হাসচো কেন, শর্বরী ?—সহসা যেন আঘাত খেয়ে উচ্ছ্বাসটা তার থেমে গেল।

শর্বরী বললে, এখানে তোমার শিকার ছাড়া আর কোনো আকর্ষণ নেই ?

আর কি ?

এই ধরো সাধুভাষায় যার নাম স্নেহ-মোহ-বন্ধন ?

কুলেন্দ্র এবার হেসে উঠলো। বললে, প্রচুর আছে। বাঘের চোখে ভালুকের দাঁতে, হরিণের পায়ে—আমার জীবনমরণ বাঁধা।

শর্বরী হতাশ হোলো। এমন মানুষকে বাজিয়ে দেখা ভুল, ফুলমায়ার কোনো অস্তিত্বের সন্ধানই সে রাখে না। শর্বরী অন্য কথায় ফিরে চ'লে গেল।

অকস্মাৎ একটা বড় আওয়াজে দুজনেই চমকে উঠলো। তার পরেই ঝন ঝন—ঝনাৎ শব্দে হুড়মুড় ক'রে কোথায় কি গড়িয়ে গেল। কুলেন্দ্র ছুটে বাইরে এসে ডাকলো, রায় সাহেব ?

সাড়া পাওয়া গেল না। যেন চারিদিকের নিঃশব্দ প্রেতপুরীর অতল গর্ভে তার গলার আওয়াজ ডুবে গেল। অজানা সন্ত্রাসে শর্বরী ভিতরে ব'সে কণ্টকিত হয়ে উঠলো। এ বাড়ীতে প্রায়ই জানোয়ার ঢোকে এ গল্প সে শুনেছিল।

আলীজান্ ?—কুলেন্দ্র আবার হাঁক দিল।

তারও কোন সাড়া নেই। সে আর চৌবে কোথায় বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কুলেন্দ্রকে এক এক পা অগ্রসর হ'তে দেখে শর্বরী দ্রুতপদে বাইরে এলো। বললে, কোথা যাও অন্ধকারে?—এই বলে সেও পিছনে পিছনে এলো।

প্রকাণ্ড কুঠিবাড়ী—কোথায় তার সীমানা, কোথায় পাঁচিল, কোন্ পথ কোথায় নিয়ে যায়—অন্ধকারে ঠাহর করার উপায় নেই। কুলেন্দ্র কিছুটা জানতো। সে এঁকে বেঁকে হাতড়ে হাতড়ে চললো শর্বরীর আগে আগে। শীতের তীব্র রাত ঝিল্লীর রবে মুখরিত। সেই আওয়াজটার পর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

আলোর একটা শীর্ণ রেখা পাওয়া গেল। কিন্তু সেই আলোর পথ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল আর দেবদারুর গুড়ি দিয়ে আটকানো। অনেক সময় জন্তু জানোয়ার এই কুঠিবাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরে গরু-ছাগল ইত্যাদি নিয়ে পালায়। কয়েকদিন আগে এই বাড়ী থেকে একটা চিতাবাঘ একজন জংলীর কচি ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়েছে। তাদেরই পথ অবরোধ করার জন্য এই ব্যবস্থা। ওরা দুজনে এগিয়ে এসে বরাবর বেড়ার পাশে দাঁড়ালো। তারই ফাঁক দিয়ে ভিতরটা স্পষ্ট দেখা যায়।

ভিতর দিকে চোখ পড়তেই কুলেন্দ্র বিস্ময়-স্তব্ধ হয়ে গেল। এই কুঠিবাড়ীতে স্ত্রীলোকের অস্তিত্ব সে কল্পনাও করে নি। আগে সে বাইরের দিকে এসে থাকতো এবং সেখান থেকেই চলে যেতো—অন্দরমহলে আসা এই তার প্রথম। কত দিন কত রাত্রি সে কাটিয়েছে রায়সাহেবের সঙ্গে; দেখেছে অরুগ্ন হিংস্রতা তার স্বভাবে আলাপে বলিষ্ঠ বর্বরতা, ব্যবহারে সহজ স্বভাবিকতা। স্নেহ, মোহ, দাক্ষিণ্য—এসব তার কাছে হাসির কথা, স্বপ্নের অগোচর। হত্যার কাহিনীতে, রক্তপাতের কথায়, মারণাস্ত্রের আলাপে, দুরন্তপনা ও দুঃসাহসের

গল্পে—কুলেন্দ্রর অপেক্ষা অনেক বেশি তার উল্লাস। কোনদিন কোনো কারণেই একথা আবিষ্কৃত হয় নি নারীর সান্নিধ্যে সে বাস করে।

কুলেন্দ্র সেই অন্ধকারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, আশ্চর্য!

হাসিমুখে শর্বরী বললে, আশ্চর্য কেন?

ঠিক বোঝাতে পারবো না। তুমি হাসচো যে?

ভূত দেখেও মানুষ এত চমকায় না, তাই হাসচি।

তা হবে।—ব'লে কুলেন্দ্র বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে পুনরায় বললে মেয়েটি কে তাই ভাবছি। পঞ্চাশ বছর বয়স হ'তে চললো—রায়সাহেব ত বিয়ে করে নি।

শর্বরী বললে, গল্পে শোনা যায় দস্যুসর্দারের পালিত কন্যা—এও হয়ত তাই।

অসম্ভব, আমি তা'হলে নিশ্চয় জানতে পারতুম।

পৃথিবীতে আরো অনেক রহস্য আছে যা তুমি আজো জানতে পারোনি, কুচক্রী।

কথাটার ভিতর দিয়ে শর্বরীর একটা অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কুলেন্দ্র তার জবাব দিতে পারতো না।

৫

রায়সাহেব!

কে, হাকিম সাহেব নাকি? আলীজান, সাব্‌কো লাও অন্দরমে! আসুন মশায়।

আলীজান্ হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে বেড়ার পাশে দরজার দিকে এলো। কুলেন্দ্রর সঙ্গে শর্বরী এসে ঢুকলো রায়সাহেবের মহলে। ফুলমায়া দাঁড়িয়েছিল, এবার সে আর পালালো না—কেবল অতিথিদের দেখে তার একমুখ দুষ্ট হাসি উচ্ছলিত হয়ে উঠলো।

ভালুকের লোমযুক্ত বড় একখানা চামড়া পেতে দিয়ে রায়সাহেব দুজনকে অভ্যর্থনা করে বললে, মেয়েছেলের কাজ, কিন্তু দেখেছেন ত, ওই পাজিটা এসব কিছুতেই করবে না। ওদিকে লোহার হাঁড়াগুলো সব ফেলে দিলে দুমদাম ক'রে।

হঠাৎ তার কাঁধের কাছটা লক্ষ্য ক'রে কুলেন্দ্র প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, আপনার ওখানে অত রক্ত পড়ছে কেন রায়সাহেব ?

শর্বরীও সেই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলো।

রায়সাহেবের কোনো ব্যস্ততা দেখা গেল না। ধীরে সুস্থে কাঁচা তামাকের পাইপ ধরিয়ে সহাস্যমুখে বললে, ওই বাঘিনীর কাণ্ড, ছুরিখানা দেখতে দেখতে বসিয়ে দিলে, একটু হাতও কাঁপলো না।

সে কি ?—শর্বরী যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

ফুলমায়া আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না, দ্রুত এসে রায়সাহেবের মাথার চুলের মুঠি দুই হাতে শক্ত ক'রে নেড়ে বললে, আর তুমি—তুমি যে বললে ছুরি বসাতে ?—এই ব'লে সে পিঠের পাশে মুখ লুকিয়ে ব'সে পড়লো।

দেখলেন ত মিসেস চৌধুরী—আমি বলেছি ব'লেই—আমি যদি খুন করতে বলতুম, পোড়ারমুখী ?

হরিণী যেমন গাছের গায়ে গা ঘষে, তেমনি ক'রে ফুলমায়া রায়-সাহেবের পিঠে মুখ ঘ'সে বললে, করতুম ত।

কুলেন্দ্রর এতক্ষণে চেতনা ফিরলো। বললে, একটা ব্যাণ্ডেজ ক'রে ফেলুন ?

রায়সাহেব অসীম উপেক্ষায় বললেন, থাকগে, দেবো একটা ঔষধ। এবার ত আমাদের যাবার সময় হোলো, হাকিম সাহেব ?

কিন্তু আপনি ওই সাংঘাতিক ক্ষত নিয়ে—?

সাংঘাতিক ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! মিসেস চৌধুরী বোধ হয়

জানেন না, বাঘের আঁচড়ের দাগ আমার মুখে—কিন্তু তবু আমাকে আক্রমণ করতে গিয়ে মারা পড়েছিল আমার হাতে। হাঃ হাঃ হাঃ। —রায় সাহেবের উচ্চ কণ্ঠের কর্কশ হাসিতে ঘর ভ'রে উঠলো। হাসি দেখলে ভয় করে।

ফুলমায়া দ্রুতপদে উঠে দাঁড়ালো, তারপর আলোটা এনে রায়-সাহেবের মুখের কাছে ধ'রে বললে, আর এই দেখুন এই চোখটা—এটা কাঁচের চোখ। ভালুকের নখে, এই চোখটা যায় সেবার। ইঃ, আবার হাসি হচ্ছে মিটমিট ক'রে!

শর্বরী ভয়ার্ত দৃষ্টিতে রায়সাহেবের ক্ষতবিক্ষত মুখখানার দিকে তাকালো। ঘন ঠাসা সেই দৈত্যের মুখ। মন হোলো জানোয়ারের থাবাতেও নয়, মানুষের হাতেও নয়—ঈশ্বর ভিন্ন আর কারো হাতে এর মৃত্যু হবে না।

কিন্তু ওই আলোটুকুতে এদিক থেকে কুলেন্দ্র দেখে নিল ফুলমায়াকে। বাঙালী মেয়ের মুখ সে নয়। পীতজাতির বংশানুক্রমিক ধারায় ভেসে-আসা অনেকটা যেন বর্মীমেয়ের সেই মুখ। নাকটি দাবানো, দুদিকে দুটো গোল সবুজ চোখ। জড়তা সেই ভঙ্গীতে নেই—উদ্ধত, সহজ, সহাস্য। গায়ের রং অত্যুজ্জ্বল, নধর—সর্বশরীরে অল্প বয়সের কাঠিন্য। এত শীত, কিন্তু তার কপাল বেয়ে নেমেছে ঘামের ফোঁটা—সে যেন তার প্রাণের উত্তপ্ত তারুণ্য নেংড়ানো রস। কুলেন্দ্র অবাক হ'য়ে রইলো।

সেই রাত শর্বরীর চোখে নিবিড় হ'য়ে এলো ঘন নেশার নিদ্রালুতায়। মোটর ছুটলো দক্ষিণ-পশ্চিম পথে! ভিতরে কম্বল ও গরম কাপড়ের মধ্যে ডুব দিয়ে সে ব'সে রইলো তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বস্তিতে। হিম তীব্রতায় শিথিল আড়ষ্ট, অথচ এক প্রকার মধুর আনন্দের ক্লান্তিতে তার দেহ-মন সকল গ্রন্থি খুলে দিয়ে চোখ বুজে রইলো। চারিদিকের

অমা-রজনীর মধ্যে চোখ খুলে থাকা আর বন্ধ করে রাখায় অন্ধকারের কোনো পার্থক্য নেই। তার পাশে একটা চিরদুর্জ্ঞেয় পুরুষ, যাকে জীবন-যৌবন অপব্যয় করেও জানা গেল না। কুলেন্দ্র তার কেউ নয়—কেবল চোখে দেখা, কেবল চিঠিপত্রের সম্পর্ক। মনে পড়ে তার প্রথম তারুণ্যে চোখ মেলেছিল এই মানুষটির দিকে। ভদ্র, নম্র, সপ্রতিভ, উচ্চশিক্ষিত যুবক কুলেন্দ্র—তার রূপ, তার যশ, তার স্বাস্থ্যের খ্যাতি। যতদূর মনে পড়ে কুলেন্দ্র তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল কিন্তু পারিবারিক চক্রান্তে সম্ভব হয়নি। কুলেন্দ্র নিঃশব্দে চলে গেল—উচ্চকণ্ঠে প্রণয় ঘোষণা করেনি, অভিমান জানায় নি, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেনি। পুরুষের সর্বংসহ শক্তি নিয়ে সে নিঃশব্দে চোখের আড়ালে চলে গেল। তারপর এই গত তিন বছর আগে অবধি বহুবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, শর্বরী তার বিয়ের এক বছর বাদে সিঁদুর মুছে ফিরে এসেছিল। স্বামীর সম্পত্তি তার নামে দানপত্র করা, ঐশ্বর্যের অভাব তার কখনও ঘটেনি। এই হোলো তাদের মোটামুটি ইতিহাস।

মোটরের গতি মন্থর হোলো। ভিতরে চারিটি মানুষ, কারো মুখে কথা নেই। অরণ্যের অন্তরলোকে মোটর প্রবেশ করেছে। অসাড় অদ্ভুত একটা পৃথিবী। প্রকৃতির নির্দেশে নিঃশব্দে একটা প্রকাণ্ড সংসার একটা বিরাট পরিবার যন্ত্রচালিতের ন্যায় জীবন নির্বাহ ক'রে চলেছে। চোখে দেখা যাচ্ছে না, কানে কোনো কলরব আসছে না—তবু পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সরীসৃপ মিলে কোটি কোটি প্রাণীর একটা একতাবদ্ধ পরিবার চলেছে সুশৃঙ্খলায়। সেই বিপুল ও বিশাল অন্ধকার জগতের অপরূপ রহস্যময়তার দিকে চেয়ে শর্বরী পাথরের মতো স্থির হয়ে রইলো।

ভিতরে কোথায় যেন গিয়ে রায়সাহেবের নিঃশব্দ সংকেতে চৌবে

গাড়ী থামালো। সহসা যেন ওরা জানোয়ারের গন্ধ পেয়েছে। রুদ্ধকণ্ঠ রুদ্ধশ্বাস তুইজন শিকারী—রায়সাহেব ও কুচক্রী—তুইজনের উৎকর্ণ জ্বলন্ত চক্ষুর দিকে তাকালে ভয় করে। ওরা যেন এই অরণ্যের ভয়াবহতার প্রতীক্। না, জানোয়ার নয়, চোখের ভুল।

দ্বিতীয় সংকেতে আবার গাড়ী চললো। তুটো হেডলাইটের তীব্র রশ্মি বনস্পতিদলের ভিতরে বিদ্ধ ক'রে মোটরখানা নানা বাঁকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। যেন এই মোটরখানাই প্রাগৈতিহাসিক কালের কোনো একটা অতিকায় জানোয়ারের ন্যায় এই অরণ্যে এসে ঢুকেছে—ক্ষুধার খাদ্যের আশায় জ্বলন্তচক্ষু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারিদিক সন্ধান করছে। তারই বিভীষিকায় শ্বাপদের দল উৎকণ্ঠিত আতঙ্কে আত্মগোপন করেছে।

মোটর আবার থামলো। কোথায় তারা এসে পড়েছে কিছুই জানা যায় না। একটা নীরেট, অন্ধ, ঘন আচ্ছাদনে তাদের ঘিরলো। উপরের আকাশ অরণ্যের চন্দ্রাতপে ঢাকা, দিকনির্দেশ কোথাও নেই, অবলুপ্ত—চৌবে হেডলাইট বন্ধ ক'রে দিল।

অসাড় অরণ্য, ভিতরে তার অনন্ত অব্যাহত প্রাণ ধুকধুক করছে। শর্বরীর জীবনও এই—তারও অসাড়তার অন্তঃস্থলে কান পেতে থাকলে শোনা যায় একটা অশ্রান্ত প্রাণকল্লোল। তারও দেহের কোটি কোটি শিরা উপশিরা, অন্ত্রতন্ত্র, স্নায়ুমণ্ডলীর অরণ্যে-অরণ্যে অশুদ্ধ মনের নানা প্রবৃত্তির অগণ্য জানোয়ার অহর্নিশি চলা ফেরা করে সন্দেহ নেই—তবু তার সমস্তকে ঘিরে রয়েছে তার চিরজাগ্রত প্রাণদেবতা—ব্যর্থতায়, বিচ্ছেদে, ভগ্নবাসনায়, চির-উপবাসে সে শীর্ণ। আজ তার এই অকরুণ হিংস্র সন্ন্যাসকে মানবিক কোমলতায় রূপান্তরিত করার আর উপায় নেই। কিন্তু কেন নেই?—শর্বরীর গলার ভিতর থেকে যেন একটা প্রবল রক্ততরঙ্গ আর্তনাদ ক'রে উঠলো—কেন নেই? কার

অপরাধে ? বঞ্চনার দুঃখ স'য়ে থাকা বঞ্চিতের পক্ষে কি এত বড় গৌরব ? মালিন্য-লজ্জার আশঙ্কায় অধিকারকে বিসর্জন দিয়ে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নেওয়াই কি এত বড় পৌরুষ ?

শর্বরীর অসহায় নিরুপায় দুই চক্ষু বেয়ে সহসা জলধারা গড়িয়ে এলো। কিন্তু সেই অশ্রু তার নিতান্তই একার, পাশে যে-পুরুষ রইলো দুস্তর দুরতিক্রম্য ব্যবধানের পারে, এদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই, শর্বরীর অস্তিত্ব অবধি সে বিস্মৃত। অরণ্যের দিকে একাগ্র লক্ষ্যে সে আত্মবিস্মৃত রাইফেলটা হাতে নিয়ে উৎকর্ণ হিংস্রতায় তার দুই চোখ ধকধক করে জ্বলছে।

তবু আজকের এই বিচিত্র স্বাদ অক্ষয় হয়ে রইলো তার জীবনে। ব্যথা, বিক্ষোভ, বঞ্চনা অতিক্রম ক'রেও আজকের এই আরণ্যক আদিমতা শর্বরীর পরিশ্রান্ত হৃদয়কে আনন্দিত ক'রে তুললো। বন্য জীবনের এমন সুন্দর চেহারা সামাজিক জীবনে নেই। বনস্পতির প্রাচীন শিকড়ের স্তবকে স্তবকে, কোটরে গহ্বরে, মৃত্তিকার স্তরে স্তরে, কীটপতঙ্গের চলাফেরায়, পাখীর ডানার শব্দে, অপরিচিত অনৈসর্গিক শব্দে—প্রাণতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। সময় ও দূরত্বের চেতনা তার মনে আর নেই। প্রতিটি নিবিড় চৈতন্যময় মুহূর্তের উপর দাঁড়িয়ে অনন্তকাল যেন থরথর ক'রে কাঁপছে।

শর্বরী চোখ বুজে রইলো। তার জীবন-যৌবন-মরণ, তার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, তার ইহকাল-পরকাল-চিরকাল—সমস্তটা একাকার ও নিরাকার হয়ে সেই অন্ধকার অরণ্যগহ্বরের মুখে সর্বনাশা দোলায় দুলতে লাগলো।

তারা ফিরলো, রাত তখন প্রায় চারটে বাজে। আজ শিকার হ'তে পারেনি, রোজ শিকার পাওয়া সম্ভব নয়। রায়সাহেবের গুলীতে একটা বড় হরিণ মারা পড়েছে, কুলেন্দ্রের গুলী খেয়ে একটা লেপার্ড

পালিয়েছে এই মাত্র। কিন্তু সেই নিদারুণ উত্তেজনার পর শর্বরীর শরীর অবসন্ন হয়ে এসেছে।

রায়সাহেব চ'লে গেল নিজের মহলে! চৌবে কম্বল মুড়ি দিয়ে মোটরের মধ্যেই শুয়ে পড়লো। এদিকে আলীজান্ দুই কাম্‌রায় দরজা খুলে দিয়ে নিজের ডেরার দিকে নিরুদ্দেশ হোলো। এত শীতে অতি কষ্টেই ভদ্রতা রক্ষা করা চলে।

জবাফুলের মতো কুলেন্দ্রর দুই চোখ রাঙা, ক্লান্তি ও ঘুমে তার আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। টলতে টলতে এসে সে বললে, কই, শোবো কোথায়?

তা আমি কি জানি?—শর্বরী হাসিমুখে বললে।

জানো না? বেশ যা হোক—ও, এটা দেখি তোমার ঘর।

আমার ঘরটা দেখিয়ে দাও ত?—দেয়াল ধ'রে ধ'রে কুলেন্দ্র অগ্রসর হোলো।

দাঁড়াও, বোকার মতন হেঁটো না, আগে আলো ধরি।—আলোটা নিয়ে শর্বরী তাকে পাশের ঘরে এনে বললে, ওই ত তোমার বিছানা, শুয়ে পড়ো। নাও, আগে দরজা বন্ধ করো। ও কি দাঁড়ালে যে?

কুলেন্দ্র সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, তুমি যে একা ঘরে শোবে, ভয় করবে না, শর্বরী?

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শর্বরী বললে, না ভয় কি? তুমি দরজা দাও।—এই ব'লে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কুলেন্দ্রর প্রশ্ন ও ঔৎসুক্য কিছু বিস্ময়ের কারণ বৈ কি?

ফুলমায়ার চিত্রটা জটিল হয়ে হঠাৎ কুলেন্দ্রর মস্তিষ্কে যেন পাক খেয়ে উঠলো। বয়স তার অনেক, যৌবনের প্রান্তসীমায় সে এসে পৌঁছেচে—তার কি মনে হোলো, ঘুমের জড়তা কাটিয়ে সে এক এক পা ক'রে শর্বরীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো।

শীতের তুহিন শীতল রাত, নিথর, নিস্পন্দ। সেই কুঠি-বাড়ীর কোন অংশে একটা হত্যাকাণ্ড হয়ে গেলেও তখন আর কেউ টের পাবে না। তার মৃদু পদসঞ্চারণ দেখে শর্বরী একটু শঙ্কিত হয়ে বললে, আবার এলে যে? ঘুমে যে টলছিলে তখন?

কুলেন্দ্র বললে, হ্যাঁ টলছিলুম সত্যি, কিন্তু সে-ঘুম ভেঙে গেছে। আচ্ছা, শর্বরী, ভূতের ভয়ও কি তোমার নেই?

শর্বরী উঠে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালো। বললে, ভূতের চেয়ে শিকারীরা ভয়ঙ্কর।

কেন?

কাল উত্তর দেবো, আজ ঘুমোওগে। যাও, রাত আর বাকি নেই।

এই যাই।—ব'লে কুলেন্দ্র তবুও দাঁড়িয়ে রইলো এবং বললে, বন্দুকগুলো তোমার ঘরে রইলো, সাবধান, গুলীভরা আছে, হাত দিয়ো না যেন।

শর্বরী বললে, যথা আজ্ঞা, এবার ঘুমোওগে দেখি!

দরজার খুঁটীর উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে কুলেন্দ্র বললে, গল্প করার ইচ্ছেয় ঘুম চ'লে গেল, কিন্তু তুমি যেন আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচো।

এই চেহারা কুলেন্দ্রর সহজ নয়, স্বাভাবিক নয়। কণ্ঠস্বর তার মাদকতায় জরজর, চোখ দুটো বিলোল, বলিষ্ঠ দেহে যেন তার বিষক্রিয়া সুরু হয়েছে এমনি শিথিল, টলটলে। শর্বরী ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠে বলতে বাধ্য হোলো, ছেলেমানুষী করো না কুচক্রী, এত রাতে আর গল্প নয়।

তুমি বিরক্ত হচ্ছ?—কুলেন্দ্র একটু থতিয়ে প্রশ্ন করলো।

না। ভীত হচ্ছি, পাছে নিজের কাছে নিজের মাথা তুমি হেঁট করো, কুচক্রী। যাও, শুয়ে পড়োগে।

কুলেন্দ্র নতমস্তকে চ'লে গেল।

শর্বরী গিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল, তখনও তার হাত কাঁপছে, বুক টিপটিপ করছে। এমন একটা নাটকের অবতারণায় যেন তার সর্বশরীর কুণ্ঠায় আর অস্বস্তিতে কিলবিল করতে লাগলো। একটি মুহূর্তের [illegible] [illegible] সেই মুহূর্তটি এমনি অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়জনক যে, শর্বরীর চোখের সম্মুখে সারা পৃথিবী প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ওলোট পালোট হয়ে গেল। মনে হোলো, কুলেন্দ্রর স্বভাবের উপরিভাগে হিমালয়োচিত মহিমা, ভিতরে একটা অনাবিষ্কৃত আগ্নেয়- গিরিগহ্বর— আজ সেটা সহসা উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল।

শর্বরীর চোখে বাকি রাতটুকুর মধ্যে আর ঘুম এলো না। ঘুমোতে তার যেন ভয় হোলো, অস্বস্তিতে কেবলই পাশ বদলাতে লাগলো। কখন রাত পুইয়ে প্রভাত হয়ে গেছে সে বুঝতে পারেনি। আলোটা তখনও জ্বলছে, সেই আলো পেরিয়ে কুণ্ঠিত প্রভাতের মলিন জ্যোতি নেই সুড়ঙ্গসদৃশ ঘরের কোনো ছিদ্র দিয়েই এসে পৌছয় নি।

সময় হিসাব ক'রে এক সময় শর্বরী গিয়ে অতি সন্তর্পণে দরজাটা খুললো।

বাহিরে জ্যোতির্ময় প্রভাতের রাজবেশ তার চোখে পড়লো। ধূসর হিমেল কুয়াসার স্তবক তখনও অরণ্যশীর্ষে জড়ানো—তারই উপর তরুণ সূর্যের চিক্কণ সোনার অলঙ্কার। আকাশ নীলাভ, রঙীন। পাখীর কলকাকলীতে খুনিয়ার অরণ্যে-অরণ্যে বন্দনাসভা বসেছে। স্নিগ্ধ হাওয়ায় শর্বরীর জাগরণ-শ্রান্ত দুই চক্ষু মধুরের আবেশে ভ'রে উঠলো। আলোটা নিবিয়ে গায়ে শালখানা জড়িয়ে জুতোটা পায়ে দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো!

রহস্যে, আতঙ্কে, অস্পষ্টতার এই কুঠিবাড়ী গত রাত্রিতে তার কাছে

ছিল বিভীষিকা, আজ তার কোনো চিহ্নই নেই। বাড়ীটা প্রকাণ্ড, একতলা, তিনমহলা। কত যে প্রাচীন, তার হদিস পাওয়া যায় না। কোনো ভগ্নাংশ থেকে বট ও অশ্বত্থ বিশাল হয়ে উঠে আবার ঝুরি নামিয়েছে। সম্মুখের প্রাঙ্গণটা বিস্তৃত, তার বাইরে থেকেই জঙ্গলের পথ—নিকটেই সুউচ্চ পাহাড়ের আকাশস্পর্শী প্রাচীর পূব থেকে পশ্চিম দিকে চ'লে গেছে। অরণ্য নিস্তব্ধ, মানুষের চিহ্ন অবধি কোথাও নেই।

পায়চারি করতে করতে কুলেন্দ্রের ঘরের দিকে চোখ পড়তেই শর্বরী শিউরে উঠলো। ঘরের দরজা খোলা। দ্রুতপদে গিয়ে ঘরে উঁকি মেরে সে দেখলো, কুলেন্দ্র বিছানায় অগাধে নিদ্রিত। দরজা বন্ধ না ক'রেই সে কাল শুয়ে পড়েছিল। এ যে কত বড় সাংঘাতিক ভুল সেই কথা ভেবে শর্বরীর গা কেঁপে উঠলো। কুলেন্দ্রকে সে ডাকলো না, নিজের মনেই স'রে গিয়ে আবার বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলো।

চারিদিকে গাছের জটলা পার হয়ে সোনাবরণ রাঙা রোদ প্রাঙ্গণে এসে নামলো। শর্বরী এক সময় মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে উচ্চকিত হয়ে পথের দিকে তাকালো। দেখলো,—দেখে অবাক হয়ে গেল—রায় সাহেবের কাঁধে চ'ড়ে গত রাত্রির সেই রহস্যময়ী ফুলমায়া কলহাসিতে সারা বন মুখরিত ক'রে তার দিকে এগিয়ে আসছে। অত বড় মেয়ে আপন দেহের সম্বন্ধে কোনো কুণ্ঠাই মানে না। উভয়ের উচ্ছৃঙ্খল আলাপে সমস্ত অরণ্য প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

কাছে এসে রায়সাহেবের কাঁধের উপর থেকে ফুলমায়া একেবারে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে হেসে উঠলো। রায়সাহেব বললে, আপনি খুব সকাল সকাল ওঠেন ত দেখছি?

শর্বরী বললে, আপনারা ত আরো আগে।

এই পাজিটার জন্যে—রায়সাহেব বললে, ভোর রাত্তিরে উঠে পালায়

জঙ্গলের দিকে। আমি টের পেয়ে ছুটি পিছু পিছু, বিপদ একটা ঘটতে পারে ত?

আপনার ফুলমায়া ত ভারি দুরন্ত দেখছি।

ফুলমায়া উভয়ের কথা মন দিয়ে শুনে ফস্ ক'রে বললে, আমার মতন ও কিন্তু গাছে চড়তে পারে না। একদিন প'ড়ে গেছি গাছ থেকে···মাথা ফুটে কী রক্ত!

রায়সাহেব সস্নেহে তার দিকে চেয়ে বললে, আমার পায়ের শিকল! দেখছেন ত?

স্নিগ্ধ কচি কৌমার্য—পরিশ্রমে এত শীতেও ফুলমায়ার মুখখানি রাঙা টসটস করছে। বড় লোভ হোলো তাকে কাছে টেনে নিতে, কিন্তু রায়সাহেবের ডাকাতী চেহারা দেখে শর্বরীর যেন কিছুতেই হাত পা আসে না, এমন একটা দীর্ঘাকার পুরুষ সে জীবনে দেখেনি।

ফুলমায়া ভিতরে চ'লে গেল। শর্বরী বললে, আপনাদের এখানে এত চামড়ার গন্ধ কেন রায়সাহেব?

ওঃ—আপনি ভেতরে বুঝি দেখেন নি?—রায়সাহেব বললে, ও কাজটার ভার ওই মেয়েটার হাতে—চামড়া পোড়ায়, চর্বি গলায়, কাটাকুটি করে—তারপর বাইরে থেকে দু-চার জন লোক এনে ট্যানিং করাই। মেয়েটা খাটতে পারে খুব।

—এইটাই কি আপনার কারবার?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

শর্বরী হেসে বললে, ও মেয়েটি বুঝি আপনার—

রায়সাহেব একবার চারিদিক তাকালো। বললে, মিসেস চৌধুরী, আপনাকে ঠিক সেকথা বোঝাতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, শিশুকালে ওকে আমি কুড়িয়ে এনেছি মণিপুরের এক পাহাড়ী গাঁও থেকে, ওর মা-বাপ দিল আমার হাতে।

কেন ?

ওর মা মণিপুরী, বাবা বাঙ্গালী—এই কারণে। সেই থেকে রয়ে গেল আমার সঙ্গে। ওকে বড় ক'রে তুললুম বনে-জঙ্গলে। আমার সঙ্গে শিকারে যায়, গুলী যোগায়, বন্দুক ঝাড়ে মোছে। ঘরে এসে রুটি বানায়, চামড়া কাটে, বাকেটে ক'রে জল তোলে মাটির তলা থেকে, আলীজানের সঙ্গে লাঠি খেলা শেখে। কিন্তু এখন বড় হোলো মেয়েটা,—উনিশ বছরের।

ইতিহাসটুকু ছোট, কিন্তু বিচিত্র! রায়সাহেবের কণ্ঠের ভিতর থেকে যে স্নেহটুকু উচ্ছলিত হোলো সেটুকুও দুর্লভ। এখানে সমাজ-চৈতন্যটা হাস্যকর, জনরব মূল্যহীন। রাজবেশপরা ভালোবাসা ব'লে একে অভিহিত করলে হয়ত ভুল হবে, কিন্তু এর মধ্যে কেমন একটা আরণ্যক ও বর্বর মোহবন্ধনের অরুগ্নতা শর্বরীর মস্তিষ্কে নেশার মতো পেয়ে বসলো। তার নারীর মন নিশ্চিত নিঃসন্দেহ হ'তে পারলো না। এদের সত্য সম্পর্কটা কী। প্রকৃত ভালোবাসার সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন; তার স্পষ্ট চেহারাটা চোখে পড়ে না। যে কোনো আকারে, গঠনে, সংযোগে ও সম্পর্কে যখনই কোনো সংবেদন ও অনুরাগের যন্ত্রণা রক্তাক্ত ও রঙীন হয়ে উঠেছে, শর্বরী তাকে ব'লে এসেছে প্রণয়। তার নিজের হৃদয়টা কেমন যেন নিরুপায়, মন বুভুক্ষিত, ব্যর্থতায় বিবাদে তার সমস্ত প্রাণ নিরাশায় ধূসর—কিন্তু আজ যদি সে মনে করে রায়-সাহেব ও ফুলমায়ার সম্পর্কটা পিতামাতার বাৎসল্যে, বন্ধুর প্রীতিতে, সহোদরের কল্যাণবোধে, প্রণয়ীর অনুরাগরঞ্জনে অনির্বচনীয় মাধুর্যে মনোহর—তবে কি তার এত বড় ভুল হবে ?

শর্বরী হাসিমুখে বললে, আপনার কোমরে বন্দুক কি সব সময় ঝোলানো থাকে ?

ওই পাজিটার জন্যে, ভোর বেলা উঠে পালায় বনের দিকে। সেদিন

শুনলুম একটা ম্যান-ঈটার' এসেছে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে—রায়সাহেব বললে, এদিকে জানোয়ারের উৎপাত বেশি, পাহাড়ী-জঙ্গল কিনা—গ্রাম এদিকে নেই।

শর্বরী বললে, আপনার কাঁধের রক্তটা কিন্তু এখনো শুকোয়নি, দেখেছেন ?

হ্যাঁ, দেখছি বটে।—আরে, ও কি, হাকিমের দরজা খোলা কেন ?

শর্বরী বললে, হ্যাঁ, আমিও ভয় পেয়েছিলুম দেখে। এতই ঘুমের নেশা যে দরজা বন্ধ করতে উনি ভুলে গেছেন।

রায়সাহেব গম্ভীর ভীতকণ্ঠে বললে, এ কাজ ভালো হয়নি। বুঝলেন মিসেস চৌধুরী, হাকিমের একটু মাথার দোষ আছে।

রায়সাহেবের দিকে তাকিয়ে শর্বরী বললে, আপনার একথার মানে ?

ওর মনে আছে একটা ভূত, ওকে স্থির থাকতে দেয় না। জানোয়ারের রক্ত না দেখলে রাতে হাকিমের ঘুম হয় না।

শর্বরী বললে, কিন্তু জানোয়ার ত সবদিন পাওয়া যায় না।

রায়সাহেব বললে, কিছু না পাওয়া গেলেও একটা 'শিয়াল' কি একটা 'খারা'—তাই মেরেই ও এসে ঘুমোয়। বয়স কম কিনা তাই রক্তের ওপর লোভ। আপনি জানেন, ওর আপনার মানুষ কে কে আছেন ?

ভাই বোনেরা আছেন, পিসিরা আছেন। উনি ত আর দেশে যেতে চান না।

রায়সাহেব তার জংলী বাংলায় বললে, ইস, বড় একটা জীবন··· ওকে যদি কেউ ফিরিয়ে নিতে পারে—মানে কি-না, জঙ্গলে নষ্ট হবার ভয় !

কেন বলুন ত ?—শর্বরীর চোখের তারা দুটো যেন বেরিয়ে আসতে চাইলো।

রায়সাহেব চিন্তিত হয়ে বললে, আমাকে না জানিয়ে হাকিম যায় অন্য জঙ্গলে মহম্মদ ওসমানকে নিয়ে। সে মাতাল, সে কি পারবে ওকে ঠিক সামলাতে? আচ্ছা মিসেস চৌধুরী, আপনারা বলতে পারেন হাকিমের হাত মাঝে মাঝে কাঁপে কেন?

ভগ্ন রুদ্ধকণ্ঠে শর্বরী বললে, আমি ত জানিনে, রায়সাহেব!

আমিও তাই [illegible] একপ্রকার মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, ওর এই বয়সে হাত কাঁপে কেন। বিপদ ঘটতে পারে—বুঝলেন না?—বলতে বলতে লোকটা ভিতর দিকে চ'লে গেল।

স্নান সেরে শর্বরী যখন ফিরে এলো তখন বেশ বেলা হয়েছে। কুলেন্দ্র তখনো ওঠেনি। রাত্রে তার অনিদ্রার রোগ, দিনের বেলায় অঘোরে সে ঘুমোয়। পায়ে তার মোজা জুতো, গায়ে চামড়ার কোট —সেগুলি ছেড়ে শোবারও সময় তার হয়নি। মুখের ভিতর থেকে তার কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ নির্গত হচ্ছে। সে তার গভীর নিদ্রার নাসিকাধ্বনি নয়, সে যেন একটা আহত জন্তুর মরণোন্মুখ ক্ষীণ আর্তনাদ! শর্বরী সভয়ে একবার তাকে ডাকলো, কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। কিয়ৎক্ষণ বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সে আবার বাইরে বেরিয়ে এলো। এর কোন সমাধান নেই, কোন প্রতিবিধান নেই—শর্বরী ভাবলো, অতঃপর তার এখানে থাকা মিথ্যা, শোভন সৌজন্য রক্ষা ক'রে এখন বিদায় নিয়ে চ'লে যাওয়াই তার পক্ষে সঙ্গত।

কিন্তু বিদায় নেবার কথায় হঠাৎ একটা কান্না তার দুই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এলো। এর পর চিঠিপত্র আনাগোনার আর কোন অর্থ রইলো না। কুলেন্দ্রর জীবন ধ্বংসমুখী, আগুন নিয়ে তার খেলা, জীবরক্ত নিয়ে তার মতামাতি—তার জীবনে আর কোনো নতুন আশার চেহারা নেই, সুতরাং চিঠিপত্র লেখালেখি তার পক্ষে উৎপীড়ন।

অতএব, এবার ফিরে গিয়ে দুজনের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা বিস্মৃতির যবনিকা ফেলে দেওয়াই হবে বিধিসঙ্গত, সেই হবে সর্বোত্তম বিচার। তবু শর্বরীর চোখে জল এলো এই কথা মনে ক'রে যে, কাছে থেকে যে-যন্ত্রণা সে সহ্য করছে, কলিকাতার নিরবচ্ছিন্ন একাকীত্বের ভিতর ব'সে এই যন্ত্রণাটুকুর স্মৃতিও তার মধুর লাগবে। বয়সটা তার অপরাহ্ণের দিকে গড়িয়ে গেছে, উচ্ছ্বাস এখন তার সংহত, প্রণয়ের নামে সামাজিক চৌর্যবৃত্তির খেলা এখন অনেকটা সম্ভ্রম-হানিকর। কিন্তু একথা সত্য—আজ কুলেন্দ্রর কাছাকাছি থাকায় যতখানি গভীর দুঃখ-দহন, ছেড়ে যাওয়াও ঠিক ততখানি বেদনাদায়ক।

কুলেন্দ্র উঠলো অনেক বেলায়, প্রায় মধ্যাহ্নে। সময়ের হিসাবটা চৌবের জানা ছিল, সে কাছে এসে দাঁড়ালো। কুলেন্দ্রর চোখ দুটো ক্লান্ত। তার মুখের চেহারায় গতরাত্রির উত্তেজনাজনিত অবসাদ অপেক্ষা বার্ধক্যের কেমন একটা গভীর ছায়া লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় তার আত্মার উপর দিয়ে যেন একটা দীর্ঘ অনাচারের কাহিনী পার হয়ে গেছে।

উঠে ব'সে সে বললে, দাওয়াই লাও চৌবে।

লায়া, সাব।—ব'লে চৌবে চৌকির উপর থেকে কাঁচের গ্লাস নিয়ে একটা টিনের কৌটো থেকে কি যেন ওষুধ ঢাললো।

শর্বরী এসে ভিতরে ঢুকলো। বললে, ধন্য ঘুম, তোমার ঘুমের প্রাইজ পাওয়া উচিত। ও কি খাওয়া হচ্ছে?

চৌবের হাত থেকে কাঁচের গ্লাস নিয়ে কুলেন্দ্র বললে, মৃতসঞ্জীবনী। ভারি বিশ্রী গন্ধ। কতদিন খাচ্ছ?

বছর খানেক।

খাও কি জন্যে?

এক চুমুকে ওষুধটা খেয়ে কুলেন্দ্র বললে, যদি না খাই তবে সেদিন

গা ছমছম করে। একেবার মনে হয় সাপ কামড়াতে আসছে, কিম্বা বাঘ তাড়া করছে। মানে, কি জানি, শরীরটা যেন···এই দুর্বল আর কি।

শর্বরী বললে, কিন্তু ওষুধ খেয়ে ত শরীর সারে না, কুচক্রী?

কুলেন্দ্র বললে, শরীর সারাবার ত কথা নয়, টি'কে থাকলেই হোলো।

কথাটার ভিতর একটা নৈরাশ্যের নিশ্বাস ছিল, শর্বরীর মনটা দুলে উঠলো। বললে, তুমি লেখাপড়া শিখেছ, স্বাস্থ্যতত্ত্ব অবশ্যই জানো। এ কথা বল্‌ছ কেন?

কুলেন্দ্র পাইপটা ধরিয়ে নিল। তারপর দেশলাইএর কাঠিটা ফু' দিয়ে নিভিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললে, আমি কিছুই বিশ্বাস করিনে।

চৌবে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। আহত অভিমানে উষ্ণ-কণ্ঠে শর্বরী বললে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার কাছে লেক্‌চার দেবো না— কিন্তু ভেবে দেখেছ কি যে, উত্তেজনাই তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে তোমার ভেতরটা জীর্ণ, নোনাধরা?

কুলেন্দ্র বললে, তার জন্যে কে পরোয়া করে?

কেউ নয়।

তবে?

শর্বরী বললে, মনে করেছিলুম শিকারটা তোমার শখ, তোমার খেয়াল, এখন দেখছি তা নয়! এ যেন রোগীকে অক্সিজেন দিয়ে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা। এ আর কতদিন?

চামড়ার কোটটা কুলেন্দ্র গা থেকে খুলে ফেললো। তারপর বাইরে এসে দেখলো তার জন্য টেব্‌লে প্রাতরাশ সাজানো হয়েছে। জলযোগ সেরে পুনরায় শিকারের আলোচনা, পুনরায় নিদ্রা। নিদ্রার পরে চায়ের

মজলিশ এবং অতঃপর নৈশভোজন সেরে মারণাস্ত্র সহকারে পুনরায় সেই অরণ্যকাণ্ড। এই যেন তার জীবনের শেষ পরিচ্ছেদ।

শর্বরী বাইরে এলো। কুলেন্দ্র মুখ ধুয়ে এসে টেব্‌লে ব'সে গেল আহার করতে। শর্বরী বললে, আজ আমি চ'লে যাবো, কুচক্রী।

মুখ তুলে কুলেন্দ্র নেহাৎ ভদ্রতা ক'রে বললে, তাই নাকি? আবার কবে আসছো বলো।

আর হয়ত আসা হবে না! যখন তখন আসা কি আর বিধবা মানুষের ভালো দেখায়?

কুলেন্দ্র চুপ ক'রে চা পান করতে লাগ্‌লো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে শর্বরী বললে, উত্তর দিচ্ছ না যে?

কুলেন্দ্র বললে, ভাবছিলুম—না থাক্‌গে।

উৎসুক হয়ে শর্বরী বললে, কি বলো শুনি?

হাসিমুখে কুলেন্দ্র বললে, না এমন কিছু নয়, এমনি।

মেয়েমানুষ ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো কৌতূহলে। বললে, না, বলতেই হবে তোমাকে, কুচক্রী। কি, বলো শুনি?

কুলেন্দ্র বললে, তোমাকে একটা বাঘছাল দেবো বলেছিলুম, কিন্তু বাঘ তো এখনো মারা পড়ল না।

শর্বরী যেন একটি ফুৎকারে নিভে গেল। আত্মসম্বরণ ক'রে সে শুধু বললে, যেদিন ভৈরবী হবো সেদিন খবর পাঠাবো তোমাকে, বাঘছাল পাঠিয়ে দিয়ো। আপাতত চলে যাচ্ছি—কই, আর দু-একদিন থাকতে বল্‌লে না ত!

থাকতে বললে কি থাকবে?

ব'লেই দেখ না!

চায়ের বাটি মুখে তুলে একটু হেসে কুলেন্দ্র বললে, কেনই বা থাকবে?

শর্বরী বললে, যদি বলি জোর ক'রে থাকবো ?

চায়ে চুমুক দিয়ে কুলেন্দ্র বললে, ছেলেমানুষী।

শর্বরী বললে, কাল রাতে কোন্ গল্প বলতে ঘরে ঢুকেছিলে ?

কুলেন্দ্র ক্লান্তি বোধ করছিল, বিতর্কের দিকে তার মন ছিল না। এখনই সে ঘুমোতে যাবে, এখনো তার শরীর ও মনের অর্ধেকটা ঘুমে অবশ। কথার উত্তরে তাকে কথা জোগাতে হচ্ছে অনেক কষ্টে। অদূরে কুঠিবাড়ীর দরজায় চৌবে দাঁড়িয়ে রয়েছে হুকুমের অপেক্ষায়। কুলেন্দ্র প্রাতরাশ সেরে উঠে দাঁড়ালো।

আবার সেই অনাদরের আভাস। শর্বরীর মুখের উপর পলকের জন্য একটি আহত রক্তাভা ফুটে উঠলো। রাত্রির কুলেন্দ্রর সঙ্গে দিনের কুচক্রীর ঐক্য নেই। রাত্রে সে উৎকর্ণ, দুরন্ত, সম্পূর্ণ—কিন্তু দিনে যেন তার চৈতন্য থাকে না, মাত্রা হারায়, অস্পষ্ট ও অদ্ভুত আচরণ ক'রে চলে। তবু তার উঠে যাবার সময় শর্বরী বললে, কই, গল্প বললে না ত !

কুলেন্দ্র একবার ফিরে দাঁড়ালো। বললে, রাতের গল্প রাতেই বলা যায়, শর্বরী।

কিন্তু আমি যে আজ বিকালেই চ'লে যাবো ?

আজ বিকেলে ?—চৌবে !

চৌবে কাছে এগিয়ে এলো। কুলেন্দ্র বললে, বিলানমে লে যাওগে মাজিকো, স্টেশন পৌঁছ না। ইন্‌কো নোকরকো ভি,—খেয়াল রখো। হুঁসিয়ারিসে লে যাও।

বহুৎ আচ্ছা, জি।—চৌবে সেলাম জানিয়ে চ'লে গেল এবং প্রায় তারই সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত, আহত, স্তম্ভিত শর্বরীর দিকে একরূপ ভ্রূক্ষেপ না ক'রেই কুলেন্দ্র নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

নিজের খেয়ালেই শর্বরী একটু একটু করে জঙ্গলের ভিতরে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিল। লতাপাতা গাছের জটলায় সূর্যের আলো ভিতরে কোনো কালেই আসে না, চারিদিকের অরণ্যগর্ভ হিমাচ্ছন্ন। পথ অল্পই, কিন্তু রাত্রি-কালে নিরস্ত্র হয়ে এতদূর আসতে কেউ সাহস করে না। লক্ষ্য ক'রে দেখলে এখানেও বাঘের পায়ের দাগ আবিষ্কার করা যায়। শর্বরীর এতক্ষণ ভয় করেনি, সহসা একটা বনমুরগীর ডানার ঝাপট শুনে সে সচকিত হয়ে ফেরবার পথ ধরলো। নিরিবিলি ঘুরে-ফিরে বাকি সময়টুকু কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই।

ফিরে এসে দেখলো কুলেন্দ্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত। পাশের টেব্‌লে তার হাত ঘড়িটায় দেখা গেল বেলা দুটো বাজে। কুলেন্দ্রর নিশ্বাস-প্রশ্বাসে আবার সেই অসহনীয় কাতরতা শুনে শর্বরী বেরিয়ে গেল। এবার তবে তাকে যাবার আয়োজন করতে হয়। যাবার আগে তার কাছে বিদায় না নিলেও চলবে কিন্তু রায়সাহেবের কাছে সমাজিক সৌজন্য রক্ষা না করলেই নয়। শর্বরী অন্দর মহলের দিকে চললো।

ভিতরে কিছু দূর গিয়ে বাঁক ফিরতেই পচা মাংসের কুৎসিত গন্ধ তার নাকে এলো। অসহ্য গন্ধ। যেন বন্য বর্বরতার প্রমাণ এর বেশী আর কিছু হতে পারে না। সেই গন্ধ সহ্য ক'রেও শর্বরী গতরাত্রির সেই ঘরটার কাছে এসে দাঁড়ালো।

ভিতরটা স্বল্প অন্ধকার। কোনো কালেই আলো বাতাস এসে পৌছায়না এমনি ভাবে প্রকাণ্ড ঘরখানা বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে

তৈরী। মেঝে, কড়িকাঠ, দেওয়াল—সমস্তই কাঠের। ওপাশে পাথরের একটা খাদ্‌রির মধ্যে কাঠের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, তারই উপর প্রকাণ্ড লোহার হাঁড়ায় কি যেন সিদ্ধ হচ্ছে। তারই দুর্গন্ধে সমস্ত বাড়ীটা ভরোভরো। শর্বরী সেই ঘর পেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকেই একটু লজ্জিত হোলো। রায়সাহেব একদিকে খেতে বসেছেন, আর তাঁর সম্মুখে কড়িকাঠ থেকে নামা একটা লোহার শিকল ধ'রে ফুলমায়া ঝুলছে, এবং সেই দোলার সঙ্গে সঙ্গে বড় একটা ঢেঁকির উপর পা ঠুকছে। দৃশ্যটা অদ্ভুত ও হাস্যকর। আরো হাস্যকর এই কারণে যে, ফুলমায়ার পরণে সেই জংলী শাড়ি আর নেই, তার বদলে ময়লা জীর্ণ আলখাল্লার মতো একটা পায়জামা ও গায়ে একটা গেঞ্জি। পোযাকটা নিতান্তই পুরুষোচিত।

আসুন, মিসেস চৌধুরী!

শর্বরী ভিতরে এসে বসলো। রায়সাহেব বললে, এদিকে চা'ল পাওয়া কঠিন, আমরা রুটি খাই।

ওপাশে আলীজান্ খেতে বসেছে। প্রভু-ভৃত্যের ভোজনের কোনো ইতর-বিশেষ নেই, এক শ্রেণীরই আহার।

রায়সাহেব হাসিমুখে বললে, দেখুন, দেখুন,—বনমানুষ কেমন দুলছে! পাজিটাকে বসিয়ে রাখলেই নষ্টামি করবে। চামড়া কোটার কাজ ওরই।

ফুলমায়া দুলতে দুলতে হাসছে, কপাল বেয়ে পোষের শীতে ঘামের ফোঁটা নামছে। শর্বরী অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো। তিন জনের মধ্যে কারো প্রতি কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। মেয়েটা বিচিত্র বটে। আরো বিচিত্র, যে-পরিজনের মধ্যে তার এই জীবন! কালকের শাড়ির চেয়ে আজ ময়লা পাজামা আর গেঞ্জিতে তাকে যেন বেশি মানিয়েছে। রাত্রির গহ্বর থেকে যেমন রাঙা প্রভাত প্রকাশ

পায়, তেমনি তার মলিন পরিচ্ছদের অন্তরাল থেকে বিচ্ছুরিত সুগৌর দেহচ্ছটা দেখে শর্বরীর দুই চক্ষু মধুর রসে যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। মুখ ফিরিয়ে সে প্রশ্ন করলো, আজ আপনাদের কী রান্না হলো রায়সাহেব ?

রায়সাহেব সবিনয়ে বললে, রুটি, ডিম, তেঁতুল দিয়ে বাসি হরিণের মাংস, আর মালাই।

তেঁতুল দিয়ে মাংস।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই পাজিটা রাঁধে খুব ভালো।

অদ্ভুত রান্না বটে।

আলিজানের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, উঠে যাবার সময় লোহার থালাটি নিজেই সে তুলে নিয়ে চ'লে গেল।

শর্বরী হাসিমুখে বললে, আপনি ত সংসার করেননি, এই ভাবেই কাটিয়ে দিলেন ?

রায়সাহেব বললে, আজ্ঞে হাঁ, ওদিকটা আর হয়ে উঠলো না। ওই মেয়েটাই আমার পায়ে শেকল পরিয়ে দিল।

কিন্তু আপনাদের ত কোনো বন্ধন নেই ?

রায়সাহেব হাসলো। বললে, আমার যখন বত্রিশ বছর বয়স ওর তখন জন্ম হয়, প্রায় বিশ বছর হোলো। না, বন্ধন নেই বটে—কিন্তু মুস্কিল একটা—

আপনার আবার মুস্কিল কিসের ?

রায়সাহেব হাত ধুয়ে উঠে বললে, আসুন আপনি এই ঘরে।

শর্বরী তার সঙ্গে পাশের সেই বড় ঘরটায় এলো,—লোহার হাঁড়ায় যেখানে চর্বি ও চামড়া সিদ্ধ হচ্ছে। আলিজান তার তদ্বিরে ব্যস্ত।

রায়সাহেব এক জায়গায় ব'সে ধীরে সুস্থে বললে, আপনি ত থাকেন বড় শহরে, মেয়েটার একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন ?

কি ব্যবস্থা বলুন ?

ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া, ওর হাতে একটা নতুন মানুষ এনে দেওয়া।

শর্বরী হেসে বললে, আমি কি এতই নিষ্ঠুর যে ওকে আপনার কাছ থেকে সরিয়ে নেবো ?

রায়সাহেব চিন্তামগ্ন হয়ে বললে, সেই হয়েছে মুস্কিল, মিসেস চৌধুরী, —ও যাবে না কোথাও।

ভালোবাসার কথাটা বলতে শর্বরীর মুখে আট্‌কালো। কেবল বললে, আপনি ওর এতই প্রিয়, এতই আপন যে, আপনাকে ও ছাড়তে পারবে না।

রায়সাহেব বললে, হ্যাঁ, আপনি বলেছেন ঠিক। মানে, আমি জানি সে কথাটা। কিন্তু কি জানেন ?—কথাটা শেষ করতে গিয়ে সে থতিয়ে গেল, একরাশি অস্বস্তি ফুটে উঠলো তার মুখে। বললে, ভারি অস্বাভাবিক। আপনি শুনে হাসবেন না, মিসেস চৌধুরী ?

এ ত হাসবার কথা নয়, রায়সাহেব।

রায়সাহেব বাহিরের দরজার দিকে চেয়ে বললে, দুরন্ত মেয়ের সঙ্গে চাই দুরন্ত ছেলে, রংয়ের বদলে রং, চেহারার সঙ্গে চেহারা। বছর পাঁচেক ধ'রে কথাটা ভাবছি…আমি ত ওর যোগ্য নই।

শর্বরী সাহসে ভর ক'রে বললে, আমার পক্ষে বলা ত শোভন নয় কিন্তু ওকে ছাড়া আপনার পক্ষেও কঠিন।

মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে রায়সাহেব বললে, না, না, ঠিকই বলেছেন। অসম্ভব, আমি ওকে ছেড়ে থাকতে পারবো না।

শর্বরী হেসে উঠলো। রায়সাহেব পুনরায় বললে, আমার হাতে গড়া পুতুল, ওর জন্ম-মৃত্যুর পথ আমার জানা, ছেড়ে দিতে পারবো না, মিসেস চৌধুরী।

অদ্ভুত প্রণয় সন্দেহ নেই। শর্বরীর মুখের হাসি মিলিয়ে এলো। সে বললে, কিন্তু ওর যোগ্য ছেলে কি আপনি খুঁজেছেন?

হ্যাঁ খুঁজেছি, পাইনি। এক আধজনকে পেয়েছিলুম—রায়সাহেব চিন্তা ক'রে বললে, কিন্তু মেয়েটাকে নিয়ে চলে যেতে চায়। সে কি সম্ভব?

শর্বরী বললে, ধরুন পাওয়া গেল একটি ছেলে, ফুলমায়াকে নিয়ে রইলো সে আপনারই এখানে; কিন্তু—কিন্তু, ক্ষমা করবেন আপনি,—আপনি কাছে থাকলে কি ওদের জীবন আনন্দের হবে?

রায়সাহেবের মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। বললে, হবে না? মিসেস চৌধুরী, আমার যা কিছু আছে সব দেবো, কাজ কারবার সব,—শুধু থাকবে চোখের সামনে, চ'লে যাবে না। ওদের সকল কাজ আমি ক'রে দেবো, ওদের ছেলেপুলে মানুষ করবো, ওদের যা কিছু—

শর্বরী বললে, কিন্তু আপনি থাকতে ও যদি স্বামীকে সুখী করতে না পারে, রায়সাহেব?

রায়সাহেব নিশ্বাস ফেলে কেবল বললে, তাও জানি, তবুও—তবুও যদি কোনো দিন আমার আশা পূর্ণ হয়,—তাই ভাবি মিসেস চৌধুরী, আমার কাছে থাকলে চিরকাল মেয়েটা আনন্দেই থাকবে, কিন্তু আমার দিক থেকে···ধরুন, ও যা চায় হয়তো সব যোগাতে পারবো না। আমার ক্লান্তি, আমার অভাব ও বুঝতে পারবে না। আমার মনে হবে, আমি ওকে বঞ্চিত ক'রে চলেছি।

শর্বরী চুপ ক'রে রইলো। কিন্তু এই ঘটনা থেকে যে-শিক্ষাটুকু তার হলো তা কম নয়। তার নিজের জীবনে এই মহৎ উদাহরণটা সে ঘটাতে পারতো কিন্তু লৌকিক বাধায় সেটা হয়ে উঠেনি। কুলেন্দ্র বিবাহ না করার গোড়ায় তা'র কোন্ কারণ নিহিত ছিল আগে সে কথা সে ভাবেনি, অনেক ছেলেই অবিবাহিত থাকে,—কিন্তু তার এই

উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মর্মমূলে যে সত্যকারের ব্যর্থ প্রণয় কাহিনী গুপ্ত ছিল, শর্বরী যেন আজ সেটি আবিষ্কার করতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য, কুলেন্দ্র একটি নিশ্বাসও ফেলেনি, একটি অভিমানও কোথাও রেখে আসেনি, নিজের ধরা দেবার মতো কোনো চিহ্নই সে প্রকাশ পেতে দেয়নি। এবং, সত্য কথা বলতে কি, এই প্রথম কুলেন্দ্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। পত্রব্যবহারের মধ্যে অনেক সময় হাসি-পরিহাসের অবকাশ থাকতো — কিন্তু এই প্রথম কুলেন্দ্রের কাছে এসে দাঁড়ালো। আজ এমন একটা বয়স তাদের যে, নতুন ক'রে সেই আগেকার তরুণ বয়সের মতো, গল্প উপন্যাসে শোনা যায়,—তেমনি ক'রে প্রণয়পত্তন করা যেমন বেমানান তেমনি বীভৎস। দুজনার মধ্যে কেবল যে বন্ধুতার সম্পর্ক তাই নয়, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধও কালক্রমে এসে গেছে। এ বয়সে জান্তব প্রকৃতির ছলাকুশলতা কেবল দৃষ্টিকটুই নয়, হাস্যকরও বটে।

শর্বরী উঠে দাঁড়ালো। বললে, আপনাদের এখানে খুব আনন্দ পেয়ে গেলুম, খুব মনে থাকবে। এইবার আমি চ'লে যাবো, রায়সাহেব।

রায়সাহেব মুখ তুলে বললে, হাকিম ত যাবে না ?

না, উনি রইলেন। আপনি দয়া করে ওঁকে একটু—বলতে বলতেই শর্বরী সচেতন হয়ে উঠলো। এটা তার নিষ্প্রয়োজনীয় সতর্কীকরণ, এ অর্থহীন। এই ছিদ্রে রায়সাহেব যদি তার মনের চেহারাটা দেখে নেয়, তবে লজ্জা আর অপমানের একশেষ। তাকে যখন যেতেই হোলো তখন নিজের পদচিহ্ন তার মুছে নিয়ে চ'লে যাওয়াই সুদৃশ্য ও সঙ্গত।

শীতের বেলা ছোট। চারটে বাজতেই গাছে পালায় রোদ উঠে গেল। কিন্তু যাবার সময় একরাশি ক্লান্তি আর অবসাদে শর্বরীর মন আচ্ছন্ন হয়ে এলো। এ ক্লান্তি তার যাবে না, তার জীবনে একটা অসাড়তা এসে গেছে।

চৌবের গাড়ী প্রস্তুত ছিল, তাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গাড়ী আবার রাত দশটায় এখানে ফিরবে। আজ রাতে শিকারের তোড়-জোড় খুব বেশি। শর্বরী বিদায় নেবার জন্য কুলেন্দ্রের ঘরে ঢুকলো।

কুলেন্দ্র ঘুম থেকে উঠে কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে বসেছিল, মুখ তুলে হাসিমুখে বললে, যাবার জন্যে বুঝি খুবই ব্যস্ত ?

শর্বরী হাসলো। বললে, তাড়িয়ে দিলেও থাকবো এমন ত কোনো বাঁধাবাঁধি নেই !

ঘুমের জড়তা কুলেন্দ্রর শরীরে আর নেই। সন্ধ্যা আসন্ন, এইবার তার নিজের প্রকৃত চেহারায় ফিরে আসবার সময়, দিনের আলো ম্লান হবার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন রাত্রির সংগ্রামের জন্য জেগে উঠেছে। সে বললে, তুমি এসেছ যাবার জন্যে। এসেছিলে আমার কার্যকলাপ দেখে যেতে,—সেই দেখা ত তোমার ফুরিয়েছে, শর্বরী।

শর্বরী বললে, একথা হলপ ক'রে বলতে পারো ?

পারি, তার কারণ আমার প্রত্যহের জীবনে এখন আর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা পর্যবেক্ষণ করার জন্য তুমি কাছে থাকবে, সুতরাং তোমার কাল পূর্ণ হয়েছে।

যদি বলি থাকতে ভালোই লাগছে !

কেন ?

শর্বরী বললে, বনজঙ্গল, নির্জনতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফুলমায়া রায়সাহেব, পুরনো একজন বন্ধু,—সমস্তটা মিলিয়ে ভালোলাগা।

কুলেন্দ্র বললে, কিন্তু পুরনো বন্ধুটা যদি ফর্দ থেকে কেটে দেওয়া যায় ?

শর্বরী বললে, এত নির্দয় তুমি ত নও, কুচক্রী।

নির্দয় নই ? জীবহত্যা ছাড়া যার আর কোনোদিকে আগ্রহ নেই সে কি পরমহংস ?

শর্বরী একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। কঠিন কণ্ঠে বললে, আমি এখান থেকে এক পাও নড়বো না।

এক ঝলক হেসে কুলেন্দ্র বললে, কিন্তু লোকনিন্দা?

লোকনিন্দার্থ ভয় তাদের যাদের হাতে এই অভিশপ্ত সমাজের সৃষ্টি, যারা পাপপুণ্যের আদালতে হাকিমী করে। শারীরিক বল-প্রয়োগ করার আগে আমি এখান থেকে এক ইঞ্চি নড়বো না।

কাগজপত্রের দিকে চোখ মেলে কুলেন্দ্র বললে, কিন্তু আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক এসেছে, পুলিশ-সাহেব জরুরী খবর পাঠিয়েছে।

শর্বরী উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। বললে, তুমি যাবে কেমন ক'রে শিকার ছেড়ে?

না গেলে পুলিশ-সাহেবের অনুরোধ অমান্য করা হয়।

শর্বরী বললে, আজ হয়ত বাঘ শিকার হতে পারতো।

পারতো বৈ কি। কিন্তু—

ধরো যদি তুমি না যাও?

কুলেন্দ্র বললে, না গেলে জেলা হাকিমের কাছে খবর যাবে, কাজ পণ্ড হবে—তারপর চাকরি নিয়ে টানাটানি। লাঞ্ছনার একশেষ।

শর্বরী মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো। মুখে সে কিছু বললে না; বিতর্ক তুললেই কেমন একটা ঝোঁক কুলেন্দ্রকে পেয়ে বসে, নিজের যুক্তি সে ছাড়তে চায় না। প্রতিবাদ না করলেই সে ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করতে থাকে।

কুলেন্দ্র বললে, তুমি বোধহয় এই শিকার-টিকার খুব বেশি পছন্দ করো না, না শর্বরী?

না করলে তোমার ত কোনো ক্ষতি নেই?

ক্ষতি অবশ্য নেই, তবু তোমার নৈতিক সমর্থন থাকলে শিকার-অভিযানে একটু উৎসাহ থাকে বৈ কি।

শর্বরী বললে, নৈতিক সমর্থন চাও, অথচ আমার কথা শুনতে চাও না,—এটা কি তোমার হাকিমী যুক্তি?

কুলেন্দ্র বললে, কোথায় তোমার অবাধ্য হলুম বলো?

আমার বাধ্য হ'তে বলিনে, বলা বেমানান শুধু নয়, বে-আইনী। কিন্তু শিকারটাই ত তোমার সব নয়। তোমার চাকরি আছে, ঘর আছে, জীবনের দায়িত্ব আছে, নানাদিকে কর্তব্য আছে,—কোনোদিকেই ত তোমার দৃষ্টি নেই, কুচক্রী!

অনেকক্ষণ অবধি কুলেন্দ্র চুপ করে রইলো। তারপর বললে, তাই বুঝি তুমি বিরক্ত হয়ে যেতে চাও?

না, হতাশ হয়ে যাচ্ছি।—শর্বরীর গলাটা একটু কাঁপলো, তবুও শেষ কথাটা বললে, তোমাকে খুঁজে পাওয়া গেল না এই কথাই জেনে যাচ্ছি। তুমি সে-মানুষ নেই, কুচক্রী। তোমার নেই চেহারা, নেই প্রাণময় আগ্রহ, নেই সকল বিষয়ে উৎসাহ, মনের সজীবতা—সব তোমার গেছে। তুমি আছো একটা কঙ্কাল, আফিঙ খেয়ে সে ঝিমোয়, মদ খেয়ে সে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তোমার শিকারে আমার আপত্তি নেই, আপত্তি তোমার এই ভয়ানক নেশায়, রক্তের স্বাদ পেয়ে এই বেপরোয়া জীবন-যাত্রায়। তোমার বাঁচার আশা নেই কুচক্রী—এইটিই আমাকে জেনে যেতে হবে।

ঘরের একপাশে অস্ত্রশস্ত্রগুলো রয়েছে, সেইদিকে চেয়ে কুলেন্দ্র সহসা বললে, রোগ হ'লে মানুষ কি বাঁচে? বাঁচতে আমি চাইনে।

শর্বরী বললে, কেন তোমার এই অভিমান?

অভিমান ত নয়, এই পরিণাম। রোগে আমাকে জীর্ণ করেছে।

কী রোগ তোমার?

কই, সে আমি বুঝতে ঠিক পারিনে। সেই ভয়ানক রোগের একমাত্র ওষুধ হলো বন্দুক। সময় হয়েছে, চলো এবার।

চোরের গাড়ী প্রস্তুত। রায়সাহেবের কাছেও বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে। ফুলমায়া অত কিছু বিদায়-সম্ভাষণ বোঝে না—সে ভিতরেই রয়ে গেল। কুলেন্দ্র কাজ সেরে আবার এই খুনিয়ার জঙ্গলে ফিরে আসবে,—অস্ত্রশস্ত্রগুলি তার এখানেই রইলো। তাকে কিছুতেই বাধা দেওয়া যাবে না,—এ জঙ্গলে সেই নবাগত নরখাদক বাঘটি হত্যা না ক'রে সে নড়বে না। শর্বরী গাড়ীতে গিয়ে উঠলো।

অনেকক্ষণ যায়, কুলেন্দ্র আসে না। গাড়ীতে ব'সে শর্বরী অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। সন্ধ্যা প্রায় আসন্ন হয়ে আসছে, এখন যাত্রা না করলে রাত্রির আগে আর অতটা পথ যাওয়া যাবে না। শর্বরী ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে।

এক সময় সে গাড়ী থেকে নেমে কুঠিবাড়ীর অঙ্গন পার হয়ে আবার ফিরে এসে ভিতর দিকে কুলেন্দ্রর ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকে সে অবাক। মুখে একটা পাইপ ধরিয়ে কুলেন্দ্র সটান বিছানায় প'ড়ে রয়েছে।

শর্বরী বললে, যাবেনা তুমি ?

কুলেন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললে, কই, তুমি যাওনি এখনো ? আমি ত যাবো বলিনি।

যাবে না ? এই যে বললে, যাচ্ছি, আফিসের কাজ, পুলিশ সাহেবের অনুরোধ—সবই মিথ্যে ?

কুলেন্দ্র বললে, তুমি শুনতে ভুল করেছ। সবই সত্য, কিন্তু আমি যাবো না। রায়সাহেব খবর পাঠালো, দু-তিন মাইলের মধ্যে বাঘ আছে—আমি যাবো না শর্বরী, যতই সেখানে আমার ক্ষতি হোক।

শর্বরী বললে, সামান্য শিকারের জন্যে নিজের সর্বনাশ করতে চাও ? চলো, তোমাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে। ওঠো।

তার অস্বাভাবিক গলার আওয়াজ শুনে কুলেন্দ্র একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠে বসলো। কিন্তু যাবার চেষ্টা তার দেখা গেল না, ব'সে ব'সে দু'বার পাইপটা সে টানলো।

তীব্র দুটো রাঙা চোখ মেলে শর্বরী চীৎকার ক'রে উঠলো, সংযম হারাবার ভয় এখানে আমার নেই, আমি অনেক সহ্য করেছি, চিরজীবন করছি। তোমাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে, আর তোমাকে অত্যাচার করতে আমি দেবো না।

কুলেন্দ্র একবার পাইপ টানলো। শর্বরীর সর্বশরীর কাঁপছিল উত্তেজনায়। সে দ্রুত গিয়ে কুলেন্দ্রর হাত ধ'রে টানলো। চেঁচিয়ে বললে, আত্মহত্যা করতে চাও? অবাধ্য হয়ে আনতে চাও সর্বনাশ? মরতে দেবো না তোমাকে এমনি ক'রে, বাঁচতে দেবো না তোমাকে ব্যর্থ জীবন নিয়ে।

কুলেন্দ্র বললে, আমি যাবো না শর্বরী, তুমি যাও।

সহসা শর্বরীর চোখ পড়লো ঘরের কোনে। সে ছুটে গিয়ে কঠিন মুঠিতে কুলেন্দ্রর বন্দুক আর রাইফেল দুই হাতে তুলে নিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলো। বললে, এই নাও, মারো তুমি আমাকে। মেরেছ অনেক তুমি, এই নাও, মারো, বুক পেতে দিচ্ছি, কুচক্রী।

সাবধান শর্বরী, বন্দুকে গুলীভরা আছে, সাবধান—ছেলেমানুষী ক'রো না।—কুলেন্দ্রর চোখ জ্বলে উঠলো।

পাগলের মতো শর্বরী উত্তেজিত হয়ে উঠলো—ভয় কেন তোমার এত—তিলে তিলে মারতে চাও? তা হ'তে দেবো না। তার চেয়ে —বলো, কোথায় টিপতে হবে বলে দাও—

ভীতকণ্ঠে কুলেন্দ্র চীৎকার ক'রে উঠলো, তারপর ছুটে এসে বন্দুকটা কেড়ে নিতে গেল শর্বরীর হাত থেকে! কিন্তু সেটা ছিনিয়ে নিতে গিয়ে দুজনের মধ্যে বালকোচিত ধস্তাধস্তি, কাড়াকাড়ি—এবং তারপরেই সহসা—

গুড়ুম!

বজ্রপতনের ন্যায় প্রচণ্ড ভীষণ আওয়াজে ঘর, দোর, দেয়াল,

কড়িকাঠ—সমগ্র কুঠিবাড়ীর ভিত্তি, সমস্তটা প্রবল নাড়ায় কেঁপে উঠে ঘরের দরজার পাশে দেয়ালের একটা অংশ হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়লো। পরমুহূর্তেই দুইজনের আর্তনাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে শর্বরীর অচেতন দেহ বীভৎস রক্তধারায় ওলোটপালট খেয়ে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো।

রায়সাহেব, ফুলমায়া, চৌবে, আলীজান সবাই ছুটে এলো। মূঢ়, স্তম্ভিত, অর্ধচেতন কুলেন্দ্র স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে এবং তারই পায়ের কাছে শর্বরীর দেহ ভূলুণ্ঠিত। দুজনের কাপড় জামা, হাত-পা, সর্বশরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। রাইফেল থেকে গুলীটা ছটকে গিয়ে শর্বরীর বামবাহু ও কুলেন্দ্রর ডান হাতের তালু একত্র বিদ্ধ ক'রে বেরিয়ে ঘরের দরজা ও দেয়াল বিদীর্ণ ক'রে কোথায় যেন চ'লে গেছে। সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সকলে শিউরে উঠলো।

রায়সাহেব হেঁট হয়ে শর্বরীর হাত পরীক্ষা ক'রে বললেন, ওষুধ একটা দিচ্ছি, কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে—রক্ত বন্ধ হওয়া কঠিন।

চৌবে হাকিম সাহেবের কম্পিত রক্তাক্ত হাতটা চেপে ধরলো। অসহ্য যন্ত্রণা দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে শর্বরীর দিকে চেয়ে শুষ্ককণ্ঠে কুলেন্দ্র বললে, কিন্তু উনি যে আমার অতিথি হয়ে এসেছিলেন।

ফুলমায়া ছুটতে ছুটতে এসে এই নাটকীয় দৃশ্য দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, এইবার নিশ্বাস নিয়ে সহসা খিল খিল ক'রে বন্য হাসি হেসে উঠলো। রায়সাহেব তাকে চোখের দৃষ্টিতে শাসন ক'রে বললে, এমন হয়েই থাকে হাকিম—আমি ওষুধ দিচ্ছি। চৌবে—আলীজান—শামানকো এন্তেজাম করো, গাড়ী বানাও জল্‌দি—এই ব'লে রায়সাহেব নিজের মহলের দিকে ছুটলো।

৮

খুনিয়ার জঙ্গলের সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর একমাস অতিক্রম করেছে। এই একমাস কেবল হাসপাতালের কাহিনী। ডাক্তার, সিভিল সার্জন, ঔষধ, পথ্য, অপারেশন, আর্তনাদ, ড্রেসিং—এ ছাড়া আর কিছুই নয়। শর্বরীর বাঁ হাত অকর্মণ্য, কুলেন্দ্রর ডানহাতে আজো ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা। প্রথম দিন দুই শর্বরীর জীবনের আশা ছিল না।

দীর্ঘ একমাস কাটলো একটা অনাস্বাদিত যন্ত্রণায়। কুলেন্দ্র উঠে কাজ করেছে, গাড়ী ক'রে বাসায় গেছে, বাঁ হাতে সরকারি কোষাগারের বইতে টিপসই দিয়েছে। কিন্তু শর্বরী হাসপাতালের শয্যা ছেড়ে একবারও ওঠেনি, রাইফেলের গুলীতে বাঁ হাতের উপর দিকের হাড় তার চূর্ণ হয়ে গেছে। অপারেশন্ ক'রে হাড়ের টুকরো বা'র করতে হয়েছিল। এযাত্রা সে বাঁচলো অনেক কষ্টে।

একমাস পরে শর্বরী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে। শরীরের আগেকার সজীবতা আসেনি, এখনো পা কাঁপে। তার আত্মহত্যার অপচেষ্টার সংবাদ কেউ জানেনি—পুলিশের খাতায় উঠেছে কেবল দৈব দুর্বিপাকের কথা। সেদিন কুলেন্দ্রই এসে তাকে বাসায় নিয়ে গেল।

শর্বরীর পক্ষে আর বেশিদিন এখানে থাকা সম্ভব নয়। কলকাতা থেকে বারম্বার তা'র কাছে চিঠি এসেছে, কিন্তু দুর্ঘটনার সংবাদ বাইরে কোথাও পাঠানো হয়নি। আপত্তিটা লোকনিন্দার দিক থেকে নয়, কিন্তু লজ্জার কথা মনে ক'রে।

বিশ্রামের কালটাকে সংক্ষিপ্ত করতে হোলো। এদিকে মহেন্দ্রও যেন কিছুকাল থেকে অস্বস্তি বোধ করছিল। আত্মহত্যার প্রচেষ্টার

কথা সে ঘূণাক্ষরেও জানেনি, সে কেবল জেনেছে, মেয়ে মানুষের পক্ষে আগ্নেয়াস্ত্র স্পর্শ করা আত্মহত্যারই নামান্তর। এখন সে দিদিমণিকে ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। এদিকে কোনো ভদ্রলোক থাকে না, হাকিমরাই থাকতে পারে। আর এই যে লোকটি—দিদিমণির জংলী স্যাঙ্গাত—এই লোকটি হাকিম হোলো কেমন ক'রে? হাকিম যদি হোলো তবে মারধর, খুন-জখমের দিকে এত আগ্রহ কেন! ভদ্র-সমাজের মধ্যে এ লোকটার এই সব কু-প্রবৃত্তি প্রশ্রয় পায়নি ব'লেই হয়ত পালিয়ে এসেছে জঙ্গলের দিকে। হোক হাকিম, কিন্তু জঙ্গলেই ওকে মানায়,—মনুষ্য-সমাজে পথ ভুলে এসে পড়েছে। গভর্ণমেণ্ট কি আর হাকিম বানাবার লোক পায়নি?—দিদিমণির আশেপাশে ঘুরে ফিরে মহেন্দ্র এই সব মূল্যবান চিন্তার স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে দেয়, এক সময়ে আবার দিদিমণির ধমক খেয়ে ফিরে আসে। আর কিছু না পেরে অবশেষে মনে মনে হাকিমের বিরুদ্ধেই ছুরি শানাতে থাকে।

অনেক দিন পরে কুলেন্দ্রর জীবনযাত্রায় আবার যেন কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিয়মানুবর্তিতার পথ ধ'রে চলা হাকিমী কর্তব্যের একটা অঙ্গ শোনা যায়। একটু একটু ক'রে সেই পথে ফিরে এসে কুলেন্দ্র যেন পরিষ্কার ক'রে চোখ মেলে তাকাচ্ছে। অতিথি-অভ্যাগতরা অনেকদিন ধ'রে তাকে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হয়েছে। কত বিল এসে জমে রয়েছে, শোধ করা হয়নি। সাংসারিক খরচ পত্রাদির ব্যাপারটা ঝি-চাকর কি ভাবে এতদিন চালিয়েছে, সেটা যেন এখন ভারি জটিল মনে হচ্ছে। তার শয়নকক্ষের সঙ্গে ড্রয়িংয়ের আসবাবপত্র গেছে একাকার হয়ে। একটা বাচ্চা কুকুর সে কিছুকাল আগে পুষেছিল, সেটা মানুষ হচ্ছিল আড়ালে-আবডালে,—এখন খবর নিয়ে জানা গেল, কবে যেন সেটার অকালমৃত্যু ঘটেছে।

এতদিন যেন একটা নিষ্ফল নেশার মধ্যে সে অভিভূত ছিল। তার এই জীবন, তার নির্বাসন, তার চাকরী—সমস্তটাই ছিল যেন একটা অদ্ভুত নেশার রঙে রাঙা। হাকিমী করেছে যেন নিতান্ত অনিচ্ছায়, রায় লিখে এসেছে যন্ত্রচালিতের মতো। কা'কে কি শাস্তি দিয়েছে, কা'র কি ভাবে বিচার করেছে,—কিছুই তার মনে নেই। সে নিতান্তই জনপ্রিয়, কাজের রেকর্ড তার খুবই ভালো সেই কারণে প্রতিবাদ অথবা অসন্তোষ কোথাও দেখা যায়নি। এই বিহারেরই কয়েকটি ছোট ছোট শহরে সে থেকে এসেছে, সুনাম তার কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। তখন তার কর্মধারায়, তার প্রত্যহের জীবনযাত্রা প্রণালীতে, তার অধ্যবসায়শীল রীতি-নীতিতে এক নব উজ্জীবন ছিল। স্থানীয় জনসাধারণের কাজে-কর্মে তার অত্যধিক উৎসাহটা সরকারী কর্মচারী সুলভ নয়, সেই কারণে অনেক ক্ষেত্রে সে ছিল পরিহাসের লক্ষ্য। ছেলেদের হাডুডু খেলায়, বৃদ্ধদের দাবা আর পাশায়, হিন্দুস্থানীদের ঢাকঢোল আর চীৎকারের আসরে, রামলীলার যাত্রাতলায় সে নিঃসঙ্কোচ যাতায়াত করতো। সামান্য সাজসজ্জায় কতদিন সে গোপনে হিন্দুস্থানীদের গ্রামে গিয়ে সামান্য পাতার ঘরে রাত কাটিয়েছে, গোয়ালাদের ঘরে গিয়ে দুধ আর মাখন চেয়েছে, মুসলমানদের কাছে ডিম কিনেছে। তারপর হঠাৎ একদিন পরিচয় বেরিয়ে ধরা পড়েছে। তখন গ্রামবাসীরা তার বাসস্থান অবরোধ ক'রে হয় পর্যাপ্ত পরিমাণ ভেট্ এনেছে, নয়ত কোনো ভয়াবহ অমঙ্গল আশঙ্কা ক'রে তার ত্রিসীমানা থেকে দূরে চ'লে গেছে। তার একাকী নিঃসঙ্গ জীবন ছিল এমনি বৈচিত্র্যে ভরা। একবার কয়েকদিন ছুটির সময় সে দানাপুরের পথ ধ'রে হলদিছাপরা হয়ে চ'লে গেল শোন নদীর অঞ্চলে। সে তার এক অদ্ভুত জীবনযাত্রা। নদীর দূর এক নিরিবিলি তটে এক পরিত্যক্ত জীর্ণ কুটীরে সে আশ্রয় নিল। চাকরটা রইলো তার সঙ্গে একই ঘরে। সে-ই সামান্য আহার সংগ্রহ করে

আনে। রাত্রে কুলেন্দ্র শুয়ে শুয়ে অন্ধকার নদীর ঘন মৃদু কল্লোল শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর প্রতিদিন সে বাসা বদলে বেড়ায়। কোনো নির্জন চরে গিয়ে নৌকা বাঁধে। হাঁসের ডাক আর চক্রবাকের দীর্ঘ রবের মধ্যে কেমন একটা নিস্পৃহ, নিরুদ্দিষ্ট জীবনের আস্বাদ পায়। দেখতে দেখতে হয়ত শীতশেষের অপরাহ্ণের আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এলো। বিশাল শোন নদীর দিকদিগন্ত মেঘকেশরজালে আচ্ছন্ন হয়ে ধীরে ধীরে বৃষ্টি নামলো। শীতার্তদেহে নৌকায় ব'সে কুলেন্দ্র ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে, তবু অস্পষ্ট কুয়াসাবৃত নদীর নিশ্চিহ্ন পারাবারের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে সে যেন নিবিড় রস আস্বাদ করতে থাকে।

এই শর্বরী,—এই শর্বরী আজ নতুন নয়। এই নারীকে ঘিরে তার জীবনে কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি বটে, কিন্তু এ মেয়েই ছিল তার একাকী জীবনের পথ-নির্দেশ। প্রথম তারুণ্যের সময় শর্বরীর সঙ্গে তার আলাপ, তারপর ঘনিষ্ঠতা। পারিবারিক কুটুম্বিতা বারে বারে উভয়কে কাছাকাছি আসার সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, অন্তরঙ্গতার অবকাশ ছিল প্রচুর। সেই থেকে তার নাম হয়েছে, কুচক্রী। এই অসামাজিক নামটা অনেক ভেবে চিন্তে শর্বরীরই আবিষ্কার,—এটা তারই রটনা। কিন্তু এই ঘটনার চক্রান্তে যে রস, যে কৌতুক, যে কানাকানি,—সেদিনকার সেই ছেলেমানুষী সত্যই স্মরণীয়। কিন্তু আত্মীয়স্বজনের লক্ষ্যের অন্তরালে দুটি তরুণ-তরুণী সেদিন যে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিল, শিকড় যে নেমেছিল অনেক গভীরে, সেই সংবাদ জানা গেল শর্বরীর বিবাহকালে। সেদিন ঘনিষ্ঠতা ও মোহবন্ধনের ঘটলো চরম অপমৃত্যু। কুলেন্দ্র চাকরী নিয়ে নির্বাসনে বেরিয়ে পড়লো।

জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রধান দিকটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেল। প্রথমটা কুলেন্দ্র মনে করেছিল, জীবন তার বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল। সকলের বড়

আশা যেখানে, সব চেয়ে বড় আঘাত সেখান থেকেই এলো। কিন্তু বাইরে সে কোথাও প্রকাশ পেতে দেয়নি, নিজের মধ্যেই অতল তলে সে ডুব দিল। সেখানে নেমে দেখলো, কোথাও বিরোধ ও ব্যর্থতা নেই, অশ্রুর দাগ খুঁজে পাওয়া যায় না। অত্যন্ত শান্ত আত্মসমাহিত একটি আসনে সে তপস্বী। যাকে ঘরের মধ্যে, প্রত্যহ সুখ-দুঃখের মধ্যে পাওয়া গেল না, সে যেন ছড়িয়ে রইলো প্রথম প্রভাতের জ্যোতির্ময় আকাশের আলোয়, পাখীর গানে, দক্ষিণ প্রান্তরের বায়ু হিল্লোলে—সে রইলো যেন বর্ষার অশ্রুময় দিগন্তকোনায়। এটা অল্প বয়সের মোহকল্পনা, কুলেন্দ্র একথা জানতো। বাস্তব সুখদুঃখের মধ্যে এর কোনো সান্ত্বনা নেই, একথা সে বুঝতো,—কিন্তু তবু এ আনন্দ ও বেদনাবোধের দোলাই ছিল তার পথনির্দেশ।

তারপর অনেকদিন চ'লে গেল। অনুভূতির নিচের স্তরে চেতনায় নামলো শর্বরীর স্মৃতি। কুলেন্দ্র দেখতে পেলো, এতদিন পরে তার এসেছে অনন্তবিস্তার মুক্তি। তার কোনো বন্ধন নেই, আদর্শ পালনের তাগিদ নেই। একথা জানা গেল, এই ভাবেই তাকে চলতে হবে—এই নিঃসঙ্গতা, এই নির্বাসন, সমস্ত কিছুর থেকে এই নিষ্ঠুর নির্লেপ। বহুকাল পরে সে যেন নিজের মধ্যেই পথ খুঁজে পেলো। এলো তার জীবনে একটা নতুন নেশা। তার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হোলো নতুন দৃশ্যপট। দেখতে লাগলো বন্ধনহীন চেতনাহীন বন্য জীবনে এক প্রকার মদির কল্পনা। এতদিনে একটা অর্থ পাওয়া গেল, সুযোগ এসে দাঁড়ালো। মানুষের সমাজে তার আর কোনো আসক্তি নেই, একটা দুর্বার বন্যতা তাকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে চলেছে দূর থেকে দূরে। পার্বত্য অধিত্যকা তাকে ডাক দিল, অপরিচিত জানোয়ারের রব রজনীর অন্ধকারে তাকে আহ্বান করলো। যা অজ্ঞাত, যা অনাবিষ্কৃত, মানুষের বিষয়বুদ্ধির কাছে যার কোনো মূল্য নেই, সেই অজানা অরণ্য তাকে

হাতছানি দিয়ে টেনে নিয়ে চললো। রায়সাহেবের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হোলো।

যাবার দিনে শর্বরী তার আপিস ঘরে এসে দাঁড়ালো। কুলেন্দ্র উঠে এসে একটা চেয়ার টেনে তা'কে বসতে দিল। বললে, এত তাড়াতাড়ি, আর দুচারদিন থেকে গেলে হোতো না? শরীরটা একটু সারতে পারতো!

শর্বরী ম্লান হাসি হাসলো। বললে, শরীর এখানে আমার বরাবরই ভালো ছিল, কেবল হাতটার জন্যেই—

অপঘাতের কথাটা কুলেন্দ্র যেন আর মনেই করতে চায় না। ওটা তার অপরাধে ঘটেনি, ওটা শর্বরীরই উত্তেজনার ফলাফল, - তবু শর্বরী তার অতিথি, এখানে যেন তারই কোনো অন্যায় নিহিত। সে বললে, হাতটা তোমার সারলো বটে, তবে মনে হয়, কমজোর হয়ে র'য়ে গেল।

হয়ত গেল।– নির্লিপ্ত কণ্ঠে শর্বরী বললে, গেল ত' অনেক।

কুলেন্দ্র বললে, কি ক'রে যে অমন একটা কাণ্ড ঘ'টে গেল, আজও ঠিক বুঝতে পারিনি।

আমিও নয়।—শর্বরী বললে, নিশ্চয়ই একটা নির্বুদ্ধিতা ছিল এর মধ্যে। যারা মাংসাশী জীব, তাদের অহিংসা শেখানো হাস্যকর। তুমি শিকার ক'রে আনন্দ পাও, আমি হ'তে গেলুম সেই আনন্দের পথে বাধা। তোমাকে সৎপথে আনতে গেলুম আনন্দের পথ থেকে সরিয়ে। বোকামি আমার সেইখানে।

রক্তাভ মুখে কুলেন্দ্র বললে, তুমি আমার কল্যাণের জন্যেই করেছিলে, শর্বরী।

ভুল। তোমার কল্যাণের জন্য কেউ কোনোদিন চেষ্টা করেনি, আমিও না। আজকে যখন অনুভব করতে পারছি, আমার ওপর থেকে তোমার মনোযোগ অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে, তখন সেই ব্যর্থ বিক্ষোভের

জ্বালায় তোমাকে আবার আমার দিকেই ফিরিয়ে আনতে চাইলুম। আমার হাত ভাঙাই হোলো আমার স্বার্থপরতার প্রায়শ্চিত্ত,—তোমার কল্যাণের দিকে আমার দৃষ্টি ছিল না, কুচক্রী। বলতে বলতে শর্বরীর গলার আওয়াজ আত্মানুশোচনায় অবরুদ্ধ হয়ে এলো। সে আর বলতে পারলো না, আবেগ সামলাবার জন্য সে চেয়ার ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে কুলেন্দ্রই এসে তার পাশে দাঁড়ালো। কাঁধে হাত রেখে ডাকলো, শর্বরী ?

শর্বরীর মুখ চোখ তখন স্বচ্ছ হয়ে গেছে। মুখ তু'লে বললে, বলো ?

তোমার না গেলেই নয়, জানি। কিন্তু যাবার সময় সত্যি মনস্তাপ নিয়ে যাবে ?

শর্বরী তার কাঁধের উপর থেকে হাতখানা নিয়ে এবার নিজেই ধরলো। বললে, মনস্তাপ ত' নয়, কুচক্রী। আমি যদি জানতে পেরে থাকি, সত্যিই আমার অধিকার নেই, সেটা কি ভুল ?

কিন্তু আমার ধারণা যদি অন্য রকম হয় ?

শর্বরী কথার জবাব দিতে পারলো না।

কুলন্দ্রে বললে, আচ্ছা, এ বিবাদের মীমাংসা আর একদিন হবে। আবার তুমি কবে আসবে বলো ?

মুখ তুলে শর্বরী বললে, আমি কেবল বারবার যাতায়াত করি, এই কি তুমি চাও ?

কুলেন্দ্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো, তারপর তার হাত থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, বেশ, তাহলে এবার তুমি যাও। থাকতে তোমাকে বলবো না, আসতে তোমাকে জানাবো না। নিজের খুশিতে তুমি যখন আবার আসবে তারই জন্যে অপেক্ষা করব।

শর্বরী নীরবেই নিজের যাবার আয়োজন করতে লাগলো।

ট্রেনের আর বিলম্ব নেই। মোটর প্রস্তুত হয়ে বাংলোর বাইরে এসে দাঁড়ালো। গাড়ীতে ওঠবার আগে কুলেন্দ্র বললে, ডাক্তার কি বলেছে জানো, শর্বরী? এক বছর আর শিকারে যেতে পারবো না।

হাসি ফুটলো শর্বরীর মুখে। সাগ্রহে কাছে এসে বললে, তুমি নিশ্চয়ই এই নির্দেশ মানবে না?

যদি না মানি?

না মানাই ত সম্ভব। সেটাই ত তোমাকে মানায়। সত্যি, কি জবাব দিলে তুমি?

কুলেন্দ্র বললে, বললুম শ্রীমতী শর্বরী নামক আমার একটি সুন্দরী বান্ধবীর আদেশের ওপর আমার শিকার করা না করা নির্ভর করছে।

শর্বরী হেসে উঠলো। বললে, যাবার সময় বুঝি আমাকে মিষ্টি কথার ঘুষ খাওয়ানো হচ্ছে? আমি সুন্দরী কিনা সে তুমি জানো, কিন্তু তুমি যে আমার কথা কিছুতেই বলোনি এ আমি জানি।

মোটরে চ'ড়ে তারা স্টেশনে এসে হাজির হোলো। হাত ধ'রে কুলেন্দ্র তাকে একখানা ইণ্টার ক্লাস কামরায় তুলে দিল। তারপর বললে, তুমি সবই জানো মানছি। তা'হলে এ-কথাও জেনে যাও, তোমার আসবার অপেক্ষায় আমিও পথ চেয়ে রইলুম।

শর্বরী হাসিমুখে বললে, তার প্রমাণ পাবো কি ক'রে?

শিকার করা এখন থেকে আমি ছেড়ে দিলুম।

শিকার ছাড়লে থাকবে কি নিয়ে?

কি নিয়ে থাকবো চিঠিতে তুমি লিখে জানিয়ো।

বাঁশী বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। শর্বরী জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, তবু শেষ কথাটাও শেষ হোলো না, অসমাপ্ত রেখেই চ'লে যাচ্ছি। কেবল ব'লে যাই নিজেকে তুমি সাবধানে রেখো আমারই স্বার্থে। নমস্কার।

গাড়ী চলতে লাগলো মন্থর গতিতে। প্রান্তরে প্রান্তরে মধ্যাহ্নের রোদ ঝলমল করছিল। শীতের শেষে মধুর বসন্তকালের অল্প অল্প আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বাতাসে আকাশের নীলিমা শিউরে উঠছে। যতদূর দৃষ্টি যায় তেমনি আগেকার সেই গ্রামের আঁকাবাঁকা পথের ছবি, রেলপথের ধারে সেই শালুকে ভরা নিরিবিলি সরোবরে পানকৌড়ির অবগাহন। পরিদৃশ্যমান পৃথিবী আজও রৌদ্রে, রঙে, ঔজ্জ্বল্যে ও সুষমায় সুন্দর। চলন্ত ট্রেনের কামরার বেঞ্চে গা এলিয়ে নিবিড় আনন্দ আর বেদনার দোলায় দুলতে দুলতে অসীম ক্লান্তিতে শর্বরীর দুই অশ্রুসজল চক্ষু তন্দ্রায় বুজে এলো।

৯

কিন্তু ঘটনার চক্রান্তে কুলেন্দ্র আবার যেন একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে ছুটে চললো।

মার্চ মাসের শেষ দিকে হিন্দুস্থানী পর্ব উপলক্ষ্যে জনকপুরে একটা মেলা বসে। এ বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মেলায় ভিড় হয় যথেষ্ট। এ মহকুমা ছাড়াও জেলার অন্যান্য অংশ থেকে বহু গ্রামবাসী চৈত্রের প্রখর রৌদ্রেও বহুদূর পথ অতিক্রম ক'রে মেলায় এসে জড়ো হয়। প্রকাণ্ড হাট-বাজার বসে, 'ভরত মিলনের' যাত্রাগানের আসর জমে। তিন দিন ধ'রে আমোদ-আহ্লাদ চলে।

মামলা মোকদ্দমা বছরের এই সময়টায় অনেকটা ঢিলা পড়ে। সেজন্য সরকারী কর্মচারীদের অনেকেই মেলায় গিয়ে একবার ঘুরে আসেন; সাপ্তাহিক অবকাশের দুই একটা দিন মন্দ কাটে না। কিন্তু এবারে জানতে পারা গেছে, জ্যোতিষ্কলোকের একটা যোগ উপলক্ষ্যে সেখানে জনতা হবে দ্বিগুণ। সুতরাং পূর্বাহ্নে সতর্কতার জন্য কর্তৃপক্ষ পুলিশ ফৌজ, হাসপাতাল, ডাকঘর, আদালত—ইত্যাদির সাময়িক ব্যবস্থা

করেছিলেন। আদালতের ভার এসে পড়লো কুলেন্দ্রর উপর। জেলা ম্যাজিস্টেটের অনুরোধনামা এসে হাজির। জনকপুরে ইতিমধ্যেই নাকি অনেকগুলি সরকারী তাঁবু ফেলা হয়েছে।

সেখানে কুলেন্দ্রর সম্মান সর্বপ্রথম এবং সর্বোচ্চ। যাওয়া আসা এবং এই বাইরে থাকার জন্য একটা মোটা ভাতা আগেই নির্দিষ্ট হয়ে এসেছে। কুলেন্দ্র তার চাকর আর পাচককে আগেই পাঠিয়ে দিল। আরদালি চললো তার সঙ্গে মোটরে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা ধ'রে উত্তর পশ্চিমে প্রায় সত্তর মাইল পথ অতিক্রম ক'রে কুলেন্দ্রকে জনকপুরে এসে পৌছতে হোলো। মেলা বসবার একদিন বাকি থাকলেও এরই মধ্যে জন-জটলায় সমগ্র প্রান্তর আর নদীতীর মুখর হয়ে উঠেছে।

কুলেন্দ্রর তাঁবু প'ড়েছিল মাঠের মাঝখানে। হাকিমের নিজস্ব একটা সম্মান আছে। সুতরাং তাঁবু কেবলমাত্র তাঁবু নয়। তার সঙ্গে 'রসুই আর গোসলখানা' সংযুক্ত। ডাকবাংলা এদিকে থাকলে সুবিধা হতো, কিন্তু যেহেতু সে সরকারী কর্মচারী অতএব ডাকবাংলার আনুসঙ্গিক সুবিধাগুলো না পেলে তাকে মানাবে কেমন ক'রে? তাঁবুর সঙ্গে সংলগ্ন অস্থায়ী আদালত, সেখানে আসামী আর সাক্ষীদের কাঠগড়া অবধি প্রস্তুত। তাঁবুর বাইরে কেয়ারীকরা ঘাসের জমি, সেখানে মাটির বালতিতে ফুলসুদ্ধ চারা এনে বসানো হয়েছে। সামনের 'লনে' কতগুলি বেঞ্চ ও চেয়ার, সীমানার চারিদিকে খুঁটি পুতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। কুলেন্দ্রের তাঁবুর পাশেই পুলিশ সাহেবের তাঁবু পড়েছে, তাঁর মহলে ব্যবস্থাও অনুরূপ। ঘুরে ঘুরে চারিদিক দেখে শুনে কুলেন্দ্র খুশি হোলো।

দুপুরবেলা ছাড়া বসন্তকালের রোদ এখনও তেমন গরম হয়ে ওঠেনি। সকালে ও রাত্রের দিকে বেশ ঠাণ্ডা রয়েছে। এমন মধুর ও স্নিগ্ধ অবহাওয়ার গুণে মেলায় জনতা কম হয়নি। আশপাশে দুতিনটি জেলার

অনেক গণ্ডগ্রাম থেকে বহু নরনারী এসেছে। অদূরে নদী, সুতরাং জলপথেও যাত্রীর অভাব নেই। এদিকে হিন্দুস্থানী-যাত্রা, সার্কাস-পার্টি, সিনেমা, ম্যাজিক, জুয়া, নাচগান,—কিছুরই অভাব নেই। কোথাও হিন্দুধর্ম প্রচার, কোথাও খৃষ্টতত্ত্ব, কোথাও বা কোরাণ মাহাত্ম্য চলছে। স্বদেশী প্রদর্শনী, কুটীর শিল্প মণিহারী—ইত্যাদি আয়োজন ক'রে গ্রাম্য স্ত্রীপুরুষকে আকর্ষণ করার বিরাম নেই। যাত্রীদের থাকার জন্য জেলার কর্তৃপক্ষ হোগলার চালার বন্দোবস্ত করেছেন।

পুলিশ সাহেবের দলের সঙ্গে সকাল সন্ধ্যায় কুলেন্দ্রকে সমস্ত মেলার প্রান্তরটি একবার ক'রে পরিদর্শন ক'রে আসতে হয়। সকাল-সন্ধ্যা তার ভালোই কাটে। যদিও লোক লস্কর ছাড়া তার আনাগোনা করবার কথা নয়, তবুও এক আধদিন সন্ধ্যায় সে গা ঢাকা দিয়ে ছড়িটা হাতে নিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত একা চ'লে যায়। এত নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে পনেরো দিন তাকে থাকতে হবে, এই কল্পনায় একবারে সে হাঁপিয়ে ওঠে। নিয়ম রক্ষার কাজটা তার প্রিয় বটে, কিন্তু নিয়মভঙ্গ করাটাও তার কম প্রিয় নয়। তার জীবনও ত নিয়মের একটা প্রকাণ্ড ব্যতিক্রম। সংসারে সে সুখ পেলোনা, কিন্তু এই অনড় স্বাচ্ছন্দ্যটাও কি তার পক্ষে কম অসহনীয়? অপরাধ সে কোথাও কিছু করেনি, কিন্তু এইভাবে অভিশপ্ত হাকিম হয়ে নির্বাসিত থাকাটাই কি তার কাম্য ছিল? বয়স তার কম হয় নি, সাধারণ ভাষায় তার বয়সটাকে প্রায় যৌবন-সীমা বলা চলে। অথচ তার যে-জীবনী-শক্তি, যে-অধ্যবসায় ভিতরে ভিতরে সংহত হয়ে রইলো, ভাগ্যের একটা অদ্ভুত ব্যবস্থায় তার কোন প্রকাশ হলো না। নিয়তির সঙ্কেত তাকে ঠেলে একটা রিক্ত উষর পৃথিবীতে নিয়ে চলেছে, যেখান থেকে তার পশ্চাৎপদ হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাকে বাধ্য হয়ে থাকতে হবে নিঃসঙ্গতায়, অজানা আর অরুচিকর জীবন তাকে যাপন করতে হবে,—এবং সকলের চেয়ে

বিস্ময়কর, এই অবশ্যম্ভাবী অভিশাপে কোন প্রতিবাদ করা চলবে না। যাবার দিনে শর্বরী ঠিক এমনি একটা কথা কি যেন ব'লে গিয়েছিল। বোধ হয় সে যেন জানিয়েই গেছে উভয়ের সম্পর্কটা অসমাপ্ত, এ নিয়ে কোন চিত্তবিক্ষোভ করা চলবে না। অর্থাৎ যা ঘটে যাচ্ছে তাই নির্বিকারে ঘটতে দিতে হবে ; যা পাওয়া যায়নি তা নিয়ে ক্ষোভ নেই। হৃদয় আর মনুষ্যত্বের উপর এমন একটা শাসন বোধ হয় এ-যুগে আর কেউ কল্পনা করে না। কিন্তু তবু কুলেন্দ্র নির্বিচারেই সব মেনে নিয়েছে। শর্বরী তাকে সহচরণের আনন্দই দিতে এসেছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে সে দুঃখ পেয়ে গেছে। সে সুখী হোক, শান্ত হোক।

এমনি একটা দিনে ভারি মজার ঘটনা একটা ঘটলো।

তার আদালতে একটা না একটা ফৌজদারী মামলা লেগেই ছিল। চুরিদারি, মারামারি, জালিয়াতি, এসবের অভাব নেই। এক-একটার সামারি জাজমেণ্ট দিয়েই দুপুর বেলাটা সময় কুলিয়ে ওঠা যায় না। ওদিকে পুলিশসাহেবের তাঁবুতেও 'হারানো, প্রাপ্তি আর নিরুদ্দেশের' যথেষ্ট গণ্ডগোল লেগেছিল। সেদিন রাত্রে পুলিশসাহেব তাঁর তাঁবু থেকে লিখে পাঠালেন, মিস্টার চক্রবর্তী, হাজত আমার ভরে উঠেছে, কিন্তু শেষকালে স্ত্রীলোক আসামীও আসতে আরম্ভ করলো। কি করা যায় বলুন ত ?

চিঠির জবাবে কুলেন্দ্র পরিহাস করে জানালো, আপনার বিপদে আমার সহানুভূতি। স্ত্রীলোক আসামী যদি আসে, তা'হলে অবশ্যই আপনার স্ত্রী তাকে আশ্রয় দেবেন।

যা হোক, পরদিন ঘটনাটা জানা গেল।

একদল সাধু-সন্ন্যাসী এসেছিল এই মেলায়। তারা মধ্য-ভারতের কোন্ এক মঠের লোক। তাদের আলাদা তাঁবু, আলাদা বিলিব্যবস্থা। তাদের সঙ্গে এসেছিল নানারকম চিড়িয়া। একটা হাতী, কয়েকটা

ঘোড়া, গোটাকয়েক হরিণ, কয়েকটি গাভী ও কুকুর। কতকগুলি রঙীন পাখীও নাকি তাদের সঙ্গে ছিল। গতকাল সকালে তাদের এলাকার ভিতর থেকে একটি শিংওয়ালা হরিণ নিরুদ্দেশ হয়। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ। অবশেষে অপরাহ্নের দিকে দেখা যায়, এ গ্রাম ছাড়িয়ে বহুদুরে নদীর ধারে একটি স্ত্রীলোক হরিণটিকে নিয়ে সমাদর করতে ব্যস্ত। সন্ন্যাসীরা হরিণটার সঙ্গে স্ত্রীলোকটিকে ধ'রে এনে শারীরিক শাস্তি দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু জনসাধারণ তাদের নিষ্ঠুর আচরণে উত্তেজিত হয়ে বাধা দেয়। অতঃপর পুলিশ গিয়ে তদন্ত করে। তদন্তে সাব্যস্ত হয়, স্ত্রীলোকটি অপরাধী।

দুপুরে বিচারসভা বসলো। ঘটনাটার খবর যারা জানতো এমন বহুলোক পুলিশসাহেবের তাঁবু আর বিচারসভার চারিদিকে এসে জড়ো হোলো। ওদিকে সন্ন্যাসীদের আড্ডা থেকে বহু সাধু এসে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ালো। সমস্ত ব্যাপারটার একটা চাপা কৌতুক ভিতরে ভিতরে প্রবাহিত হচ্ছিল।

হাকিমসাহেব এসে এজলাসে বসলেন। কুলেন্দ্রর বিশেষত্ব হোলো, কাজের সময় মুখ তুলে সে কারো দিকেই তাকায় না। এজলাসে ব'সে নত মস্তকে সে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগলো। তারপর এক সময় বাদী আর সাক্ষ্যের জবানবন্দী নেওয়া হোলো। স্ত্রীলোকটিই অপরাধী।

কিন্তু অবশেষে সেই অপরাধী স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে স্বয়ং পুলিশ-সাহেবের স্ত্রী যখন নিজে এসে তা'কে কাঠগড়ায় তুলে দিয়ে গেলেন, তখন কুলেন্দ্র একবার মুখ না তুলেই পারলো না। এমন বিস্ময় তার জীবনে দ্বিতীয়বার আর ঘটেনি। চেয়ে দেখলো, আসামী হোলো সেই ফুলমায়া,—তার মুখে-চোখে সেই অদ্ভুত কৌতুক উচ্ছ্বাস, সেই বন্য কৌমার্যের ভরা লাবণ্য ক্ষণে ক্ষণে হাসির ফেনায় উচ্ছলিত হচ্ছে।

ফুলমায়া চেঁচিয়ে উঠে হেসে বললে, হাকিমসাহেব,—

তৎক্ষণাৎ পুলিশ জমাদার তাকে ধমক দিল,—হাকিমসাহেব নয়, বলো, হুজুর !

একটু থতিয়ে ফুলমায়া বললে, হুজুর, এই দেখুন, ওরা ধ'রে নিয়ে গিয়ে আমার হাতে গরম চিমটের ছ্যাঁকা দিয়েছে। আমার কোনো দোষ নেই, হুজুর !

তার রুদ্ধ উত্তেজিত শ্বাসপ্রশ্বাসের দিকে একটি পলকের জন্য কুলেন্দ্র চেয়ে দেখলো। দেখলো, তার মাথার বেণীর মূল থেকে ঘামের ধারা আরক্ত দুই গাল বেয়ে নেমে এসেছে ! তার চোখে-মুখে, কণ্ঠে, ভঙ্গীতে অবরুদ্ধ অভিযোগ পাক খেয়ে উঠছে। পকেট থেকে রুমাল বা'র ক'রে কুলেন্দ্র নিজের মুখে বার দুই মুছে নিল। তারপর যথাসম্ভব নির্বিকার মুখ তুলে প্রশ্ন করলো, নাম কি তোমার ?

জানেন না ? ভুলে গেছেন বুঝি ? আমার নাম ফুলমায়া।

তোমার বাপের নাম কি ?

চারিদিকে একবার চেয়ে হাসিমুখে ফুলমায়া বললে, বাপের নাম ? কই, তা জানিনে ত ?

তোমার সঙ্গে কে আছে ?

সবই জানেন হুজুর, তবে আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন ? ওই ত রায়সাহেব বসে রয়েছে, ওই যে ওই কোণে—

হাকিম বললেন, ছি, এখানে ভালো ক'রে কথার জবাব দিতে হয় ! আচ্ছা বলো, হরিণ তুমি চুরি ক'রেছিলে ?

আবার ফুলমায়া উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে, না হুজুর, একদম মিছে কথা। রায়সাহেবকে লুকিয়ে আমি মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। সাধুদের আড্ডার কাছে দাঁড়িয়ে হরিণ দেখছিলুম। একটা বাচ্চা আমার কাছে এগিয়ে এলো। তারপর আমি হাততালি দিয়ে ডাকলুম, আমার

সঙ্গে চললো। হুজুর, আমি ওর গায়ে একবারো হাত দিইনি। আমার পিছু পিছু অনেক দূর গিয়েছিল। চুরি আমি করিনি, হুজুর। ওরা আমাকে মেরেছে এমনি এমনি।—বলতে বলতে সহসা সে কেঁদে ফেললো।

সুন্দরী মেয়ের অশ্রুর গুণে সাক্ষীর অভাব হোলো না। সবাই এসে ব'লে গেল, সাধুরা বেশ ভালো লোক নয়। মেয়েটাকে অযথা ওরা কষ্ট দিয়েছে, হুজুর।

হাকিমের বিচারে যখন জানা গেল, আসামী বেকসুর খালাস পেয়েছে এবং সন্ন্যাসীদলের নিষ্ঠুর আচরণের জন্য তাদের এখান থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দেবার হুকুম হয়েছে, তখন খানিকটা কানাকানি হোলো বটে। পুলিশ [illegible] লোকজন পাঠিয়ে হুকুম করলেন, সন্ন্যাসীদের ডেরা তুলে দাও এবং তাঁর স্ত্রী পুনরায় এসে আড়াল থেকে ফুলমায়াকে সস্নেহে ডেকে নিয়ে নিজের তাঁবুতে চ'লে গেলেন।

বিচারসভা সেদিনকার মতো ভেঙে গেল। কুলেন্দ্র তার তাঁবুতে চ'লে গেল।

তাঁবুতে ঢুকে সে দেখলো রায়সাহেব স্তব্ধ হয়ে ব'সে রয়েছেন। হাকিমকে দেখে তিনি উঠে এসে হাসিমুখে করমর্দন ক'রে বললেন, ভারি খুশি হয়েছি আপনাকে দেখে। আপনারা সেরে উঠেচেন খবর পেয়েছিলুম। এখন হাতে ব্যথা নেই ত?

হাসিমুখে কুলেন্দ্র বললে, না, সেরে গেছে। খুব দেখা হয়ে গেল ত? একেবারে হঠাৎ, আমি ভাবতেও পারিনি।

তা বটে। ওই পাজি মেয়েটারই জন্যে দেখা হোলো। আপনার হাকিমী দেখলুম ব'সে ব'সে। ওর দোষ একটু ছিল বৈ কি। হরিণটাকে পথ ভুলিয়ে ও নিজেই নিয়ে গিছলো, বুঝলেন না? কিন্তু হাকিম-সায়েব—আপনাকে ব'লে যাচ্ছি,—রায়সাহেব তাঁর কর্কশ গলায়

উত্তপ্তকণ্ঠে বললেন, নিষ্ঠুর অত্যাচার আমি সইবো না। সাধুকে কিছু শিক্ষা দেবো।

রায়সাহেবের প্রকৃতি কুলেন্দ্রর জানা ছিল। সে শিউরে উঠে বললে, কি করতে চান, রায়সাহেব ?

রায়সাহেব বললেন, আলীজান সে কথা জানে, হাকিম ! কচি মেয়ের কচি হাতে লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিলে কি করা উচিত, আলীজান সে কথা খুব ভালোই জানে। আচ্ছা, নমস্কার হাকিমসাহেব।

রায়সাহেব চ'লে যাবার উপক্রম করতেই ব্যস্ত হয়ে হাকিম এসে তাঁর হাত ধরলো। বললে, দাঁড়ান্, উত্তেজিত হবেন না। এতদিন পরে দেখা, একটু বসুন। সত্যি, খুবই অন্যায় করেছে ওরা। আইনের মধ্যে বাগে এলে ওরা নিশ্চয়ই শাস্তি পেয়ে যেত। বসুন, বসুন-- ।

ক্ষুব্ধমুখে রায়সাহেব বসলেন। কুলেন্দ্র বললে, আপনারা যে হঠাৎ মেলায় এসে হাজির, ব্যাপার কি ?

রায়সাহেব বললেন, না, এমনি হঠাৎ এলুম। অনেকদিন কাজ-কারবার বন্ধ, তাই পুরানো মালগুলি এনে এখানে একটা দোকান দিয়েছি।

দোকান ? কতদূরে ?

এই খানিকটা। তবে চামড়ার দোকান কিনা, একটু খাটতে হয় বেশী। দুটো লোককে সর্বদা মোতায়েন থাকতে হয়।

কেমন চলছে ?

মন্দ নয়। বাঘ আর হরিণের চামড়াই বেশী বিক্রি। ভালুক আর চিতা তার পরে। কই, আপনি ত আর শিকার-টিকারে যান না, হাকিম ?

নিজের প্রতিজ্ঞা কুলেন্দ্রর মনে পড়লো। হাসিমুখে সে বললে, আপনিও ত' আর ডাকেন না ?

গরীবখানা খোলাই আছে, হাকিম। আপনি এখন দয়া করলেই হয়—রায়সাহেব বললেন, চলুন, মেলা ভাঙলে এবার আপনাকে নিয়ে যাবো। একটা 'ম্যান-ইটর' আজকাল ওদিকে এসেছে। লেপার্ডও আজকাল বেশ পাওয়া যায়। চলুন, এবার আমার সঙ্গে। অনেক জানোয়ার এসেছে।

চোখে-মুখে কুলেন্দ্রর একটা বিত্যুজ্জ্বালা ঝলসে উঠ্‌লো, বুকের মধ্যে আনন্দের যেন একটা তরঙ্গ-যন্ত্রণা সে অনুভব করলো। অরণ্য যেন চারিদিক থেকে তার কানের ভিতরে মর্মরিত হয়ে উঠলো। কিন্তু শান্তকণ্ঠে সে বললে, সত্যি, ভারি যেতে ইচ্ছে করে—কি জানেন, আজকাল ভারি কাজকর্মের ভিড়। সময় ভারি কম।

রায়সাহেব বললেন, সত্যি বল্‌ব? যেতে আপনার ইচ্ছে নেই। যারা একবার বন্দুক ধ'রে জঙ্গলে গেছে, তারা জঙ্গলে না গিয়ে থাকতে পারে? এর কাছে মদের নেশা কিছুই না।—হাসিমুখে তিনি পুনরায় বললেন, হয়ত মিসেস চৌধুরী আপনাকে মানা ক'রে গেছেন,—কি বলেন হাকিম?

কুলেন্দ্র সহসা একটু লজ্জিত হয়ে বললে, না, ঠিক তা নয়। ঠিক বারণ করেননি বটে, কি জানেন, মেয়েরা শিকার-টিকারে বিশেষ উৎসাহ পায় না। অবশ্য যাওয়া-না-যাওয়া আমার হাতে, রায়সাহেব। মেয়েদের বারণ শুনলে কি আর আমাদের চলে? অসম্ভব।

রায়সাহেব এতক্ষণে সকৌতুকে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। মনের কথাটা হয়ত তাঁর কাছে আর চাপা রইলো না।

চা এবং জলযোগের সঙ্গে গল্পগুজব সেরে রায়সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আর একটু বসতে ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ওদিকে দোকানে আলীজান একলা আছে। মেলা ত আর দিন তুই। বেশ, আবার দেখা হবে। আসুন না, আমাদের ওদিকে একবার?

হাকিম বললে, সময় পেলেই যাবো।

প্রতিজ্ঞা যদি আপনার না থাকে, তবে যাবার সময় ফের আপনাকে জঙ্গলে নিয়ে যাবো। আচ্ছা, তাহলে মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিন্—

কুলেন্দ্র এদিক ওদিক চেয়ে বললে, ফুলমায়া রয়েছে পুলিশসাহেবের স্ত্রীর কাছে। আচ্ছা, আপনি ওকে রেখে যান, জমাদার ওকে আপনার ওখানে পৌঁছে দেবে।

রায়সাহেব বললেন, আচ্ছা বেশ, সেই ভালো।

তাঁর চ'লে যাবার পর কুলেন্দ্র পর্দা সরিয়ে নিজের শোবার আস্তানায় গিয়ে ঢুকলো। পায়ের ফিতে বাঁধা জুতো আর গায়ের হান্টিং কোটটা খুলে সে তার খাটিয়ার বিছানার উপর শুয়ে পড়লো! আজ সকাল থেকে পরিশ্রম তার কম হয়নি। রায়সাহেবের হাসির খোঁচাটা তার মনের মধ্যে তখনো রি রি করছে। বিবাহ সে করেনি, কিন্তু জনৈকা মিসেস চৌধুরীর অঙ্গুলি-হেলনে আজকাল তার গতিবিধি যে সীমাবদ্ধ, এই লজ্জাকর ধারণা নিয়েই হয়ত রায়সাহেব চ'লে গেল। অথচ ঘটনাটা তা-নয়। ডাক্তার তাকে এক বছর শিকারে যেতে মানা করেছে তারই কল্যাণে। এটা সে শর্বরীকে বলেছিল, এই মাত্র। তবে অপঘাতের পর থেকে তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বটে। রাত্রের দিকে তার ইন্‌সম্‌নিয়ার অসুখ ইদানীং অনেকটা কম। মাদক দ্রব্য সে আর খায় না। বালিশের তলায় অস্ত্র না রাখলেও এখন তার ঘুম হয়। ঘুমের ঘোরে, যতদূর সে বুঝতে পারে, মুখ দিয়ে আর আর্তস্বর নির্গত হয় না। কাজ-কর্মের দিকে মন তার অনেকটা আসক্ত হয়েছে। মনে হচ্ছে অধুনা অনেকটা সুশৃঙ্খল প্রণালীর মধ্যে সে এসে পড়েছে। ক্লান্তিতে হাকিমের চোখে তন্দ্রা এলো।

পায়ের শব্দে সে চকিত হয়ে তাকালো। না, আরদালী নয়। কিন্তু পরদার ওপারেই পায়ের শব্দ থমকে গেল। একটা অসম্ভব কল্পনা যে

কুলেন্দ্রর মনে ছিল না তা নয়। বুকের ভিতরটা তার ধক্ ক'রে উঠলো। যদি তাই সত্য হয়! সেই দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের তরঙ্গে-তরঙ্গে কৌমার্যময় বক্ষ যুগলের আন্দোলন! সেই দুই আয়ত ঘননীল বন্য চোখ! সেই ঘামের ধারা নেমে আসা রক্তলেখাঙ্কিত দুই সুন্দর কপোল!

কে?

সহসা পর্দা সরিয়ে ত্রস্ত, স্মিত মুখখানি ভিতরে বাড়িয়ে ফুলমায়া প্রশ্ন করলো, রায়সাহেব নেই?

হাসিমুখে হাকিম বললে, যদি না থাকে?

না থাকলে একলা যাবো। কই, নেই ত সে?—ব'লে ফুলমায়া ভিতরে এসে ঢুকলো। তারপর বললে, কই, সেই তিনিও ত নেই!

কার কথা বলছ?

সেই যে, মেয়েছেলে! সেই তোমার সঙ্গে গিয়েছিল আমাদের ওখানে? বউ না তোমার?

না না, ছিঃ বউ কেন হবে?

বউ নেই তোমার হাকিম?

কুলেন্দ্র বললে, তুমি বুঝি জানতে না? কই, দেখি তোমার হাতে কেমন ছ্যাকার দাগ?

ফুলমায়া তৎক্ষণাৎ হাতখানা বাড়ালো। স্বাস্থ্যময় পেলব সুন্দর তার হাত। কুলেন্দ্র বললে, ইস্, একেবারে নিষ্ঠুরের মতন ছ্যাকা দিয়েছে! কিন্তু এমন হাত দেখলে ছ্যাকা দিতেই ত ইচ্ছে যায়। তুমি হরিণ নিয়ে পালিয়েছিলে কেন?

পালাইনি গো, আমার সঙ্গে গিয়েছিল। কতবার বল্‌ছি!

তোমার পোষমানা নয়, অথচ তোমার সঙ্গে গেল? এ কি বিশ্বাস করা যায়, ফুলমায়া?

ফুলমায়া হাসলো। বললে, গিয়েছিল ত!

কুলেন্দ্র বললে, তাহ'লে বলো বনের পশুও তোমাকে ভালোবাসে!

ফুলমায়া বললে, তুমি ছাই বিচার করলে তখন। কিচ্ছু হয়নি। যদি হরিণটা আমাকে দিয়ে দিতে তা'হলে বুঝতুম।

তোমার জিনিষ নয়, তবু তুমি নেবে?

আচ্ছা বেশ, আমি হার মানছি। কিন্তু আমি যে এতদিন ধ'রে তোমাদের জঙ্গলে গেছি, তোমাকে দেখিনি কেন?

ফুলমায়া বললে, আমি বেরোইনি তোমার সামনে।

কেন?

ভয় করতো।

আমি কি বাঘ?

ফুলমায়া বললে, তুমি বাঘকে মারো, বাঘের চেয়ে তুমি ভয়ানক। আচ্ছা আমি যাই এবার।

কোথায় যাবে?

আমাদের দোকানে।

কুলেন্দ্র বললে, তুমি দোকানে গিয়ে কি করবে?

বা-রে, আমি যে বেচাকেনা করি! দোকানে যদি লোকসান হয়, তুমি দেবে?

দেবো। আচ্ছা, তুমি অত ময়লা কাপড়-জামা পরেছো কেন, ফুলমায়া?

হাসিমুখে ফুলমায়া বললে, আর একটা আছে আমার শাড়ি। রায়সাহেবের যেদিন কোনো কাজ থাকে না সেদিন পরি।

কুলেন্দ্র সন্দিগ্ধকণ্ঠে বললে, সেদিন পরো কেন?

রায়সাহেব পরতে বলে। আমাকে ভাল দেখায়।

তুমি বুঝি দেখতে ভালো?

চোখ পাকিয়ে মুখ বেঁকিয়ে ফুলমায়া বললে, ভালো নয় তা তুমি বলবে কেন ?

আচ্ছা, যদি বলি খুব ভালো দেখতে তুমি ?

সে ত রায়সাহেবও বলে।

ফুলমায়া কিয়ৎক্ষণ এদিক ওদিক তাঁবুর মধ্যে তাকালো। তারপর বললে, কি জানি।—আচ্ছা, তুমি বুঝি একলা ?

হো হো ক'রে কুলেন্দ্র হেসে উঠলো। বললে, দু'জন আর পাবো কোথায় ফুলমায়া ?—দাঁড়িয়ে রইলে কেন তুমি ?

ফুলমায়া বললে, তুমি ত বসতে বলোনি, সেই আসামীর মতন দাঁড় করিয়ে রেখেছো !

কুলেন্দ্র লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। তারপর বললে, কিছু খাবে তুমি ? সেই ত সকালে খেয়ে এসেছিলে !

তারপর পুলিশ-সাহেবের বউ খাইয়েছে যে ?—ব'লে ফুলমায়া হাকিমের বিছানার উপরেই পা ঝুলিয়ে ব'সে পড়লো।

তাঁবুর ভিতর মহলে তখন কেউ নেই, ডাকলে কেউ আসবেও না। হাকিম এখানে বহু মানী ব্যক্তি, তার চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্নও কারো মনে ওঠে না। কিন্তু তবু একটা অপরিজ্ঞাত উত্তেজনায় হাকিমের সর্বশরীরে একটা কাঁপুনি জেগে উঠলো। সে বললে, আচ্ছা ফুলমায়া, জঙ্গলে থাকতে তোমার ভালো লাগে ?

খু-ব—ফুলমায়া বললে, রায়সাহেব আছে যে ?

কিন্তু রায়সাহেবের সঙ্গে থাকলে ত তোমার বিয়ে হবে না ?

নাই বা হোলো ?

তাহ'লে কাকে ভালোবাসবে ?

বিপজ্জনক প্রশ্ন বটে। ফুলমায়া যেন একটু থতিয়ে গেল। তবু সে বললে, কেন, রায়সাহেবকে ?

কুলেন্দ্র আবার হাসলো। বললে, এইটুকু বয়স তোমার! রায়-সাহেব যে বুড়ো?

এ কথাটা অবশ্য ফুলমায়া আগে তলিয়ে ভাবেনি। ভালোবাসাই সে জানে, বার্ধক্য বোঝে না। শিশুকাল থেকে দেখে আসছে ওই বুড়ো আলীজানকে। দেখে এসেছে অরণ্য-নদী, দেখেছে মৃত ও জীবন্ত জানোয়ার। অনেক সময় জংলী সাঁওতাল আর শ্রমিকদের সে দেখেছে, কাঠুরিয়াদেরও চোখে পড়েছে। কিন্তু তাদের বাইরে মানুষকে সে দেখেনি, দেখেনি যৌবনকে, দেখেনি পুরুষকে। হাকিমের কথায় হকচকিয়ে সে তাকালো। এই রহস্যময় যুবককে আগেও সে দেখেছে। কিন্তু দেখেছে অন্ধকার অমানিশার রাত্রে তাদের সেই অন্ধকার কুঠি-বাড়ীতে, কিংবা জ্যোৎস্নালোকে—অস্পষ্ট, প্রচ্ছন্ন, ছায়াচারীরূপে। সেই আলোছায়ার মধ্যে অসম্পূর্ণ দেখার বাহিরে আর কিছু জানবার বা ভাববার দরকার হয়নি। বন্দুক হাতে কালো পোষাকে শিকারীর বেশে এই লোকটি বার বার এসেছে, বার বার চলে গেছে। কোনো দাগ নেই, কোনো ঔৎসুক্য নেই,—নির্লিপ্ত নির্বিকার ঔদাসীন্য। অশান্ত দুরন্ত ফুলমায়া সহসা স্তব্ধ নতমুখে কি যেন ভাবতে লাগলো।

কিন্তু মুখ যখন সে তুললো, অপলক উৎসুক দৃষ্টিতে কুলেন্দ্র তার দিকে চেয়ে রয়েছে দেখতে পেলো। কুণ্ঠিত আনম্র হাসি হেসে সে বললে, ভারি লজ্জা করছে, এবার আমি যাই।

কুলেন্দ্র বললে, আগে আমার কথার জবাব দাও নৈলে যেতে দেবো না।

কি বলো, আমি ভুলে গেছি।

বলছি যে, ধরো তোমার বয়স উনিশ-কুড়ি, আর রায়সাহেব অন্তত পঞ্চান্নর কম নয়। আর কিছু বলতে হবে না, কেবল বলো, তোমার কি খুব ভালো লাগে?

ফুলমায়া বললে, তোমাকে বলবো কেন হাকিম, তুমি ত রায়-সাহেবের চেয়ে আপন নও!

যদি আপন হই?

রায়সাহেবের চেয়ে আপন হবে তুমি? তা কখনো হয়?

কিন্তু আমি ত বুড়ো নই, ফুলমায়া!

ফুলমায়া আবার তার প্রতি তাকালো। হাকিম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র সন্দেহ নেই; কিন্তু এ হাকিম নধরকান্তি যুবক। দম্ভ জানাবার, ঈর্ষা প্রকাশ করবার, বিশ্বাসঘাতকতা করবার এর অধিকার আছে বৈ কি। এ পুরুষ বৃদ্ধ নয়, তাই এর সব অপরাধ মার্জনীয়। রায়সাহেব তার পরম আত্মীয়, পিতামাতা অপেক্ষাও আপন, বন্ধু অপেক্ষাও অন্তরঙ্গ,—তবু যৌবনের কাছে সে পরাজিত। বিশ্বাসহন্তী যৌবনের কাছে মহানুভব বার্ধক্যও অপমানিত হয় বৈ কি।

ফুলমায়ার মুখে-চোখে কথার কোনো জবাব নেই, সে কেবল উদ্‌ভ্রান্তভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। অরণ্য থেকে সে উঠে এসেছে, এখানে জানোয়ারের চামড়ার গন্ধ নেই, মানুষ এখানে ভদ্রবেশী, ওজন ক'রে কথা কয়, শিষ্টাচার নিয়ে কুণ্ঠিত হয়ে থাকে। এই অস্থায়ী তাঁবুর ভিতরে যেন একটা অনাস্বাদিত সভ্য জগৎ। ধোপদস্ত কাপড়-বিছানা, টেবিলের ওপর হাকিমের বিচিত্র সরঞ্জাম, ফুলদানিতে জুঁই ফুলের গোছা, মেঝের ওপরে কার্পেট, টিপাইয়ের ওপর কয়েকটি বই-কাগজ। এ কোন্ জগৎ?

নিজের দিকে সে একবার তাকালো। সত্য সত্যই তার পরিচ্ছদটা মলিন। তার [illegible] শাড়িখানা একেবারেই অব্যবহার্য, তার গায়ে জামা শতছিন্ন,—কিন্তু সম্পূর্ণ লজ্জা-নিবারণের দায়িত্ব সে কোনো-দিন মানেনি! তার মাথায় জটা-জটিল চুলের রাশি, কিন্তু একে দুরস্ত করবার কল্পনা কখনো তার মনে হয়নি। সর্বাঙ্গ তার অপরিচ্ছন্ন হলেও,

আজ ফুলমায়া যেন সহসা আবিষ্কার ক'রে বসলো,—সে নিজে যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি; কিন্তু প্রসাধন করার অদ্ভুত আসক্তি তার মনকে কখনো স্পর্শও করেনি! অথচ এই দ্বন্দ্বের দোলায় আলোড়িত হবার জন্য সে এদিকে আসেনি। কৌতুক আর কৌতূহলের তরঙ্গে তরঙ্গে সে ভেসে' বেড়াচ্ছিল এই মেলায় এসে। কত অদ্ভুত বিকিকিনি, কত বিভিন্ন স্ত্রী-পুরুষের জনতা, কত রকমের তামাসা আর যাদুবিদ্যা, কত অভাবনীয় দৃশ্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন! কোথায় সে ছিল কোন্ গুহায়, সহসা কোলাহলমুখর মানুষের জনতার মধ্যে সে জন্ম নিল। অন্ধকার শূন্যলোক থেকে অকস্মাৎ সে ছিট্‌কে এসে পড়লো উজ্জ্বল আলোর প্লাবনের মধ্যে। এই উদগ্র আলো আর কোনো আশ্রয় অথবা অবলম্বন খুঁজে পায়নি। পেয়েছিল একটা শিশু হরিণ। হরিণটিকে সে সত্য সত্যই ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা বিপত্তি ঘটে গেল।

হাকিমের দিকে হাসিমুখে একবার তাকিয়ে সে বিছানায় কাৎ হয়ে মুখ লুকোলো। হাতখানা চোখ দুটোয় চেপে সে বললে, তুমি কি বলো আমি বুঝি না, হাকিম। আমায় কিছু জিজ্ঞেস করো না।

কুলেন্দ্র কাছে এগিয়ে এসে তার পাশে বসলো। তারপর ধীরে ধীরে তার গায়ে হাত রেখে বললে, বনে যে কেবল বাঘ থাকে না, হরিণও থাকে, আজকে জানতে পারলুম, ফুলমায়া।

সে কি, আগে জানতে না?—ফুলমায়া উঠে বসলো,—দাগওয়ালা হরিণ আছে, পেট-শাদা আছে, আরো অনেক রকম।

কিন্তু এক রকমের একটা আছে, তুমি দেখোনি।

কি রকম বলোত?—ফুলমায়া উৎসুক চোখে সাগ্রহে কুলেন্দ্রর মুখের কাছে মুখ ফেরালো।

কুলেন্দ্র হাসিমুখে বললে, এই ত সেই!

আমি বুঝি হরিণ ?

হ্যাঁ, তুমি সোনার হরিণ।

ফুলমায়া স্তব্ধচক্ষে তার দিকে তাকালো। কুলেন্দ্র কম্পিতকণ্ঠে বললে, সোনার হরিণটি কি আমাকে সব ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারে না দূর নিরুদ্দেশে ?

এইবার ফুলমায়া সহজ নিরুদ্বেগে কুলেন্দ্রর একটি হাত ধরলো। বললে, কোথা যাবে তুমি, হাকিম ?

বনে, জঙ্গলে,—মানুষের বাইরে ? পারো নিয়ে যেতে ?

ফুলমায়া বললে, যাবো, যদি তুমি নিয়ে যাও।

অনেকক্ষণ ফুলমায়া আকাশ-পাতাল কি যেন ভাবতে লাগলো। তারপর বললে, আচ্ছা যাবো নিয়ে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে গেলে তোমার কষ্ট হবে না ?

না গেলে যে আরো কষ্ট হবে ?

কেন ?

বলবো, কেন ? তুমি যদি হঠাৎ একদিন কাউকে ভালোবাসতে, তবে বুঝতে সে চ'লে গেলে কেন সব শূন্য হয়ে যায়।

ফুলমায়া বললে, তোমারো বুঝি কেউ নেই, হাকিম ?

কুলেন্দ্র বললে, আছে বৈ কি, তবে থেকেও নেই, ফুলমায়া।

সে কেমন ?

তোমার জ্ঞান হোক্, বুঝতে পারবে। বুঝবে তুষের আগুন কেমন, বুঝবে সামান্য সামাজিক ব্যবস্থা একজনের জীবনকে কেমন কুরে কুরে খায়।

ফুলমায়া চুপ ক'রে রইলো। কিছুক্ষণ পরে সহসা হাকিমের গলা জড়িয়ে বললে, চলো তুমি আমার সঙ্গে, কেমন ?

হাকিম এবার নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে তাকে কাছে টেনে নিল। মুখের

উপরে মুখ রেখে বললে, সঙ্গে নিয়ে যাবে, কিন্তু রায়সাহেবকে কি বলবে?

বলবো যে, এতদিন পরে হাকিমকে ধ'রে এনেছি।

এই শুধু বলবে?

ফুলমায়া ডান হাতে কুলেন্দ্রকে ঘন আলিঙ্গনে বাঁধলো। তারপর হেসে বললে, আর বলবো, হাকিম আমাকে তাঁবুর মধ্যে দু'হাত দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। রায়সাহেব, এবার তুমি হাকিমের বিচার ক'রে দাও।

কলকণ্ঠের হাসির ফেনা কল্লোলিত হয়ে উঠলো তাঁবুর মধ্যে। গল্প আর ফুরোয় না।

* * * *

অনেক দিন পরে কল্‌কাতায় ভবানীপুরের বাড়ীর তেতলার ঘরে ব'সে শর্বরী চাকরের হাতে একখানা চিঠি পেলো। পরিচিত হাতের লেখা, যেন অপরিচয়ের দুর্গম রহস্য থেকে তার কাছে ছুটে এলো। সে তার আত্মবিস্মৃত জীবনকে নিয়ে দীর্ঘব্যাপী ব্যর্থতার পর যেন কঠিন তপশ্চর্যায় ব'সে ছিল। চিঠিখানা দেখে তার ধ্যান ভাঙলো। কুলেন্দ্রর চিঠি:

প্রিয় শর্বরী,

সাত-আট মাস পরে। তুমি যাবার পর থেকে আমাকে চিঠি লেখোনি। কে আগে লিখবে, সম্ভবত এই ছিল প্রধান সমস্যা। ভাগ্যবিধাতার হয়ত এই নির্দেশ, তোমার বৈরাগ্য আমার ঔৎসুক্যকে যেন সজীব ক'রে রাখে। প্রার্থনা করি তুমি কুশলেই থাকো।

আমার কি চেহারা তুমি দেখে গিয়েছিলে এখন আর ঠিক মনে নেই। এখন এলে ঠিক কোন্ চেহারায় তুমি আমাকে দেখবে তাও বলা কঠিন। তবে একথা স্মরণ আছে, সেদিন তোমার চোখ নিয়ে দেখেছিলুম আমি নিজেকে! সেদিন সুস্থ ছিলুম না। দুর্ঘটনার আগেও

না, পরেও না। যদি বলি আমার অসুস্থতার জন্য দায়ী, চমকে উঠো না; যদি বলি তোমারই জন্য সুস্থ হ'তে পেরেছিলুম, মনে করো না এটা অতিশয়োক্তি। কম্পাসের কাঁটা আন্দোলিত হ'লে এদিক ওদিক নড়াচড়া করে, নাবিকের কম্পাসের কাঁটা থাকে একই দিকে, সে হোলো বিশেষ দিকনির্দেশক, আমি সেই নাবিক। তোমার যাবার সময় তাড়াতাড়িতে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম আমার জীবনের গতিবিধি অতঃপর সুনিয়ন্ত্রিত হবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন করাও যেমন পুরুষের পক্ষে সত্য, লঙ্ঘন করাও তেমনি তার পক্ষে সহজ। সেদিন চোখ চেয়েছিলুম তোমার দিকে, কিন্তু চোখ বুজে থাকলে দেখতে পেতুম, আমি নিয়তির হাতে ক্রীড়নক মাত্র। নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই জানিনে।

এমন কোনো প্রবল ঘটনা আমার জীবনে ঘটেনি যার প্রভাবে আমি চিরদিন নিয়ন্ত্রিত হবো। ঝড়, প্লাবন, ধ্বংস, মহামারী—এসব আমি দেখিনি, দেখেছি কেবল প্রকৃতির নিত্য নিঃশব্দ পরিবর্তন। আমার নদী নিজের বেগে কোথাও তটও ভাঙেনি, লোকালয়ও গড়েনি, কেবল আবর্ত রচনা ক'রে চলেছে। সেই আবর্তের সঙ্গে আর কোনো সংঘর্ষ নেই, নিজেই সে কেবল নিজের ইতিহাস বুনে বুনে চলে।

প্রথমেই যদি বলি একটা কিছু অভাবনীয় কাণ্ড ক'রে বসেছি নিজের খেয়ালে, তাহ'লে তুমি বিশ্বাস ক'রো না। মানুষের সকল কীর্তি হোলো তার অতীত কর্মধারার একটা ক্রমিক পরিণতি মাত্র। আগের সঙ্গে পরের নিকট সম্পর্ক আছে, কেবল তার অনুবর্তনের রীতিকে আবিষ্কার ক'রে নেওয়া, এই মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে যাকে মনে হয় অভিনব, চেষ্টা করলে দেখা যাবে সে অতি পুরাতন ধারারই একটা নতুন আকৃতি। তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম, কিন্তু বন্ধনের সেই শৃঙ্খল ছিন্ন করার যে অস্ত্র, সেই অস্ত্রও মনে মনে শান দিয়েছিলুম। এর মধ্যে

তোমার সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করার প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু নিজেরই স্বভাবধর্মকে যে নিজেই অনুসরণ ক'রে চলেছি, এ হোলো তারই উদাহরণ। আমি যে নূতন আবর্তের মধ্যে এসে পড়েছি, এ সংবাদ শুনলে তুমি যাতে বিস্ময় বোধ না করো, তারই জন্য এই গৌরচন্দ্রিকা।

মাস তিনেক আগে একটা মেলায় আমার ডিউটি পড়েছিল। স্বপ্নেও মনে করিনি, সেখানে আমার ভাগ্যলিপি নতুন করে লেখা হবে। হাকিমের কর্তব্য তুমি জানো, হাকিমীর জন্যই সেখানে যাওয়া। সেখানে সাধুদের আড্ডা থেকে একটা হরিণ চুরি হয়। চোর হোলো স্ত্রীলোক আসামী, আর সেই আসামী হোলো তোমার অতি স্নেহের পাত্রী ফুলমায়া। বলা বাহুল্য, সাক্ষ্যসাবুদের দুর্বলতার জন্য আসামী খালাস পেয়ে গেল। আসামী তরুণী এবং সুন্দরী, অপরাধ যদি তার থাকেও, তবুও অবিবাহিত বিচারক কিছু বিবেচনার পরিচয় দেয় বৈ কি। কিন্তু তার চেয়েও ব্যাপারটা অবশেষে ঘোরালো হয়ে দাঁড়ালো। ফুলমায়া যখন আমায় নিভৃত সান্নিধ্যে এসে দেখা দিল, আমি যে কেমন ক'রে রঙে, রসে, ভাষায়, কল্পনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলুম তা বলা কঠিন। তুষার গলে নামতে লাগলো, ঋতু পরিবর্তনের তাপে। হয়ত এ সব প্রয়োজন ছিল, হয়ত এই বন্যার জন্য আমার অন্তরের অলক্ষ্যে কোনো নিঃশব্দ তপস্বী প্রতীক্ষায় বসেছিল। তুমি রয়েছ সমাজ শাসন আর বিধিনিষেধের অন্তর্গত; ফুলমায়া রয়েছে সমাজ বিধির সকল প্রকার এলাকার বাইরে। তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সঙ্কোচের, শঙ্কার, শাসনের, ফুলমায়ার সঙ্গে সম্পর্ক হোলো সহজ স্বভাবধর্মের, নির্বিরোধ মুক্তির। হয়ত নিরবচ্ছিন্ন মুক্তিই আমি চেয়েছিলুম। তোমার কাছে পেলুম ভালোবাসা, তার কাছে পেলুম আনন্দ। জানিনে কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা দামী।

তোমাকে নিয়ে জীবনে যে সরোবরটি রচনা করেছিলুম, সহসা

আনন্দের চঞ্চল বন্যাস্রোতে তার বাঁধ ভেঙে গেল। কোনো পূর্ব প্রতিজ্ঞা আর অগ্র পশ্চাতের হিসাব বুদ্ধি রইলো না, ভেসে চলে গেলুম পাল তুলে দিয়ে। তোমার কাছে পেয়েছিলুম তপস্যা, এর কাছে পেলুম শক্তি,—আর সেই শক্তি নিজের দুর্বার চৌম্বকের টানে আমাকে টেনে নিয়ে চললো ছুটিয়ে অনাস্বাদিতপূর্ব প্রাণের পথ ধ'রে। তুমি ফিরিয়ে এনেছিলে অরণ্য থেকে মানুষের পথে, সে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে গেল মানুষের পথ থেকে আবার দুর্গম অরণ্যবাসায়। সে যে কী খেলা খেলালো, তার বর্ণনা নিষ্ফল, কিন্তু নিজের সুপ্ত বাসনার প্রকাশ নিজেই চোখ ভরে দেখতে লাগলুম।

এই উদ্দাম বাসনার স্রোতকে সংযত করার জন্য একজনকে আত্মবলি দিতে হোলো। বুঝলুম এও সেই নিয়তির নির্দেশ। তুমি রায়সাহেবকে চেনো। তাঁর সঙ্গে ফুলমায়ার রহস্যময় আত্মীয়তাও তোমার অবিদিত নয়। কিন্তু আমাদের এই মধুর সম্পর্ক দেখে তাঁর একদিকে যেমনই আনন্দ, তেমনি বেদনা। তিনি জানতে পারছিলেন, পৃথিবী থেকে তাঁর দাম ক'মে যাচ্ছে, তাঁকে পথ ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু বড় আত্মীয়তা যার সঙ্গে, তার কাছে সব চেয়ে নিষ্ঠুর উপেক্ষা কেমন করে বুকে বাজে, হয়ত পুরুষ না হলে এ তত্ত্ব উপলব্ধি করা কঠিন। রায়-সাহেব যেমন নির্বিকার ঔদাসীন্যে সহজ স্নেহে ফুলমায়ার এই আচরণ মার্জনা করছিলেন, তেমনি অন্তর তাঁর কী যে বেদনায় নিত্য নিজেকে দগ্ধ করছিল, সেই করুণ দৃশ্য নিজের চোখেই দেখেছি। মনে করেছি চলে যাই, দূরে যাই, ভুলে যাই—কিন্তু উন্মাদিনী ফুলমায়ার বন্য ভালোবাসার দুরন্ত ঝাপটায় উদভ্রান্ত হয়ে আমাকে সেখানে থাকতে হয়েছিল।

অবশেষে সেই দিন এলো। ম্যান্-ইটরকে হত্যা করার জন্য জঙ্গলের মধ্যে মাচার উপরে ব'সে আমি আর ফুলমায়া। দূরে গাছের

আড়ালে আরেক মাচায় রায়সাহেব। বেলা তখন দুপুর। বাঘ এলো নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। আমি দেখতে পাইনি, কিন্তু যে শিকারীর নির্ভুল দৃষ্টি শত শত নরখাদককে চিরকাল আবিষ্কার করেছে সেই দেখলো। রায়সাহেবের অব্যর্থ সন্ধানে সেই বাঘ গুলী খেয়ে পালাতে গিয়ে এক গাছের গোড়ায় প'ড়ে গেল। তার অন্তিম আর্তনাদ দেখতে দেখতে স্তব্ধ হোলো।

রায়সাহেব অনভিজ্ঞ ছিলেন না। চিরদিন তিনি যে উপদেশ অন্যকে দিয়ে এসেছেন সেই উপদেশ নিজে তিনি পালন করলেন না। গুলী খেয়ে বাঘ মৃতবৎ প'ড়ে থাকলে যে তার কাছাকাছি কদাপি যেতে নেই, রায়সাহেব নিশ্চয় জানতেন একথা। কিন্তু তাঁর জীবন যেন কয়েকদিন থেকেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। নিজেকে ঘৃণা করছিলেন, নিজের জীবনের দায়ীত্ব নেবার আগ্রহ তাঁর ক'মে গিয়েছিল। সেই বেপরোয়া চিত্তবিকারের ফলে শিকারীর সকল নীতি লঙ্ঘন ক'রে তিনি মাচা থেকে নেমে মৃতবৎ বাঘকে নাড়াচাড়া ক'রে দেখতে গেলেন, সেটার মৃত্যু হয়েছে কিনা। সমস্ত জীবন ধ'রে অরণ্যকে তিনি হিংস্র আঘাত হেনে এসেছেন, আজ অরণ্য তার প্রতিহিংসা নিল। বাঘ মরেনি,—সহসা লাফিয়ে উঠে অতর্কিত শিকারীকে সে প্রচণ্ড আক্রমণ করলো। আমাদের একটা সন্দেহ হয়েছিল। অনেকক্ষণ পরে মাচা থেকে নামলুম। কিন্তু রায়সাহেবের সেই বীভৎস চর্বিত দেহ ফেলে রেখে নরখাদক বেশি দূরে যেতে পারেনি, কয়েক শত গজ দূরে গিয়ে নিজেও সে মরেছে। রায়সাহেব বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন, পৃথিবীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের চিহ্নও রেখে যান নি।

আজ রাত্রে বাংলোর ঘরে ব'সে তোমাকে চিঠি লিখছি। বাইরে নিবিড় করুণ শ্রাবণের ধারা অবিশ্রান্ত ঝরছে। বন্ধ জানালা দিয়ে গড়িয়ে নামছে বর্ষার জলের ফোঁটাগুলি,—ওদের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছে,

যেন আমাদের এই ঘরে রায়সাহেবের অশ্রু নামছে ঝরঝরিয়ে। বিছানার পরে নিশ্চিন্ত নিবিড় নিদ্রায় ফুলমায়া অভিভূত। সে যেন তার আতপ্ত নিশ্বাসে কোনো স্বপ্নের জাল বুনছে। এখন আর সে বন্য হরিণী নয়, গৃহবাসিনী। চাঞ্চল্য নেই, আছে স্তব্ধতা। বুদ্ধি বিদ্যা এখন তার অজ্ঞানে অচেতন নয়, নারীর আত্মমর্যাদা ও দায়িত্বজ্ঞানে সে নিজেকে শান্ত করেছে। আমি তাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছি।

আমি জানি তুমি আর আসবে না, হয়ত এমনও হতে পারে আমার বর্তমান জীবন-নীতিতে তোমার অনুমোদন নেই। হয়ত তুমি সহ্য করবেনা, হয়ত নিজের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয়েছে তুমি মনে করবে। এমনও হ'তে পারে, আমার আর তোমার আকৈশোর সম্পর্কের উপরে এবার তুমি যবনিকা টেনে দেবে। হয়ত ফুলমায়াকে আন্তরিক আশীর্বাদ করতে তোমার মন উঠবে না। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমার সান্ত্বনা থাকবে আমি আত্মগোপন করিনি। তোমার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আত্মগোপন করে নিজের জীবনে তোমার গৌরবকে ক্ষুন্ন করিনি।

কিন্তু তাই যদি হয়, তোমার কাছে মার্জনা চাইবোনা। কেবল যে-অমৃত গত কুড়ি বছর তোমার হাত থেকে পেয়েছি, তারই স্মৃতি নিয়ে নিঃশব্দে তোমাকে ভুলতে চেষ্টা করবো। ইতি—

যেমন চিরকাল তোমার

কুচক্রী

চিঠি শেষ ক'রে শর্বরী হেসে উঠলো। হেসে তার ঘর ভ'রে দিল। ভাবলো, পুরুষের অদ্ভুত মনোবৃত্তি। মনে করেছে, ঈর্ষাই বুঝি মেয়েদের একমাত্র সম্বল! এতদিনের এত বেদনা, এত সতর্কতা,—সেই কণ্টক থেকে আজ শর্বরীর মুক্তি! কুচক্রী বুঝি মনে করেছে, শর্বরীর ভালবাসা এত ক্ষণভঙ্গুর, মনে করেছে সামান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষায় সে-বস্তু পুড়ে ছাই হবে। আত্মাভিমানী বালক একথা বোঝে নি যে, পাবার

প্রত্যাশা থাকলে তবেই আসে বিদ্বেষ, হারাবার ভয় থাকলে তবেই আসে অশ্রদ্ধা।

অসীম তৃপ্তিতে শর্বরীর মুখ চোখে কেবল যে ঔজ্জ্বল্য দেখা দিল তাই নয়, বিশবৎসরের অন্ধকার সে-মুখ থেকে স'রে গেল। আজ নবজীবনের বোধনের দিনে কুচক্রীর পাশে গিয়ে তার দাঁড়ানো চাই। আজ সিংহাসনে সে গিয়ে বসিয়ে আসবে রাজলক্ষ্মীকে,—এ কাজে কেবল যে তারই একমাত্র অধিকার।

যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে শর্বরী আর একবার দ্রুত আয়োজন করতে লাগলো।

সমাপ্ত